বেদান্তসারঃ

শ্রীসদানন্দযোগীন্দ্রসরস্বতীপ্রণীতঃ

অনুবাদ ও টীকা

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য

শ্রীশ্রীসদানন্দযোগীন্দ্রসরস্বতী-প্রণীতঃ

বেদান্তসারঃ

(বাংলা ভাষায় কৃত অমৃত টীকা সমেত)

অনুবাদ ও টীকা

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

কলিকাতা

প্রকাশকের নিবেদন

উপনিষদ্, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মূল বেদান্তশাস্ত্র নামেই সুপরিচিত। উক্ত গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যা গ্রন্থাদি ছাড়াও বহু সাধক ও সন্ন্যাসী নানান ধরনের বেদান্তবিষয়ক প্রকরণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। 'বেদান্তসারঃ' গ্রন্থটিও ঐরূপ একটি প্রকরণ গ্রন্থ। এই প্রকরণ গ্রন্থটি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এটি এমনভাবে রচিত হয়েছে যে, বেদান্তশাস্ত্রে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক সকলেই পড়তে সক্ষম হয়। এই গ্রন্থটি না পড়ে উপনিষদাদি দুরূহ গ্রন্থ থেকে বেদান্তের তত্ত্ব বুঝতে যাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য বিষয়। বাংলাদেশের দিনাজপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অমৃতত্বানন্দ উক্ত গ্রন্থটির অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সহজ সরল ভাষায় করেছেন। উনি শ্লোকগুলির ব্যাখ্যাসমূহকে 'অমৃতটীকা' নামকরণ করেছেন। গ্রন্থটি সর্বপ্রথমে দিনাজপুর আশ্রম থেকে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে সংশোধিত ও পরিমার্জিত আকারে উদ্বোধন কার্যালয় থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করা হলো।

বেদান্তজিজ্ঞাসু পাঠকদের এই গ্রন্থপাঠে বেদান্ত বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ও সাবলীল ধারণা জন্মাবে—এই আশা পূর্ণ হলে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

অনুবাদকের নিবেদন

বেদের অন্তঃভাগ অর্থে সারভাগ, সারকথা; অথবা বেদের শেষভাগে উপনিষদ্ থাকায় অন্তঃকথা শেষকথা হিসেবে 'বেদান্ত' কথাটির প্রয়োগ। এই বেদান্ত একখানি, বা দুখানি উপনিষদ্ পড়ে সম্যগ্ ধারণা করা যায় না। প্রস্থানত্রয় পড়তে হয়। প্রস্থিত অর্থে তত্ত্বে স্থিত হওয়া বোঝায়, যার দ্বারা তা হয় তা-ই প্রস্থান। এই প্রস্থান ৩টি। (১) শ্রুতিপ্রস্থান—শ্রুতি অর্থে উপনিষদ্, (২) ন্যায়প্রস্থান অর্থে ব্রহ্মসূত্র; ৫৫৫টি সূত্রে ব্রহ্ম অর্থে বেদকে সূত্রিত করে তার মূল ভাবকে চারটি অধ্যায়ে বুঝিয়েছেন ব্যাসদেব। প্রথম অধ্যায়ে শ্রুতিবাক্যসমূহের সমন্বয়, দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবিরোধ, তৃতীয় অধ্যায়ে সাধন ও চতুর্থে ফল বর্ণনা করে নিখিল অধ্যাত্ম-শাস্ত্রকে বর্ণনা করেছেন। (৩) স্মৃতি-প্রস্থান অর্থে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকে বোঝায়।

এই সকলের উপর আচার্য শঙ্করের ভাষ্য প্রধান। তার ওপর শত শত শতাব্দী ধরে বহু সাধক পণ্ডিত সন্ন্যাসী অনেক টীকা টিপ্পনী রচনা করেছেন। সুতরাং বেদান্তের সারকথা জানা এক দুরূহ ব্যাপার। এই দুরূহ কাজটিই শ্রীসদানন্দযোগীন্দ্র (১৪০০-১৫০০ শকাব্দ) করেছেন। প্রথমে বেদান্তের পরিচয় দিয়ে 'অধ্যারোপ' অংশে ব্রহ্মে জগৎ সৃষ্টির বিষয় ও 'অপবাদ' অংশে সমস্ত বেদান্তের সার সিদ্ধান্ত তুলে ধরেছেন অপূর্ব কৌশলে এবং পরে অদ্বৈতের সাধন হিসাবে যোগসমাধির কথা ও জীবন্মুক্তির অবস্থা ও ফল বর্ণনা করে স্বল্প পরিসরে সমগ্র বেদান্তের সার সাধারণের গোচরীভূত করেছেন। বাস্তবিকই একটা অসাধ্য সাধন।

আমরা এই গ্রন্থে মূল বঙ্গানুবাদ ও সরল টীকা চলতি বাংলায় করেছি, সাধারণের জন্য সহজ করে বলার চেষ্টা করেছি। বর্তমানে

সংস্কৃত শিক্ষা একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ সন্ধিগুলি বিচ্ছেদ করে মূল লেখা হলো। অমৃত নামাখ্যা টীকা সুবোধিনী, বিদ্বন্মনোরঞ্জনী ও বালবোধিনী থেকে ভাব নিয়ে লেখা। ব্রঃ মেধাচৈতন্য মহারাজের প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে অধিকাংশ শিরোনাম গৃহীত। বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকাকার শ্রীরামতীর্থমতি, মীমাংসাচার্য অপোদেব বালবোধিনী টীকার ও শ্রীমন্নৃসিংহ সরস্বতী সুবোধিনী টীকার রচয়িতা। তাঁদের ও মেধা-চৈতন্য মহারাজকে বিনীত প্রণাম জানাই।

প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি দিনাজপুরে না থাকায় এবং স্বয়ংও সংস্কৃতানভিজ্ঞ, সুতরাং প্রমাদ অবশ্যম্ভাবী। তথাপি উপরোক্ত গ্রন্থাদির সহায়তায় এই দুরূহ কাজে ব্রতী হয়েছি, কেবল বেদান্তশাস্ত্রের মর্মকথা বিস্মৃতপ্রায় বাংলার মানুষকে ধরিয়ে দিতে।

এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ পূজ্যপাদ ভূতেশানন্দজী মহারাজের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর অমূল্য উপদেশ গ্রহণ করেছি। তাঁর আশীর্বাণী আমার পরম পাওনা। তাঁকে বিনীত প্রণাম নিবেদন করি।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতির ক্ষেত্রটি ছিল বড় বিরক্তিকর; একে সংস্কৃত, তাতে আবার দুর্বোধ্য বিষয়। তথাপি এ কাজের গুরুত্ব বুঝে শ্রীসুরেন্দ্র কুমার ঘোষ, বালুয়াঘাটের সর্বজন-পরিচিত শ্রদ্ধেয় মাস্টারবাবুরা মিলে করে দিয়ে লেখকের শ্রম লাঘব করে ধন্যবাদার্হ। শ্রীভগবান তাঁদের সকলের কল্যাণ করুন।

গ্রন্থটি প্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর বাংলাদেশ থেকে মুদ্রিত হয়। সংশয় ছিল গ্রন্থটি বিদ্বৎসমাজে আদৃত হবে কি না। বেদান্ত নিয়ে পড়াশোনা করার লোকও সীমিত। প্রকাশনার কয়েক মাসের মধ্যেই গ্রন্থের চাহিদা ও আদর দেখে স্বস্তি বোধ করলেও রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দের অভিমত না জানা পর্যন্ত বেশ একটা অভাববোধ করছিলাম। অবশেষে স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ কৃত সার্থক সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় এবং বন্ধুবর স্বামী সত্যব্রতানন্দ ও

উদ্বোধন পত্রিকার বর্তমান সুযোগ্য সম্পাদক স্নেহাস্পদ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এই গ্রন্থ উদ্বোধন থেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করায় স্বস্তি পেলাম। উভয় স্বামীজীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, গ্রন্থখানি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেফারেন্স বই হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে।

বর্তমান সংস্করণটির বঙ্গানুবাদ ভালভাবে সংশোধিত করা হয়েছে। স্বামী নিখিলানন্দ কৃত ইংরেজী বেদান্তসারের অনুসরণে বাংলায় বিষয়বস্তুর সহজ অবগতির জন্য ছক করে দেওয়া হলো। এই বিষয়ে স্নেহাস্পদ স্বামী ইষ্টব্রতানন্দের সপ্রেম ও সশ্রদ্ধ সহায়তা উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি আরো উপযোগী ও একান্ত নির্ভরশীল করার অভিপ্রায়ে তার অকুণ্ঠ সহযোগিতা, উৎসাহ ও উদ্যম প্রশংসনীয়। তাকে আপনার জ্ঞানে ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া স্বামী ধর্মরূপানন্দের আগ্রহ ও আন্তরিকতা স্মরণীয়।

পাঠককুলের বেদান্তবিষয়ে আগ্রহ সামান্য বৃদ্ধি পেলেও শ্রম সার্থক মনে করব।

পরিশেষে মুদ্রাকরদের ধন্যবাদ জানাই। কারণ এ জাতীয় বই-এ পরিবর্তন পরিবর্ধন প্রুফ দেখার কালে হয়েই থাকে। তা ধৈর্যের সঙ্গে মেনে নিয়ে এ-কাজ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। শ্রীমা সারদার কৃপায় এই গ্রন্থ সাধারণের বোধগম্য হলে জীবন ধন্য মনে করব। ইতি

বিনীত

শ্রীমৎস্বামীব্রহ্মানন্দ শিষ্য-শ্রীমৎস্বামীশঙ্করানন্দ-চরণাশ্রিত দাস

স্বামী অমৃতত্বানন্দ

সূচীপত্র

বেদান্তসারঃ

মঙ্গলাচরণম্

ইষ্টবন্দনা

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঙ্মনসগোচরম্।
আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়েঽভীষ্ট সিদ্ধয়ে।। ১ ।।

যিনি অখণ্ড, সৎ, চিৎ, আনন্দরূপ, বাক্য-মনের অগোচর অথচ জগতের আধারস্বরূপ সেই পরমাত্মাকে আকাঙ্ক্ষিত কার্যসিদ্ধির জন্য আশ্রয় করি ।।১ ।।

অমৃত টীকা :

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।

ওঁ যথাগ্নের্দাহিকাশক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্।।

ওঁ নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দসূরয়ে।
সচ্চিদ্‌সুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে।।

ওঁ শ্রীগুরবে শংকরানন্দায় শংকররূপিণে।
রামকৃষ্ণ-সূনু ব্রহ্মানন্দময়ায় তে নমঃ।।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামাতা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও শ্রীগুরু শংকরানন্দকে প্রণাম জানিয়ে বাংলাভাষায় অমৃত টীকা রচনায় অগ্রসর হচ্ছি। এ যেন পঙ্গুর গিরি লঙ্ঘনের মতো। কেবল তাঁদের কৃপা ভরসা করেই আমার মতো অল্পধীর এই প্রয়াস।

গ্রন্থারম্ভে ইষ্টগুরু প্রণাম করা শিষ্টাচার। গ্রন্থ রচনা অবাধে যাতে হতে পারে এবং রচিত গ্রন্থ যাতে বহুজনের কাছে প্রচারলাভ করতে পারে, সেজন্য ইষ্ট ও গুরুকে প্রণাম জানিয়ে শুভ কাজ করা শিষ্টসম্মত রীতি। কোন উদ্দেশ্য না রেখেও যে-কোন কাজ করার আগে শ্রীভগবান ও শ্রীগুরুকে স্মরণ করা ঈশ্বর-প্রেমিকের স্বভাব। এই গ্রন্থারম্ভে রচয়িতা শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র তাই প্রথমেই শ্লোকে ইষ্ট স্মরণ করেছেন।

অভীষ্ট, আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। সেটা কি? না, মুক্তি। কারণ মোক্ষকামী ব্যক্তিগণই এ গ্রন্থপাঠের অধিকারি। যে-কোন লোক যে-কোন গ্রন্থ পড়তে পারেন, কিন্তু নিজ প্রয়োজন যেখানে সিদ্ধ হয় না, সেই বিদ্যায় মানুষের অনুরাগ থাকে না। আন্তরিক প্রয়োজনবোধের আবেগ যেখানে যুক্ত না হয়, সেখানে বিদ্যার গভীর সূক্ষ্ম তত্ত্বও আয়ত্ত হয় না। এজন্যে শাস্ত্র পাঠের আগে চারটি জিনিস বিচার করতে হয়—অধিকারি, বিষয়, প্রয়োজন ও সম্বন্ধ। এদের একসঙ্গে বলে 'অনুবন্ধ'। এই প্রথম শ্লোকে ইষ্ট স্মরণের সঙ্গে সঙ্গে অনুবন্ধ চারটির কথাও গৌণভাবে বলা হয়েছে। অর্থের সঙ্গে সঙ্গে তাও স্ফুট হয়ে উঠবে।

প্রথমে 'অভীষ্ট সিদ্ধয়ে'। অভিলষিত বস্তু সিদ্ধির জন্য। অভিলষিত বস্তুটি এখানে মুক্তি। সুতরাং মোক্ষকামী ব্যক্তিই এই গ্রন্থ পাঠের অধিকারি। 'আত্মানম্' আত্মাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে 'আশ্রয়ে' আশ্রয় করি। পরমাত্মা পদের শোধন বলা হচ্ছে। শোধন বলতে সুষ্ঠুভাবে যথাযথভাবে বোঝা। পরমাত্মা কি? একটা অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট করার জন্য বলা হচ্ছে। 'অখিল আধারং'—নিখিল সৃষ্টির আধারকে, চরাচরাত্মক সৃষ্টির বিবর্তাধিষ্ঠানকে। তাহলে তো তাঁকে দেখা যেত? উত্তরে বলা হচ্ছে 'অবাঙ্‌মনসগোচরম্'—না, তিনি বাক্য মনের অগোচর। বাক্য তাঁকে প্রকাশ করতে পারে না, মন তাঁকে ধারণা করতে পারে না, ইন্দ্রিয়-মনের বিষয় তিনি নন। ইন্দ্রিয় ও মনের বিষয় যে-বস্তু নয়, তা তাহলে অসৎ? না, তিনি অসৎ নন—'সৎ'। জগদ্‌রূপ ভ্রমের অধিষ্ঠান তিনি—তা আছেই। তাহলে জগতের কারণ বলে তিনি জড়? না, 'চিৎ'। তিনিই শুদ্ধ চৈতন্য। তাঁর চৈতন্যেই জগৎ প্রকাশিত হয়—আছে বলে বোধ হয়। তা হলেও মানুষের আকর্ষণ হচ্ছে আনন্দে। সৎ-চিৎ-এ আনন্দ কি আছে? উত্তরে বলা হচ্ছে, তিনি আনন্দস্বরূপ 'আনন্দম্'। আচ্ছা, প্রশ্ন হতে পারে, অধিষ্ঠান সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম তাহলে অনেক। কারণ জগৎকে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড খণ্ড দেখায়। তার উত্তরে বলা হলো—'অখণ্ডং' অর্থাৎ স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত ভেদশূন্য ব্রহ্ম। অতএব ব্রহ্মই সকল সৃষ্টিতে ব্যাপ্ত বলে জীবদেহে যে আত্মা, সেই ব্রহ্ম। এরূপভাবে জীবব্রহ্মৈক্য যে এই শাস্ত্রের মূলকথা তা গৌণভাবে ইঙ্গিতে বলা হলো। এই ঐক্যবোধ জন্মানোই এই শাস্ত্রের বিষয়। এই ঐক্যজ্ঞান হলেই পরমানন্দলাভ, সকল দুঃখের অবসান, জন্মমৃত্যুর প্রবাহ থেকে মুক্তি, সকল সংসারের ও সংশয়ের নাশ, হৃদয়গ্রন্থির উচ্ছেদ, সকল কর্মের শেষ হয়—মানুষ মুক্তি লাভ করে। এই মুক্তিই পরম পুরুষার্থ। শাস্ত্রের সঙ্গে এর সম্বন্ধ হলো বোধ্য-বোধক ভাব সম্বন্ধ। আত্মতত্ত্ব বোধ্য, শাস্ত্র বোধক। প্রথম মন্ত্রেই এই অনুবন্ধ চারটির কথা বলা হলো।

এখন গুরু প্রণামের তাহলে কি প্রয়োজন? শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলা হয়েছে, 'যস্য দেবে পরাভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ।।' আরো 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদঃ' ইত্যাদি শ্রুতি বলে জানা যায়, গুরুকৃপা না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। সুতরাং গুরু প্রণাম ও স্মরণ করে গ্রন্থ আরম্ভ করা হচ্ছে।।১।।

শ্রীগুরুর প্রণাম

অর্থতোঽপি-অদ্বয়ানন্দান্-অতীত-দ্বৈত-ভানতঃ।
গুরূন্-আরাধ্য বেদান্তসারং বক্ষ্যে যথামতি।। ২।।

দ্বৈতবোধ চলে যাওয়ায় যিনি কেবল নামেই অদ্বয়ানন্দ নন, কিন্তু সত্যই অদ্বয়বোধসম্পন্ন, সেই অদ্বয়ানন্দ গুরুকে আরাধনা করে আমার জ্ঞানানুসারে বেদান্তসার বর্ণনা করব।।২।।

অমৃত টীকা ঃ অর্থতঃ অপি, অর্থের দিক থেকেও যিনি অদ্বয়ানন্দ—কেবল নামে নয়; নামের অর্থের অনুসারে যিনি, 'অতীত দ্বৈত ভানতঃ' জীব ব্রহ্মের দ্বৈতবোধকে অতিক্রম করে একত্ব অনুভব করেছেন, সেই আপ্তকাম গুরুকে; সম্মানার্থে বহুবচনের প্রয়োগ হয়েছে। 'আরাধ্য' কায়মনোবাক্যে প্রণাম করে; 'বেদান্তসারং'—বেদান্তের মূলকথা, 'যথামতি' যেমন আমার বুদ্ধি তদনুসারে, 'বক্ষ্যে' বলব। আপস্তম্বে বলা হয়েছে, 'দেবমিব আচার্যমুপাসীত'—দেবতার মতো আচার্যকে উপাসনা করবে। সুতরাং গুরুপ্রণাম করে এখন গ্রন্থ আরম্ভ হচ্ছে ঃ গ্রন্থের নাম বেদান্তসারঃ। বেদান্তের সার কথা বলাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রথমেই প্রশ্ন হবে, বেদান্ত বলতে কি বোঝায়? ।।২।।

বেদান্তের পরিচয়

বেদান্তো নাম—উপনিষৎ-প্রমাণং তদুপকারীণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ।।৩।।

বেদান্ত বলতে বোঝায় উপনিষদ্ যার প্রমাণ এবং সেই প্রমাণের সহায়ক গ্রন্থ যেমন ব্রহ্মসূত্র, প্রভৃতি।।৩।।

অমৃত টীকা : মুখ্যত উপনিষদেই 'জীব ও ব্রহ্ম এক' এই তত্ত্ব উক্ত হয়েছে। উপনিষদ্‌ই এই তত্ত্বের একমাত্র প্রমাণ। এই উপনিষদ্‌কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে বিদ্বানগণ যে-সকল গ্রন্থ লিখেছেন তাকেও 'বেদান্ত' বলে। এই মুখ্য ও গৌণ ভেদ করে বলা হয়েছে, 'উপনিষৎ-প্রমাণং তদ্‌উপকারীণি'— তার উপকারী অর্থে সমর্থক গ্রন্থাদি যেমন শারীরকসূত্র ইত্যাদি। 'শারীরকসূত্র' বলতে ব্রহ্মসূত্র । ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ বেদ। বেদের মূল তত্ত্বকে উপনিষদ্‌বাক্য থেকে সংকলিত করে বেদব্যাস ৫৫৫টি সূত্রে গ্রথিত করেছেন, একে ব্রহ্মসূত্র বলে। তার অপর নাম ভিক্ষুসূত্র, শারীরকসূত্র। শারীরক শব্দের অর্থ হলো, শরীরে যে জীব, তার স্বরূপ যেখানে যথাযথরূপে নিরূপিত হয়েছে, তাই শারীরকসূত্র। ভিক্ষুসূত্র বলা হয় এ-কারণে যে, এ কেবল মোক্ষকামী সর্বকর্মত্যাগী ভিক্ষুসন্ন্যাসীদেরই পঠিত গ্রন্থ। 'আদি' পদে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, ভাগবত প্রভৃতিকেও ধরা হয় এবং এ-সকল গ্রন্থের ভাষ্যাদি বিবরণকেও বেদান্ত শব্দে বোঝানো হয়। যদিও গৌণভাবে প্রথম শ্লোকেই অনুবন্ধ চারটির কথা বলা হয়েছে তথাপি বুদ্ধিমান ব্যক্তির সন্তোষ হয় না। বিশেষভাবে জানতে চায়। সেজন্য অনুবন্ধ চারটির কথা বলা হচ্ছে।।৩।।

অনুবন্ধ চারটির পরিচয়

অস্য বেদান্তপ্রকরণত্বাৎ তদীয়ৈঃ এবানুবন্ধৈঃ তদ্বত্তাসিদ্ধেঃ ন তে পৃথক্ আলোচনীয়াঃ।। ৪।।

এই গ্রন্থ বেদান্তের প্রকরণ অর্থাৎ বেদান্তের মূল ভাবের প্রতিপাদক। সুতরাং বেদান্তের যে অনুবন্ধ এখানেও সেই অনুবন্ধ বলে সেগুলির আর পৃথক আলোচনা করা হলো না।।৪।।

অমৃত টীকা : প্রকরণ গ্রন্থ বলতে বোঝায়—প্রবৃত্তিপ্রয়োজক-জ্ঞানবিষয়ত্বম্ অনুবন্ধম্—অর্থাৎ যে বিষয়ের জ্ঞান হলে লোকের তদনুষ্ঠানের প্রবৃত্তি হয়। আবার,

শাস্ত্রৈকদেশসম্বদ্ধং শাস্ত্রকার্যান্তরে স্থিতম্।
আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতৈঃ।। (পরাশর উপপুরাণ)

মূল শাস্ত্রের একটি অংশকে নিয়ে ভিন্নভাবে শাস্ত্রের মূল ভাবকে প্রকাশ করা হয় যে-গ্রন্থে, পণ্ডিতগণ তাকে প্রকরণগ্রন্থ বলেন। সুতরাং প্রকরণগ্রন্থটি

ভিন্ন হলেও মূল গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বস্তুরই পৃথক আলোচনা বলে মূল গ্রন্থের যা অনুবন্ধ এখানেও সে-সকল অনুবন্ধই কার্যকর। এজন্য সে-সকলের পৃথক বিশদ আলোচনা করা না হলেও সামান্যত তাদের উল্লেখ করেছেন ।।৪ ।।

অনুবন্ধ

তত্র অনুবন্ধো নাম—অধিকারি-বিষয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজনানি ।।৫ ।।

অনুবন্ধ হলো এই চারটি ঃ অধিকারি, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন ।।৫ ।।

অমৃত টীকা ঃ অনুবন্ধ শব্দের অর্থ হলো নিমিত্ত। কি নিমিত্ত, কোন্ ব্যক্তি, কেন এই শাস্ত্রে পড়বেন? শাস্ত্রের সঙ্গে সেই নিমিত্তেরই বা সম্পর্ক কি? এই চারটি নিমিত্তের প্রথমেই অধিকারি নিরূপণ করতে হয়। অধিকারি অর্থে, বুঝতে সমর্থ ব্যক্তি। দ্বিতীয়ত, এই শাস্ত্রের বিষয়টি কি? বিষয় জানা না থাকলে পাঠক এই শাস্ত্র কেন পড়তে যাবেন? তৃতীয়ত, এই শাস্ত্রের বিষয় কি সেই প্রয়োজনসাধনের অনুরূপ? অর্থাৎ বিষয়ের সঙ্গে শাস্ত্রের সম্বন্ধই বা কি? যা পাঠক জানতে চান তা কি এই শাস্ত্রে জানা যাবে? চতুর্থত, বিনা প্রয়োজনে কেউ কিছু করে না। সুতরাং বুঝতে সমর্থ ব্যক্তি কেন এই শাস্ত্র পাঠ করতে অগ্রসর হবেন, তা জানা প্রয়োজন। এরই উত্তরে অনুবন্ধ চারটির আলোচনার প্রথমেই বুঝতে সমর্থ হবে কোন্ ব্যক্তি সেই অধিকারির গুণাবলী নিরূপণ করা হচ্ছে— ।।৫ ।।

অধিকারি নিরূপণ

অধিকারী তু বিধিবৎ-অধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততঃ অধিগত-অখিল-বেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্ত-উপাসনা-অনুষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-কল্মষতয়া নিতান্ত-নির্মল-স্বান্তঃ, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা ।।৬ ।।

বেদান্তের অধিকারি তিনি, যিনি এজন্মে বা আগেকার জন্মে বিধিপূর্বক বেদবেদান্ত পাঠ করে মোটামুটি অর্থ বুঝেছেন, কাম্য-কর্ম ও শাস্ত্র-নিষিদ্ধ কর্ম

ত্যাগ করে নিত্য নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা করে সকল পাপ দূর করে অত্যন্ত নির্মল চিত্তের অধিকারি হয়ে চারটি সাধনকে অবলম্বন করেছেন ॥৬॥

অমৃত টীকা ঃ ধর্ম-জিজ্ঞাসা থেকে আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুর পার্থক্য সূচনা করতে মূলে 'তু' শব্দটির ব্যবহার। নতুবা 'তু' শব্দের অর্থ পাওয়া যায় না। কারণ বেদপাঠক মাত্রেরই তো ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার জন্মে না। পরন্তু যাঁদের জানবার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে, তাঁদের ধর্ম-বিচার অর্থাৎ যজ্ঞাদি সম্পর্কে আলোচনা বা ধর্ম অনুষ্ঠান অর্থাৎ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করার আগেও বেদান্তপাঠের বলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জেগেছে, এরূপ দেখা যায়। ব্রহ্মচর্য অবস্থায় বেদপাঠকালেই বৈরাগ্য জন্মে ও ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা দেখা যায়। তাঁরা যে সকলে বেদান্ত সম্যক্‌ভাবে বুঝেছেন এমনও নয়। আবার গৃহস্থ হয়ে পিতৃমাতৃঋণ, ঋষিঋণ বা দেবঋণ শোধ করেছেন এমনও নয়। শাস্ত্রে যে সন্ন্যাসগ্রহণের বিধান ঃ 'ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ। অনাপকৃত্য মোক্ষস্তু সেবমানো পতত্যধঃ ॥' তিনটি ঋণ শোধ করে মন মোক্ষধর্মে নিবিষ্ট করবে, ঋণত্রয় শোধ না করে মোক্ষধর্ম সেবা করলে অধোগতি প্রাপ্ত হবে—এরূপ বিধান মেনে সন্ন্যাসী হন, এমনও নয়। এভাবে যাঁরা সন্ন্যাসী হন, তাঁদের বিষয়েও শাস্ত্র সমর্থন রয়েছে, যেমন—'যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ।' অথবা যখন বৈরাগ্য হবে, ব্রহ্মচর্য অবস্থা থেকেও সন্ন্যাস গ্রহণ করবে—এরূপ বিধান বলে, গৃহস্থ হয়ে ঋণত্রয় শোধ না করে, যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠান না করেই যাঁরা সন্ন্যাসী হয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু অর্থাৎ মোক্ষধর্মে অনুরক্ত, তাঁদের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে, এ-জন্মে না হলেও, গত জন্মে তাঁদের ও-সকল করা হয়ে গেছে। এজন্যে 'জন্মান্তরে বা' বলা হয়েছে। কিন্তু কাম্য-নিষিদ্ধ-কর্ম-বর্জন করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হলে ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার জন্মে। কারণ শাস্ত্রই বলেছেন, 'ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ'—ব্রহ্মচর্য থেকেই সন্ন্যাস নেবে। 'যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ' [জাবাল ৪]। —যেদিনই বৈরাগ্য হবে সেদিনই সন্ন্যাস নেবে। অথবা প্রশ্ন করা হয়েছে, 'কিমর্থাবয়মধ্যেষ্যামহে কিমর্থাবয়ং যক্ষ্যামহে' কিংবা 'কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মেতি' [বৃহ]—'কেনই বা আমরা বেদপাঠ করব, কেনই বা যজ্ঞ করব?' কিংবা 'প্রজা দ্বারা আমরা কি করব? কারণ আমরা স্বর্গাদি চাই না, আত্মাকে জানতে চাই।' ছান্দোগ্য-উপনিষদে স্পষ্টই বলা হয়েছে, 'যে প্রজামীষিরে তে শ্মশানানি ভেজিরে'—যাঁরা প্রজা কামনা করেন তাঁরা শ্মশান ভজনা করেন, আর 'যে প্রজাং নেষিরে তে অমৃতত্বং হি ভেজিরে'—যারা অমৃতত্ব চান তার প্রজা কামনা করেন না। সুতরাং কৃতসন্ন্যাস

বালব্রহ্মচারীর শুদ্ধ মনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আপনা থেকেই জাগে। তার কারণ অবশ্য বলতে হবে, পূর্ব পূর্ব জন্মে প্রজাদি প্রাপ্তি ও ভোগ করায় এবং বেদাদি পাঠ করে আত্মবিষয়ে সামান্যত ধারণা হওয়াতেই যে তাদের কৌমার বৈরাগ্য হয়েছে, এ স্বীকার করতেই হয়। আরো কথা, ধর্মপালনে স্বর্গাদিপ্রাপ্তি এবং সে পুণ্যসংস্কারও বন্ধনের কারণ বলে ব্রহ্মপ্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায়। সুতরাং, ধর্ম অনুষ্ঠানের ফলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হবেই, এরূপ কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই। ক্রিয়াপথ ও তার গন্তব্য এক, আর মোক্ষপথ ও তার গন্তব্য ভিন্ন। কাজেই কেবল শাস্ত্রীয় কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম বর্জন করে নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্ত-উপাসনার দ্বারাই ব্রহ্মাত্মৈক্য বোধ হয় না, চিত্ত শুদ্ধ হয়, একথাই 'নিতান্ত নির্মল স্বান্তঃ' বলে বলা হচ্ছে। স্বান্তঃ মানে অন্তঃকরণ। মন শুদ্ধ হলে ঈশ্বরলাভের আকাঙক্ষা জাগে ও তার জন্য স্বতন্ত্র সাধন দরকার। এজন্য সাধনচতুষ্টয়ের কথা বলা হলো। সাধনচতুষ্টয় কি তা পরে বলা হবে। এ-প্রসঙ্গে নিত্যাদি কর্মের যে ফল তাও পরে বলা হবে এবং তাতে বোঝা যাবে যে, ঐ সকল কর্মের দ্বারা ব্রহ্মলাভ হয় না। এখন প্রশ্ন হলো, কাম্য-নিষিদ্ধাদি কর্ম কি? ।।৬।।

কাম্য কর্ম

কাম্যানি—স্বর্গাদি-ইষ্ট-সাধনানি, জ্যোতিষ্টোমাদীনি।।৭।।

কাম্য কর্ম হলো—স্বর্গ ও অন্যান্য সুখলাভের জন্য বেদশাস্ত্রে যে-সকল যজ্ঞাদি কর্মের উপদেশ করা হয়েছে সে-সকল কর্ম। উদাহরণ জ্যোতিষ্টোম, সোম-যাগ প্রভৃতি। অর্থাৎ ফললাভের জন্য বিহিত কর্ম।।৭।।

নিষিদ্ধ কর্ম

নিষিদ্ধানি—নরকাদি-অনিষ্টসাধনানি ব্রহ্মহননাদীনি।।৮।।

নিষিদ্ধ কর্ম হলো—নরক 'আদি' অনিষ্ট সাধক কর্ম। যেমন ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি।।৮।।

অমৃত টীকা : 'নরক-আদি' আদি পদে শারীরিক দুঃখগ্রহ। ব্রহ্মহত্যা 'আদি' পদে সুরাপানাদি বুঝতে হবে। ধর্ম কর্মের ফল সুখ, নিষিদ্ধ পাপকর্মের ফল দুঃখ। সুখ-দুঃখের অন্য কোন কারণ নেই।।৮।।

নিত্য কর্ম

নিত্যানি—অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি ॥৯॥

নিত্য কর্ম হলো—যা না করলে সঞ্চিত পাপ থেকে যায়, যেমন সন্ধ্যা-বন্দনা প্রভৃতি ॥৯॥

অমৃত টীকা : মূলে আছে, যা না করলে পাপ হয়। কিন্তু এ অর্থ ঠিক নয়। কারণ অভাব (অকরণ) থেকে কোন ভাবের (এখানে পাপের) উৎপত্তি হতে পারে না। অন্যত্র বলা হয়েছে, সন্ধ্যাবন্দনাদি কাজ করলে সঞ্চিত পাপের ক্ষয় হয় অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধ হয়; না করলে স্বাভাবিক দেহধর্মবশত মানুষের মন দেহেই আবদ্ধ থাকে—শুভ সংস্কার হবার সুযোগ পায় না। 'আদি' পদে পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রভৃতিকে বোঝাচ্ছে। পাপ থাকায় নিত্যাদি কর্মে মন যায় না। নিত্য কর্ম না করার পিছনে এই যুক্তিবশত বলা হয়েছে, যে-কর্মের অননুষ্ঠান সঞ্চিত পাপের জ্ঞাপক, তাই নিত্য কর্ম। আচার্য শঙ্কর বলেন, 'নিত্যাকরণ-নিমিত্তস্য প্রত্যবায়স্য দুঃখরূপস্য আগামিনঃ পরিহারার্থানি নিত্যানীত্যভ্যুপগন্না-নারব্ধফলকর্মক্ষয়ার্থানি। [তৈঃ ভাষ্যারম্ভ দ্রঃ]—অর্থাৎ নিত্য কর্ম না করার জন্য যে আগামী দুঃখরূপ ফল হয় তা নাশ করার জন্যই নিত্য কর্ম করা হয়।—একথা স্বীকৃত হওয়ায় নিত্য কর্ম সঞ্চিত কর্মক্ষয়ের জন্য—একথা মানা যায় না ॥৯॥

নৈমিত্তিক কর্ম

নৈমিত্তিকানি—পুত্রজন্মাদি-অনুবন্ধীনি জাতেষ্ট্যাদীনি ॥১০॥

যে সকল কর্ম কোন নিমিত্ত উপলক্ষে করা হয় তাকে নৈমিত্তিক কর্ম বলে। যেমন পুত্র-লাভ জন্য অবশ্যই করণীয় যজ্ঞ, উপনয়ন ইত্যাদি ॥১০॥

অমৃত টীকা : নিমিত্ত প্রাপ্ত হলে যে-কর্ম অবশ্য করতে হবে। এরূপ বিধান শাস্ত্রে বলা হয়েছে, পুত্র জন্ম হলে ঃ বৈশ্বানরং দ্বাদশকপালং নির্বপেৎ পুত্রে জাতে । পুত্র জন্মালে দ্বাদশকপাল বৈশ্বানর যজ্ঞ করবে। আরো যেমন গৃহদাহ হলে প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য করতে হবে। গ্রহণ উপলক্ষে স্নানও নৈমিত্তিক কর্ম ॥১০॥

প্রায়শ্চিত্ত

প্রায়শ্চিত্তানি—পাপক্ষয়মাত্রসাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি ॥১১॥

প্রায়শ্চিত্ত—যে-সকল কর্ম কেবল পাপক্ষয়ের জন্য করা হয়। যেমন চান্দ্রায়ণ ব্রত প্রভৃতি।।১১।।

অমৃত টীকা ঃ আদি পদে কৃচ্ছ্রাদি ও অন্যান্য ব্রত ধরা হয়েছে।।১১।।

উপাসনা

উপাসনানি—সগুণব্রহ্ম-বিষয়ক-মানস-ব্যাপার-রূপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি।।১২।।

উপাসনা হলো [সগুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক মানস ব্যাপারসমূহ] শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতি ধরে সগুণ ব্রহ্মে মনোনিবেশ করা। যেমন শাণ্ডিল্যবিদ্যা।।১২।।

অমৃত টীকা ঃ মানস ব্যাপার বলতে ভাবনা। ভাবনা ও ধ্যান একই কথা। উপাসনা ও জ্ঞানের পার্থক্য আছে বলে 'মানস ব্যাপার' বলা হয়েছে। নিদিধ্যাসনের সঙ্গেও পার্থক্য নিরূপণের জন্য 'সগুণ ব্রহ্ম' বলা হলো। কারণ, নিদিধ্যাসন বলতে শ্রবণ মনন করে নেতি নেতি বিচারের শেষে যা থাকে তাতে, নির্গুণ ব্রহ্মে মন স্থির রাখা। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' (ছাঃ ৩/১৪/১) থেকে আরম্ভ করে 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরঃ' ইত্যাদি করে ব্রহ্মকে গুণময় রূপে ভাবনার যে-বিধান ঋষি শাণ্ডিল্য দিয়েছেন, তাকে শাণ্ডিল্যবিদ্যা বলে। এখানেও মানস ব্যাপার। দীর্ঘকাল নিরন্তর আদরপূর্বক ব্রহ্ম বিষয়ে যে ভাবনা করা হলো, তা এতদূর পর্যন্ত একাগ্র হবে যে, সাধক সে-সকলের সঙ্গে একীভূত বোধ করবেন, একে উপাসনা বলে। উপ-সমীপে, আসন-স্থিতি, অবস্থান। ধ্যাতা ধ্যেয় একত্ববোধ না হওয়া পর্যন্ত ভাবনাধারা চলতে থাকবে। একত্ববোধে ধ্যান দীর্ঘস্থায়ী হলে সমাধিতে পরিণত হয়।।১২।।

এখন নিত্যাদি কর্মের প্রয়োজন ও সে-সকল ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে করলে যে শ্রেষ্ঠফল লাভ হয় তা বলা হচ্ছে ঃ

নিত্যকর্মের প্রয়োজন

এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনম্। উপাসনানাং তু চিত্তৈকাগ্রম্। 'তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন' ইত্যাদি শ্রুতেঃ [বৃহঃ ৪/৪/২২] **'তপসা কল্মষং হন্তি' ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ।** [মনু ১২/১০৪] **।।১৩।।**

এই সকল নিত্যাদি কর্মের প্রধান প্রয়োজন বুদ্ধিকে শুদ্ধ করা। আর উপাসনার ফল চিত্তের একাগ্রতালাভ। বেদে বলা হয়েছে, 'ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যয়ন, যাগ-যজ্ঞাদি এবং তপস্যার দ্বারা সেই আত্মাকে জানতে ইচ্ছা করেন।' স্মৃতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'তপস্যার দ্বারা পাপ দূর হয়' ।।১৩।।

অমৃত টীকা ঃ চিত্তশুদ্ধিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন। কারণ তাতেই মোক্ষলাভ। চিত্তশুদ্ধি পরম্পরাক্রমে মোক্ষের সাধন হয়। গীতাতেও এই কথা বলা হয়েছে, "স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। স্বকর্ম-নিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তৎ শৃণু।।" [গীতা ১৮।৪৫]। এভাবে আরম্ভ করে গীতায় ১৮।৪৯ শ্লোকে বলা হয়েছে, "অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি।।" সকল বিষয়ে অনাসক্ত, সংযতচিত্ত এবং দেহ ও জীবনে ভোগস্পৃহাশূন্য আত্মজ্ঞ ব্যক্তি সম্যগ্ দর্শনপূর্বক সিদ্ধিলাভ করেন। ৪৫ শ্লোকে যে-সিদ্ধির কথা বলা হয়েছে, তা কর্মজনিত চিত্তশুদ্ধি মাত্র বলে বুঝতে হবে। এ-কথার বিস্তার করে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি গ্রন্থে পরম সিদ্ধিলাভের স্তর এভাবে বলা হয়েছে ঃ "নিত্যকর্ম অনুষ্ঠান থেকে ধর্ম, ধর্মবলে পাপ-নাশ, পাপ নাশে চিত্তশুদ্ধি, তখন নিজের ও সংসারের যথাযথ স্বরূপের ধারণা হয়, তার ফলে সংসারের বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, বৈরাগ্যবলে মুমুক্ষা জাগে, তারপর মোক্ষলাভের উপায় অন্বেষণ, তখনই সর্বকর্মের ত্যাগ-রূপ সন্ন্যাস হয়, তারপর যোগাভ্যাস, যোগাভ্যাসবলে চিত্তের আত্মপ্রবণতা হয়, আত্মধ্যানবলে 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থবোধ হয়, বোধবলে অবিদ্যার উচ্ছেদ ও আত্মস্থিতি লাভ হয়।" এই ক্রমে ব্রহ্মাববোধ জন্মে। মূলে বলা হয়েছে, 'উপাসনানাং তু'— উপাসনাগুলির কিন্তু, 'কিন্তু' শব্দের দ্বারা কর্ম থেকে উপাসনার পার্থক্য দেখানো হয়েছে। উপাসনা ও নিত্যাদিকর্মজনিত চিত্তশুদ্ধির বলে শাস্ত্রপ্রকাশিত ধ্যেয় সগুণ ব্রহ্ম বা জ্ঞেয় নির্গুণ ব্রহ্ম বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা বাড়ে। সূক্ষ্ম অর্থের বোধসামর্থ্যও এতে বাড়ে। এভাবে শুদ্ধাদিক্রমে জ্ঞানের হেতু হওয়া বিষয়ে বেদপ্রমাণ বলা হলো—'তমেতমাত্মানং' ইত্যাদি। স্মৃতি প্রমাণ—'তপসা কল্মষং হন্তি' ।।১৩।।

নিত্য প্রভৃতি কর্মের ফল যদি কেবল চিত্তশুদ্ধিই হয় তবে, বেদ-স্মৃতি পুরাণে যে কর্ম দ্বারা পিতৃলোক ও বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনাবলে দেবলোক লাভ হয়, এরূপ বলা হয়েছে, তার সার্থকতা কি ? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে ঃ

নিত্যাদি কর্মের অবান্তর ফল

নিত্যনৈমিত্তিকয়োরুপাসনানাং চ অবান্তরফলং, পিতৃলোক-সত্যলোক-প্রাপ্তিঃ। 'কর্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকঃ।' [বৃহঃ ১।৫।১৬] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ।।১৪।।**

নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম ও উপাসনার অবান্তর (গৌণ) ফল পিতৃলোক ও সত্যলোকপ্রাপ্তি। 'কর্মের দ্বারা পিতৃলোক এবং বিদ্যার অর্থাৎ উপাসনার দ্বারা দেবলোক [ব্রহ্মলোক] প্রাপ্তি হয়'—এরূপ শ্রুতিতে বলা হয়েছে।।১৪।।

অমৃত টীকা : শাস্ত্রে ৭টি স্বর্গ বলা হয়েছে। একেই লোক শব্দে বলা হয়। তার মধ্যে 'ভূঃ ভুবঃ স্বঃ' এই তিনটিতে সকাম কর্মীদের গতি হয়। মহঃ জন তপঃ ও সত্যলোকে নিষ্কামকর্মী ও উপাসকদের গতি হয়। প্রশ্ন হতে পারে, এ সকল লোক কোথায় অবস্থিত? তার উত্তর বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত হয়েছে—ভূর্লোক বলতে পৃথিবীতে সর্বোচ্চ পর্বত শিখর পর্যন্ত অর্থাৎ যতদূর পা রাখা যায় ততদূর ভূর্লোক। ভূর্লোক ও সূর্যমণ্ডলের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানকে বলে ভুবর্লোক। এরই অপর নাম 'অন্তরিক্ষলোক' ও 'মরীচিলোক'। 'দ্যুলোকাৎ অধস্তাৎ অন্তরিক্ষম্ যৎ তৎ মরীচয়ঃ' [ঐতঃ ১।১।২ ভাষ্য] এই বাক্য থেকে জানা যায়। সূর্য থেকে জ্যোতিশ্চক্রের নাভিস্বরূপ ধ্রুব নক্ষত্র পর্যন্ত স্থানে অবস্থিত লোকসকলকে বলে স্বর্লোক—'দ্যুলোকং স্বর্গাখ্যম্' এই সায়ন ভাষ্য থেকে বোঝা যায়। একেই স্বর্গলোক বা দ্যুলোক বলে। কূর্ম পুরাণে বলা হয়েছে ঃ ঊর্ধ্বঃ যন্মণ্ডলং ব্যোম্নি ধ্রুবো যাবদ্‌ব্যবস্থিতঃ। স্বর্গলোকঃ স সমাখ্যাতঃ। এই লোকসকলের মধ্যেই পর্ব পর্ব বিভাগে বিভক্ত দেবলোক, বায়ুলোক, আদিত্যলোক। আদিত্যকে ছাড়িয়ে স্বর্লোক বা স্বর্গলোকে যথাক্রমে চন্দ্রমা, বিদ্যুল্লোক, বরুণ, ইন্দ্রলোক। ধ্রুবের ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে মহঃ জন তপঃ সত্যলোকের অবস্থান। প্রজাপতি লোককেই মহর্লোক বলে। জন ও তপঃ লোক ব্রহ্মলোকেরই কক্ষাভেদ বলে বলা হয়েছে। চন্দ্রলোক বলতে আমাদের দৃষ্ট চন্দ্রকে বোঝানো হয়নি, তাকে সর্বদাই আদিত্যের ওপরে, আদিত্যলোক ছাড়িয়ে তার অবস্থিতি বলা হয়েছে।

সংক্ষেপে কে কোথায় যাবে বলা হচ্ছে—সকাম কর্মী পিতৃলোকে যাবে। এই লোক স্বর্গলোকের অন্তর্ভুক্ত। সে কথাই এখানে বলা হলো, 'কর্মণা পিতৃলোকঃ'। আর 'বিদ্যয়া দেবলোকঃ' বিদ্যা বলতে উপাসনা। কেবল

উপাসনা-বলে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গতি হতে পারে। তীব্র উপাসনার বলেই তা সম্ভব। সাধারণত সকাম কর্ম ও উপাসনায় দেবলোক বলতে মহর্লোকের নিম্নবর্তী লোকসকলের লাভ; নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনার বলে মহর্লোক ও তার ঊর্ধ্ব ঊর্ধ্ব লোকসকল লাভ হতে পারে। সগুণব্রহ্ম বিদ্যামাত্রের ফলে ব্রহ্মলোকের সর্বোচ্চ স্তরে গতি হয়। কে কোথায় কতদিন থাকে তাও বলা আছে। এসব হলো নিত্য, নৈমিত্তিক, উপাসনার অবান্তর ফল। এর মুখ্য ফল হলো চিত্তশুদ্ধি। আর তাই পরম প্রয়োজন। কারণ, এর দ্বারাই মানুষের মুক্তি বা ঈশ্বরলাভ সম্ভব॥১৪॥

অধিকারি কে তা নিরূপণ করতে গিয়ে সাধন চতুষ্টয়ের কথা বলা হয়েছে। সাধন চতুষ্টয় কি তা বলা হচ্ছে ঃ

চারটি সাধন

সাধনানি—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগঃ শমাদিষট্‌ক-সম্পত্তিঃ মুমুক্ষুত্বানি॥১৫॥

চারটি সাধন—(১) নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার, (২) ইহ ও অমুত্র (স্বর্গ) ভোগের প্রতি বৈরাগ্য, (৩) শম দমাদি ছয়টি গুণের বিকাশ ও (৪) মুক্তির ইচ্ছা॥১৫॥

নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিবেক

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ তাবৎ—ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু, ততোঽন্যৎ অখিলম্ অনিত্যম্ ইতি বিবেচনম্॥১৬॥

নিত্য অনিত্য বস্তুর বিবেক অর্থাৎ বিচার এরূপ ঃ ব্রহ্মই নিত্য বস্তু, তা ভিন্ন অন্য সকল কিছুই অনিত্য, এরূপ স্থির করা॥১৬॥

অমৃত টীকা ঃ বিবেক শব্দের অর্থ হলো পার্থক্য করা বা বিচার করা, নিত্য বস্তু থেকে অনিত্য বস্তুকে আলাদা করা। শ্রুতিতে এ বিষয়ে বলা হয়েছে, 'যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা' [ছাঃ ৭/২৪/১] 'যো বৈ ভূমা তদমৃতম্'—যেখানে একে অন্যকে দেখে না, শোনে না, জানে না, তা ভূমা—'যা ভূমা তাই অমৃত'। এভাবে বিশুদ্ধসত্ত্ব সাধকের কাছে ব্রহ্মই সত্য বলে প্রতিভাত হয়। আর 'যত্রান্যৎ পশ্যতি, অন্যচ্ছৃণোতি, অন্যদ্বিজানাতি

তদল্পং— অথ যদল্পং তন্মর্ত্যং'—যেখানে একে অপরকে দেখে, অপরকে শোনে, অন্যকে জানে—তা অল্প; যা অল্প তা মর্ত্য। এভাবের কথায় সাধক বুঝতে পারে—এক অদ্বিতীয় ভেদাতীত পরম সত্য রয়েছে—তা-ই নিত্য। এ ভিন্ন দৃশ্য খণ্ডিত জগৎ অনিত্য। সত্য বলে দেখায় মাত্র, বাস্তবিক মিথ্যা। এরূপ বিবেচনাই হলো নিত্যানিত্যবস্তু বিবেক।।১৬।।

এইভাবে সামান্যত বস্তুস্বরূপ জানলেও তিনি যে অদ্বিতীয় ও সাধকের নিজ স্বরূপের সঙ্গে অভিন্ন, তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত না হওয়ায় জিজ্ঞাসা থেকে যায় এবং দৃষ্ট ও অদৃষ্ট ভোগের প্রতি আকর্ষণ থাকে। এজন্য বৈরাগ্য দরকার। তাই সাধকের দ্বিতীয় সাধন। বিচারে ব্রহ্ম ভিন্ন যে-সকল বস্তু মিথ্যা বোধ হচ্ছিল তাকে সর্বতোভাবে ত্যাগ। এইটিকেই বলেছেন ঃ 'ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগঃ'।

ইহামুত্রফলভোগ নির্ণয়

ঐহিকানাং স্রক্‌চন্দনবনিতাদিবিষয়ভোগানাং কর্মজন্যতয়া অনিত্যত্ববৎ আমুষ্মিকাণাং অপি অমৃতাদি-বিষয়-ভোগানাং অনিত্যতয়া তেভ্যো নিতরাং বিরতিঃ—ইহামুত্রফলভোগ-বিরাগঃ।।১৭।।

মালা, চন্দন, স্ত্রী প্রভৃতি ভোগ্য বিষয় যেমন কর্মসাধ্য বলে অনিত্য, তেমনি আমুষ্মিক অর্থাৎ স্বর্গাদিতে অমৃতাদি ভোগ্য বিষয়সকলও কর্মসাধ্য বলে অনিত্য। এই উভয় প্রকার ভোগ থেকে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যকে ইহামুত্রফলভোগবিরাগ বলে।।১৭।।

অমৃত টীকা ঃ ভাবটি হলো—লৌকিক ভোগ্য বিষয়সকল কর্ম করেই পাওয়া যায়। কর্ম থেকে যা উৎপন্ন হয় তা নশ্বর, ক্ষণস্থায়ী। লৌকিক বিষয়সকলের মতোই দান-যজ্ঞাদি কর্মের দ্বারা পারলৌকিক স্বর্গাদিপ্রাপ্তি ও সেখানকার ভোগ্য বিষয় সকল লাভ হয়। এগুলিও কর্ম করেই পাওয়া যায়। সুতরাং কর্মজন্য বলে স্বর্গাদিও নশ্বর হতে বাধ্য। নশ্বর এই সকল ভোগশেষে আবার জন্ম-জরাদি হয়। অথচ ব্রহ্মানন্দ নিত্য, অবাধিত। এরূপ বিচার করে নিত্য অবাধিত আনন্দলাভের জন্য ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগ্য পদার্থে সম্পূর্ণ স্পৃহাহীন হওয়াই বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যই মোক্ষপথের প্রধান সাধন।।১৭।।

৩১।৭।২২

ষট্‌সম্পত্তির পরিচয়

শমদমাদয়ঃ তু—শম-দম-উপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধাঃ ॥১৮॥

শমদমাদি হলো—(১) শম, (২) দম, (৩) উপরতি, (৪) তিতিক্ষা, (৫) সমাধান ও (৬) শ্রদ্ধা ॥১৮॥

অমৃত টীকা : এই ছয়টিকে বেদান্তে ষট্‌সম্পত্তি বলে ॥১৮॥

এদের পরিচয় বলা হচ্ছে :

শম

শমঃ তাবৎ-শ্রবণাদি-ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যঃ মনসঃ নিগ্রহঃ ॥১৯॥

শম হলো—শ্রবণাদি অর্থাৎ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন—জ্ঞান-সাধনের অনুকূল বিষয় সকল বাদ দিয়ে অন্য সকল বিষয় থেকে মনকে গুটিয়ে আনা ॥১৯॥

অমৃত টীকা : মন বাহিরের ইন্দ্রিয়ের পরিচালক—সুতরাং মন নিগ্রহ হলে বাহিরের ইন্দ্রিয়সংযম আপনা থেকেই হয় বলে প্রথমে শমের কথা বলা হলো। জ্ঞান বিচার করার কালে মন ব্রহ্মবিষয় থেকে বিচ্যুত হয়ে রূপরসাদি বিষয়ে ধাবিত হয়। যে অন্তঃকরণের বৃত্তি-বিশেষের দ্বারা ঐরূপ ধাবমান মনকে ব্রহ্মবিষয়ে টেনে আনা হয়, তাকে শম বলে ॥১৯॥

দম

দমঃ—বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং তদ্ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যঃ নিবর্তনম্ ॥২০॥

দম হলো বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলিকে সাধন-অনুকূল বিষয় ছাড়া অন্য বিষয় থেকে গুটিয়ে আনা ॥২০॥

উপরতি

নিবর্তিতানাং এতেষাং তৎ ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যঃ উপরমণম্ উপরতিঃ অথবা বিহিতানাং কর্মণাং বিধিনা পরিত্যাগঃ ॥২১॥

নিবর্তিত ইন্দ্রিয় সকল যাতে ব্রহ্ম-বিষয় ছেড়ে পুনরায় বিষয়মুখী না হয় এরূপ করা অথবা বিহিত কর্মফল বিধিপূর্বক ত্যাগ করাকে উপরতি বলে ॥২১॥

অমৃত টীকা ঃ শম, দম ও উপরতি যেন একটিই বলে বোধ হয়। কারণ শম অর্থাৎ মনকে নিয়ন্ত্রণ করলেই তো দম হয়। বাহিরের ইন্দ্রিয় নিরুদ্ধ হয় এবং উপরতিও তো ইন্দ্রিয়গুলির স্ব স্ব বিষয় থেকে প্রত্যাহৃত মনকে পুনরায় বিষয়ে নিযুক্ত না করা। তবে উপরতি ও শমে পার্থক্য কোথায়? এজন্য উপরতি শব্দের ভিন্ন অর্থ করা হলো অথবা বিহিত অর্থাৎ বেদোক্ত অবশ্য করণীয় কর্ম থেকে বিধিপূর্বক অর্থাৎ যজ্ঞাদি করে অগ্নিতে আহুতি দিয়ে প্রতিজ্ঞা করে কাম্য অগ্নিসাধ্য কর্মের ত্যাগ। এরূপ ত্যাগকেই সন্ন্যাসগ্রহণ বলে। উপরতি শব্দে সন্ন্যাসগ্রহণ বোঝায়।

কিন্তু বাহিরের অগ্নিসাক্ষী করে ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেই তো মনের বিষয় বাসনা যায় না? তবে উপরতি ও শমে ভেদ কোথায়? শম তো মনের নিগ্রহ। এ বিষয়ে স্বামীজীর আলোচনাটি স্পষ্ট। জ্ঞানমার্গের সাধকের প্রথম আবশ্যক শম ও দম। বাহিরের ইন্দ্রিয়গুলি যন্ত্রমাত্র, সত্যকারের ইন্দ্রিয় মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রে অবস্থিত। বাহিরের যন্ত্র ও অন্তরের স্নায়ুকেন্দ্রের সঙ্গে মন যুক্ত না হলে দর্শন স্পর্শন শ্রবণাদি হয় না। দম হলো বাহিরের ইন্দ্রিয়যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা, শম হলো ভিতরের ইন্দ্রিয়ের স্নায়ুকেন্দ্রকে নিয়মিত করা এবং উপরতি হলো ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি সম্বন্ধে চিন্তা না করা। উপরতির অভাবে মানুষ ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে কল্পনা করে ভিতরের ইন্দ্রিয় কেন্দ্রকে উত্তেজিত করে এবং তার ফলে বাহিরের ইন্দ্রিয়যন্ত্র কর্মপ্রেরণা লাভ করে। এজন্যই শাস্ত্রে উপরতি সম্পর্কে একথা বলা হয় যে, ইন্দ্রিয়-মনকে বিষয় থেকে ফিরিয়ে এনে যাতে আর বিষয়চিন্তা না করা হয়—এরূপ করাকে উপরতি বলে—অর্থাৎ যে চিন্তা বা মনোবৃত্তি বিশেষের দ্বারা বিষয়চিন্তার স্রোত রুদ্ধ হয় তাকেই উপরতি বলে ॥২১॥

পরবর্তী সাধন তিতিক্ষা।

তিতিক্ষা

তিতিক্ষা—শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা ॥২২॥

শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব (যুগল) সহ্য করাকে তিতিক্ষা বলে ॥২২॥

অমৃত টীকা : শীতোষ্ণাদি, আদি পদে মান-অপমান, লাভ-অলাভ, শোক-হর্ষ প্রভৃতি যুগলকে বুঝতে হবে। সমগ্র সৃষ্টিই যুগল ভাবের। যুগল ভাবকে সহ্য করতে হবে। কোন্ দৃষ্টিতে তা সহ্য করা যাবে? আচার্য শঙ্কর বলছেন, 'সহনং সর্বদুঃখানাম্ অপ্রতিকারপূর্বকং চিন্তাবিলাপরহিতম্'। প্রতিকার না করে, চিন্তা বা সেই বিষয়ে কোন কথা না বলে সকল দুঃখকে সহ্য করাই তিতিক্ষা। কিন্তু কি ভাবসহায়ে তা করা যায়? আত্মভাবে নিজেকে পূর্ণ করে— অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চিদ্রূপ আমাতে শীতোষ্ণাদির অত্যন্ত অভাব, এরূপ ভাবনায় মনকে যুক্ত রেখে সহ্য করাই তিতিক্ষা।

তিতিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন ... "তিতিক্ষা দার্শনিক জীবনে দুঃসাধ্য সাধন!—এই সাধনটি সর্বাধিক দুষ্কর। অন্যায়ের প্রতিরোধ না করা সহিষ্ণুতার চরম আদর্শ; তিতিক্ষা এ থেকে কোন অংশে ন্যূন নয়। ... বাহ্যত অন্যায়ের প্রতিরোধ না করতে পারি কিন্তু তজ্জন্য অন্তরে দুঃখবোধ হতে পারে। ...এ আদর্শ অপ্রতিরোধ নয়। এই আদর্শানুসারে আমার মনেও কোন ঘৃণা অথবা ক্রোধের ভাব থাকা উচিত নয়, এমন কি প্রতিরোধের চিন্তাও নয়; আমার মন এত স্থির ও শান্ত থাকবে যেন কিছুই ঘটে নাই। ... দুঃখ প্রতিরোধ করবার অথবা দূর করবার চিন্তামাত্র না করে মনে কোন দুঃখময় অনুভূতি বা অনুশোচনা না রেখে সর্ববিধ দুঃখের যে সহন—তাই তিতিক্ষা।" (বাণী ও রচনা ২/৩৮৪-৫)।।২২।।

সমাধান

নিগৃহীতস্য মনসঃ শ্রবণাদৌ তদনুগুণবিষয়ে চ সমাধিঃ— সমাধানম্।।২৩।।

নিগৃহীত মনের শ্রবণ প্রভৃতিতে এবং তার উপকারক বিষয়ে একাগ্র করাকে সমাধান বলে।।২৩।।

অমৃত টীকা : শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ, এই পাঁচটি বিষয় থেকে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে গুটিয়ে এনে ঈশ্বর বিষয়ে লাগিয়ে রেখে মনকে একাগ্র করা। ঈশ্বরলাভের সহায়ক অমানিত্বাদি সাধনে লাগানো, এই হলো তদ্ অনুগুণ বিষয়। এভাবে নিরন্তর ঈশ্বরতত্ত্বে বা আত্মতত্ত্বে মনোনিবেশ করা। অনুগুণ বিষয় সম্পর্কে অপরের মত হলো, শাস্ত্রাদি গ্রন্থ সম্পাদন, রক্ষণ ও গুরুশুশ্রূষা। আশ্রম সেবাদিও বোঝায়। কেহ বা আশ্রম সেবাকে 'তদ্অনুগুণ' বিষয় বলতে সম্মত

নন। শাস্ত্রাদিরক্ষণ ও আশ্রম সেবা প্রথমাধিকারীর পক্ষে প্রযোজ্য।

স্বামীজী বলেছেন, "সমাধান অর্থাৎ মন ঈশ্বরে একাগ্র করবার নিয়ত অভ্যাস" ।।২৩।।

শ্রদ্ধা

গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা।।২৪।।

গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে।।২৪।।

অমৃত টীকা ঃ গুরু ও বেদান্ত বাক্য যথাযথ, তাতে ভুল নেই; যেরূপ বলেছেন, সেইরূপই সত্য—এরূপ আস্থাস্থাপনকে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা বলে।

স্বামীজী ধর্ম ও ঈশ্বরে প্রগাঢ় বিশ্বাসকে বুঝিয়েছেন শ্রদ্ধা শব্দে। ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "যতক্ষণ এই বিশ্বাস না হয়, ততক্ষণ কেহ জ্ঞানী হবার উচ্চ আশা পোষণ করতে পারে না। একসময় একজন মহাপুরুষ আমাকে বলেছিলেন যে, এই জগতে দুইশতকোটি লোকের মধ্যে একজনও ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, 'মনে কর এই ঘরে একটি চোর রয়েছে এবং সে জানতে পারল, পাশের ঘরে রাশিকৃত সোনা আছে; ঘর দুটির মাঝে একটি খুব পাতলা পরদা রয়েছে। আচ্ছা, সেই চোরটির কি অবস্থা হবে?' আমি উত্তর দিলাম, চোরটি একেবারে ঘুমাতে পারবে না; তার মস্তিষ্ক সক্রিয়ভাবে সেই সোনা হস্তগত করার উপায় উদ্ভাবন করতে থাকবে এবং তার অন্য কোন চিন্তা থাকবে না। তদুত্তরে তিনি বললেন, 'তুমি কি বিশ্বাস কর, কোন মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য পাগল হয়ে যাবে না? যদি কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে এক অসীম অনন্ত আনন্দের আকর রয়েছে এবং তা লাভ করা যায়, তাহলে তা লাভ করার চেষ্টায় সে কি পাগল হবে না?' ঈশ্বরে দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁকে লাভ করবার জন্য অনুরূপ আগ্রহকেই বলে শ্রদ্ধা।" [বাণী ও রচনা ২/৩৮৫] বেদান্ত শাস্ত্র অভ্রান্ত। গুরুর ও বেদান্তবাক্য অভ্রান্ত সত্য, এরূপ বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। গুরু যদি বেদান্ত শাস্ত্রের বিরুদ্ধ মত বলেন, তবে কাকে বিশ্বাস করা যাবে? এখানে গুরু ও বেদান্ত উভয়কে এক করে বলা হয়েছে—পাঠান্তরেও দেখা যায়, গুরূপদিষ্ট-বেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা। গুরুত্বটা বেদান্ত বাক্যের ওপরই। কারণ সদ্‌গুরু বেদান্তবাক্যজনিত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে মুক্ত হন। এবং উপনিষদ্ থেকেই মাত্র এই তত্ত্ব জানা যায়। তাঁদের অনুভব কখনো বেদান্তবিরুদ্ধ হয় না। বেদ নিত্য

সত্যের প্রকাশ। তদনুরূপ জ্ঞানলাভ ও ব্যাখ্যা করাই আচার্যদের আচার্যত্ব। শ্রীকৃষ্ণও স্বয়ং বলেছেন, আমাকে আচার্য বলে জানবে। তাই গুরু-উপদিষ্ট বেদান্তবাক্যে বিশ্বাসকেই বলে শ্রদ্ধা ।।২৪ ।।

মুমুক্ষুত্ব

মুমুক্ষুত্ব—মোক্ষেচ্ছা ।।২৫ ।।

মুক্তির ইচ্ছা মুমুক্ষুত্ব ।।২৫ ।।

অমৃত টীকা ঃ মুক্তি হলো জ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যা ও তার কার্যসমূহকে লয় করে ব্রহ্ম ও আত্মা এক—এইভাবে অবস্থান। সকল কামনা দূর হলেই জীব অমৃত হয়। তবে মুক্তির ইচ্ছাও তো কামনা, তাও কি দূর করতে হবে? এর উত্তর—অনাত্মবিষয়ের ইচ্ছাকেই কামনা বাসনা বলে—মুক্তির ইচ্ছা আত্মবিষয়ক বলে তা বন্ধনের কারণ নয়। শ্রুতিতে বলা হয়েছে ঃ অকাময়মানো যঃ অকামঃ নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামঃ। [বৃহঃ ৪/৪/৬] এভাবে আত্মকামকে অকাম নিষ্কাম বলা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, মুক্তি বা ভক্তিকামনা কামনার মধ্যে নয়। যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। কারণ অন্য শাকে মলবৃদ্ধি করে, পরন্তু হিঞ্চে শাকে পিত্তনাশ হয়। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়, ইত্যাদি। এতক্ষণ অধিকারির বিষয় আলোচিত হলো ।।২৫ ।।

অধিকারির গুণের উপসংহার

এবংভূতঃ প্রমাতা অধিকারী 'শান্তো দান্তঃ' [বৃহঃ ৪/৪/২৩] ইত্যাদি শ্রুতেঃ। উক্তংচ "প্রশান্তচিত্তায় জিতেন্দ্রিয়ায় চ প্রক্ষীণদোষায় যথোক্তকারিণে। গুণান্বিতায়ানুগতায় সর্বদা প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্ষবে" ইতি [উপদেশসাহস্রী ৩২৪, ১৬/৭২] **।।২৬।।**

এইরূপ গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই যথার্থ অধিকারি। যেহেতু বেদে বলা হয়েছে ঃ 'শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষাবান্, একাগ্রচিত্ত হয়ে আত্মাতেই আত্মদর্শন করবে' স্মৃতিতে বলা হয়েছে ঃ 'শান্ত, দান্ত ক্ষীণপাপা, নির্মলচিত্ত, কাম্যাদি ত্যাগী ও নিত্যকর্মানুষ্ঠানকারী, বিবেক বৈরাগ্যাদি গুণযুক্ত, সর্বদা গুরুর অনুগত মোক্ষকামী ব্যক্তিকে গুরু সর্বদা আত্মজ্ঞান উপদেশ করবেন'। [উপদেশসাহস্রী] ।।২৬।।

অমৃত টীকা : বেদে বলা হয়েছে ঃ 'শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।' এভাবে বৃহদারণ্যকের কান্বশাখায় বলা হয়েছে। পরন্তু উক্ত উপনিষদের মাধ্যন্দিন শাখায় সমাহিত পদের স্থানে 'শ্রদ্ধাবিত্তো ভূত্বা' থাকায় বেদবিরোধের সামঞ্জস্য করা হয়েছে, অবিরোধ অংশ অর্থাৎ গুণোপসংহার ন্যায় বলে 'সমাধান ও শ্রদ্ধা' উভয় পদ গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্য সাধন সম্পদ ছয়টি—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা। গীতাতেও শ্রীভগবান ছয়টি সাধনের কথা বলেছেন। যথা ঃ 'যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে' [৬/৩] বাক্যে শম; 'যদা সংহরতে' [২/৫৮] শ্লোকে 'দম'; 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' [১৮/৬৬] এই শ্লোকে 'উপরতি'; 'মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ' [২/১৪] পদে 'তিতিক্ষা'; 'সমাধাবচলা বুদ্ধিঃ' [২/৫৩] পদে 'সমাধি' এবং 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং' [৪/৩৯] পদে 'শ্রদ্ধাকে' বলেছেন [বি.টীকা]। এ-বিষয়ে উপদেশসাহস্রী থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, প্রশান্তচিত্তায় ইত্যাদি, অর্থ স্পষ্ট।।২৬।।

অনুবন্ধ চারটির প্রথমটিতে 'অধিকারি' বিষয়ে বলার পর এখন দ্বিতীয়টিতে 'বিষয়'-এর আলোচনা করা হচ্ছে। প্রশ্ন, বেদান্তের বিষয় কি?

বিষয় নিরূপণ

বিষয়ঃ— জীব-ব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধচৈতন্যং প্রমেয়ং, তত্র এব বেদান্তানাং তাৎপর্যাৎ।।২৭।।

বিষয় হলো ঃ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য। শুদ্ধচৈতন্যরূপ প্রমেয়ই বেদান্তশাস্ত্রের বিষয়, যেহেতু শুদ্ধচৈতন্যই সকল বেদান্তের তাৎপর্য।।২৭।।

অমৃত টীকা : অবিদ্যা আরোপিত সর্বজ্ঞত্ব অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্ম বাদ দিলে অবশিষ্ট যে শুদ্ধ চৈতন্য থাকেন, তা-ই সকল বেদান্তবাক্যের বিষয়। চৈতন্যের পূর্বে 'শুদ্ধ' বিশেষণের অর্থ কি? সর্বজ্ঞ ঈশ্বর ও অল্পজ্ঞ জীব—এই দুই মিলেমিশে এক—এরূপ শঙ্কা হতে পারে। তার উত্তরে 'শুদ্ধ' শব্দ দ্বারা বলা হলো যে, চৈতন্য সকল ধর্মাতীত একস্বরূপ। সকল শাস্ত্রের এটাই বিষয়, শ্রুতিস্মৃতিতেও এই কথা বলা হয়েছে। যেমন কঠ-উপনিষদে, 'সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি'—সকল বেদ যে পদকে নির্দেশ করেছেন ইত্যাদি। গীতাতে, 'বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যঃ'—সকল বেদে আমি (ঈশ্বর) একমাত্র বেদ্য বস্তু ইত্যাদি বলা হয়েছে। সুতরাং নিখিল শাস্ত্রের একই বিষয়—ব্রহ্মচৈতন্যের আত্মা-অভিন্নত্ব বোধ করানো।।২৭।।

সম্বন্ধ নিরূপণ

সম্বন্ধঃ তু—তদৈক্য প্রমেয়স্য তৎপ্রতিপাদক-উপনিষৎ-প্রমাণস্য চ বোধ্য-বোধকভাব-লক্ষণঃ।।২৮।।

সেই জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যরূপ প্রমেয় বিষয় এবং তার বোধক উপনিষদ্ বাক্যরূপ প্রমাণের সম্বন্ধ হয় বোধ্য-বোধক ভাব।।২৮।।

অমৃত টীকা : শাস্ত্র তো অসম্বদ্ধ প্রলাপ করেন না। প্রমেয় জীবব্রহ্মের একতা বোধ হলো আলোচ্য বিষয়; অর্থাৎ বোধ্য বিষয় এবং বেদান্ত বাক্যরাশি তার বোধক—বিষয়ের সঙ্গে শাস্ত্রের এরূপ ভাবলক্ষণ সম্বন্ধ। শাস্ত্র হলো বোধক, বিষয় হলো বোধ্য। এই বোধ্য-বোধক সম্বন্ধকে প্রতিপাদ্য-প্রতিপাদক সম্বন্ধও বলা হয়।।২৮।।

প্রয়োজন নিরূপণ

প্রয়োজনং তু—তৎ ঐক্য প্রমেয়গত অজ্ঞান-নিবৃত্তিঃ স্বস্বরূপ-আনন্দ-অবাপ্তিঃ চ—'তরতি শোকম্ আত্মবিৎ' [ছাঃ ৭/১/৩] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ, 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি'** [মুঃ৩/২/৯] **ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।।২৯।।**

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যই জীব জানে না, সেই না-জানারূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি এবং জীবের স্বরূপগত আনন্দলাভই প্রয়োজন। শ্রুতিতে বলা হয়েছে, 'আত্মজ্ঞ ব্যক্তি শোককে অতিক্রম করেন' । 'যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান'।।২৯।।

অমৃত টীকা : অজ্ঞানমোহ-অন্ধকারে আবৃত জীব তার স্বরূপ যে ব্রহ্মই তা জানে না। গুরু-উপদিষ্ট বেদান্ত-বাক্যে সেই মোহান্ধকার দূরীভূত হলে জীব তার স্বরূপানন্দ লাভ করে মুক্ত হয়। এই অবাধিত নিত্য আনন্দস্বরূপের বোধই জীবের প্রয়োজন, তাতেই সংসার ও পুনর্জ্জন্মনিবৃত্তি।

এখন শাস্ত্র আরম্ভক নিমিত্ত অধিকারি ইত্যাদি বলার পর শাস্ত্র আরম্ভের প্রস্তাবনা করা হচ্ছে। অথবা এরূপ অধিকারি কি করবেন তা বলে শাস্ত্র আরম্ভ করা হচ্ছে।।২৯।।

শাস্ত্রারম্ভ - অধিকারির কর্তব্য

অয়মধিকারী জনন-মরণাদি সংসারানলসন্তপ্তঃ, দীপ্তশিরা জলরাশিম্-ইব উপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তম্ অনুসরতি। 'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুম্ এব অভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্' [মুঃ উঃ ১/২/১২] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ ।।৩০।।**

যার মাথায় আগুন লেগেছে সে যেমন দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়ে জলের দিকে ছোটে, সেরূপ জন্ম, মরণ প্রভৃতি সংসারাগ্নিতে সন্তপ্ত হয়ে এইরূপ (পূর্বোক্ত) অধিকারি কোনদিকে না তাকিয়ে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর কাছে উপঢৌকন হাতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে অনুসরণ করেন। এ বিষয়ে মুণ্ডকশ্রুতি প্রমাণ, যথা—'সেই অধিকারি সমিধ্ (উপযুক্ত উপচার) হাতে বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মপরায়ণ গুরুর কাছে তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থে যাবেন' ইত্যাদি।।৩০।।

অমৃত টীকা ঃ শ্রোত্রিয় অর্থে বেদজ্ঞ—বেদ, বেদাঙ্গ-পারঙ্গম অথবা বেদান্তের তাৎপর্যবেত্তাকে বোঝায়, তাতে আলোচ্য বিষয়ের অনুকূল শ্রোত্রিয় শব্দে অকামহত ও অবৃজিনও (সরল) বোঝানো হলো। 'যশ্চ শ্রোত্রিয়ঃ অবৃজিনঃ অকামহতঃ'—এরূপ শ্রুতিতে থাকায় ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন শ্রোত্রিয়ত্ব, অবৃজিনত্ব ও অকামহতত্বকে বোঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে শ্রোত্রিয়ত্ব ও অবৃজিনত্ব নিয়ত থাকবে। অকামহত অর্থে ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন অন্যান্য আনন্দে বিতৃষ্ণাকে বোঝায়। অবৃজিন শব্দে শাস্ত্র অনুযায়ী জীবন—নিষ্পাপত্বকে বোঝায়।

এরূপ গুরু, যিনি বেদবেদাঙ্গ পারঙ্গম, নিষ্পাপ, কামনাহীন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, উপহার নিয়ে তাঁর কাছে যেতে হয়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, 'রিক্তপাণির্ন সেবেত রাজানং দেবতাং গুরুং' [মহাভারত ৭/৭/৮৬]—খালিহাতে রাজা, দেবতা ও গুরুর কাছে যেতে নেই। [বি টীকা] সমিৎ শব্দে গুরুর উপযুক্ত উপায়নকে বোঝানো হয়েছে। গুরুর কাছে গিয়ে 'তম্ অনুসরতি'—তাঁকে অনুসরণ করবে। অনুসরণ বলতে মনঃ বাক্ কায় কর্ম দিয়ে সেবা। বিদ্যার্থীর অবশ্য কর্তব্য গুরু-সেবা। সেবা বলতে তাঁর ইচ্ছানুরূপ কাজ করা, মনো অনুকূল সেবা।।৩০।।

গুরুর কর্তব্য

স গুরুঃ পরমকৃপয়া অধ্যারোপ-অপবাদন্যায়েন এনম্-উপদিশতি। 'তস্মৈ স বিদ্বান্ উপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায়

শমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং, প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্' [মুঃ উঃ ১/২/১৩] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ।।৩১।।**

সেই গুরু পরম কৃপায় অধ্যারোপ অপবাদ এই দুই যুক্তিতে শিষ্যকে উপদেশ দেন। কেননা শ্রুতিতে বলা হয়েছে, জ্ঞানী গুরু প্রশান্তচিত্ত, শমযুক্ত, সম্যক্-রূপে গুরুর অনুগত সেই শিষ্যকে সেই বিদ্যা তত্ত্বত বলবেন যে-বিদ্যার দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়। ইত্যাদি।।৩১।।

অমৃত টীকা : 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ' [ছাঃ ৬/১৪/২] 'আচার্যাৎ হি এব বিদ্যা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তি।' [ছাঃ ৪/৯/৩] 'গুরু কর্তৃক উপদিষ্ট ব্যক্তি জানেন'; 'গুরুমুখে বিজ্ঞাত বিদ্যাই কল্যাণতম হয়ে থাকে।' গুরুর শিষ্যের কাছে চাইবার বা পাবার কিছু নেই—সুতরাং কৃপাই একমাত্র হেতু। শরণাগত জনের ক্লেশ দেখে গুরু কৃপা করে তাকে উপদেশ করতে প্রবৃত্ত হন। সদ্গুরু এরূপ গুণান্বিত শিষ্যকে উপদেশ করবেন, এই-ই তাঁর কর্তব্য। শিষ্যকে ফেরত দেবেন না। কিভাবে উপদেশ করবেন, তারও কোন সঠিক নির্দেশনা হতে পারে না। কারণ সমর্থ গুরু শিষ্যের সংস্কার ও ক্ষমতা বুঝে উপদেশ করে থাকেন। তবে এখানে যে ক্রমনির্দেশ বলা হলো? বেদান্ত শাস্ত্রকে বোঝাবার জন্যই এখানে এরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।।৩১।।

অধ্যারোপ ও অপবাদের পরিচয় বলা হচ্ছে ঃ

অধ্যারোপ পরিচয়

অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্প আরোপবৎ বস্তুনি অবস্তু-আরোপঃ—অধ্যারোপঃ।।৩২।।

সাপ নয় এমন যে দড়ি, তাতে যেমন সাপের আরোপ হয়, সেরকম বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলে।।৩২।।

অমৃত টীকা : অধ্যারোপ হলো ভ্রম। রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জুর সঙ্গে সাপের কোন সম্পর্ক নেই অথচ রজ্জু না দেখে সাপ দেখা। সার কথা হলো, সত্য কোন বস্তুতে অসত্য অন্য কোন বস্তুর জ্ঞান করাকে অধ্যারোপ বলে।

প্রশ্ন হতে পারে, অবস্তু অর্থাৎ যার অস্তিত্বই নেই, তার অধ্যাস কেমন করে হতে পারে? যে বস্তু আগে দেখা গেছে, তাকেই ভুল করে অন্য বস্তুতে আরোপ করা যেতে পারে। আকাশকুসুম কখনো ভিন্ন কোন বস্তুতে ভুল করে

কেউ দেখে না। আগেকার জানা কোন বস্তুই ভিন্ন বস্তুতে আরোপিত হয়ে থাকে। সংস্কার থেকে উৎপন্ন স্মৃতির আরোপ হয়ে ভুল হয়। স্মৃতি মানেই তো পূর্বদৃষ্ট বস্তুর সংস্কার থেকে উৎপন্ন মনোবৃত্তিমাত্রকে বোঝায়। পূর্বদৃষ্ট সত্য পদার্থেরই স্মৃতি হয়ে থাকে। রজ্জুতে সর্পভ্রমক্ষেত্রেও রজ্জু সত্য পদার্থ, তাতে পূর্বদৃষ্ট সত্য সর্পের স্মৃতির আরোপ হয়ে ভ্রম হতে পারে, কিন্তু অবস্তুর আরোপ কিরূপে হবে? ।।৩২।।

এর উত্তরে বস্তু ও অবস্তুর সংজ্ঞা নিরূপণ করা হচ্ছে ঃ

বস্তু ও অবস্তু নির্ণয়

বস্তু—সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহঃ অবস্তু ।।৩৩।।

সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মই বস্তু, অজ্ঞান ও তা থেকে উৎপন্ন জড়প্রপঞ্চ পর্যন্ত সকলই অবস্তু ।।৩৩।।

অমৃত টীকা ঃ তিনকালে যা একরূপ থাকে তাই সত্য। চৈতন্যই সেই সত্তা, তা দ্বিতীয়হীন আনন্দ-ব্রহ্ম। 'বস্তু' শব্দে এই আত্মাকে বোঝায়। আর অজ্ঞান ও তা থেকে উৎপন্ন, (আকাশাদি ক্রমে উৎপন্ন) এই নিখিল সূক্ষ্ম ও স্থূল সৃষ্ট পদার্থ দৃশ্য, সাবয়ব, বিকারী, সাপেক্ষ বলে তাদের বাস্তবিক কোন সত্তা নেই। ব্যবহারিক সত্তা প্রতীত হলেও এদের কালত্রয়ব্যাপী একরূপতা নেই বলে মিথ্যা, অবস্তু। মিথ্যা শব্দটি পারিভাষিক। এর অর্থ পরে পরিষ্কার হবে।

অতএব উপমার ক্ষেত্রে রজ্জু ও সর্প উভয়েই ব্যবহারিক সত্তা। একটিকে অপরটি বলে ভুল হয়। এই একের (রজ্জুর) সত্যজ্ঞান না হলে সাদৃশ্যবশত অপরের (সর্পের) আরোপ হয়। এই অধ্যারোপ দার্ষ্টান্তিকে যোজনা করলে হবে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে অর্থাৎ বস্তুতে, অজ্ঞানাদি সকল জড়বস্তুর আরোপ। জড়পদার্থাদি কেন অবস্তু? না, বলা হয়েছে, তাদের তিনকালে একরূপতা নেই। সাধারণভাবে যাকে আমরা বস্তু বলি, এখানে সেভাবে বলা হয়নি। তাছাড়া আরোপ হতে গেলে যে পূর্বের সত্যবস্তু থাকতেই হবে, এমন কোন নিয়মও নেই। কারণ সংশয় বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে বস্তুশূন্য ভ্রমও হয়। মানুষ ভাবে, ওহো! আগেও এভাবের ভুল হয়েছিল, এটা স্থাণু না পুরুষ, এখনো সেই ভুল হলো। এভাবে বস্তুশূন্য ভ্রম পরম্পরায় অধ্যারোপ হয়। সুতরাং ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমের

ক্ষেত্রে পূর্বের সত্য জগতের অস্তিত্ব ধরতে হবে; এমত টেকে না। কারণ অসত্য জগতের ভ্রমসংস্কারবশত পরবর্তী কালের দৃষ্ট জগৎকে সত্য বলে ভুল হয়।

উপমার ক্ষেত্রে দুইটি ব্যবহারিক সত্তাকে ধরে বলা হয়েছে রজ্জুতে সর্পভ্রম। বস্তু ও অবস্তুর সংজ্ঞা অনুসারে রজ্জু ও সর্প উভয়েই অবস্তু। সুতরাং উপমা কিভাবে সার্থক হতে পারে? উত্তরে বলা যায়, সত্য বটে উভয়েই অবস্তু, তথাপি সত্তা ভেদ হচ্ছে—অর্থাৎ রজ্জুর ব্যবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু ভ্রমস্থলে দৃষ্ট সর্পের ব্যবহারিক সত্তা নেই; প্রাতিভাসিক সত্তা আছে। বেদান্তে চার প্রকার সত্তা স্বীকৃত। (১) পারমার্থিক সত্তা ঃ যা তিনকালে একরূপ—ব্রহ্মসত্তা; (২) ব্যবহারিক সত্তা ঃ ব্যবহারকালে যা সত্য বলে মনে হয়, কিন্তু প্রতিক্ষণে পরিণামী—উৎপত্তিলয়শীল জগৎ; (৩) প্রাতিভাসিক সত্তা ঃ বস্তু নাই অথচ সাময়িক বোধ হয়। যে আধারে তা কল্পিত হয়, সে আধার দেখলে ভ্রম চলে যায়। বস্তুহীন প্রতীতিমাত্র। ভ্রম বা স্বপ্নকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে দৃষ্ট সর্প প্রাতিভাসিক সত্তা মাত্র; (৪) তুচ্ছ সত্তা ঃ শব্দমাত্রে বোধ হয়, বস্তুর দর্শন হয় না। যেমন আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র।

আলোচ্যক্ষেত্রে আরোপিত সর্প প্রাতিভাসিক সত্তা, রজ্জু ব্যবহারিক সত্তা। সুতরাং ব্যবহারিক সত্তার বোধে প্রাতিভাসিক সত্তার লয় দেখা যায়। তেমনি পারমার্থিক সত্তা ব্রহ্ম-বোধে আরোপিত জগতের অর্থাৎ ব্যবহারিক সত্তার অজ্ঞান সহিত লয় হয়। অতএব উপমা সঙ্গতই হয়েছে। আচার্য অধ্যাসের লক্ষণ বলেছেন, 'অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিঃ'—যেটি যা নয়, তাতে সেই বুদ্ধি। রজ্জু সর্প নয়, অথচ রজ্জুতে সর্পবুদ্ধি করা অধ্যারোপ।

প্রশ্ন হতে পারে, কেন এরূপ ভুল হয়? উত্তর হলো, সত্যবস্তু যথাযথভাবে না জানার দরুনই ভুল হয়। দড়িটার জ্ঞান যথাযথ হলে সাপ বোধ হতো না। যথাযথ জ্ঞান না হওয়া মানে অজ্ঞান। অজ্ঞান মানে কি? যার জন্য যা নয়, তা দেখায়।।৩৩।।

অজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়

অজ্ঞানং তু সদসদ্‌ভ্যাম্ অনির্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি; 'অহম্ অজ্ঞ' ইত্যাদি অনুভবাৎ 'দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্' [শ্বেঃ ১/৩] **ইত্যাদি শ্রুতেশ্চ।।৩৪।।**

সদ্‌রূপে বা অসদ্‌রূপে যাকে বলা যায় না, তিনগুণাত্মক, এক জ্ঞান হলে যা থাকে না, ভাবরূপ একটা কিছু, (জ্ঞানিগণ) অজ্ঞানকে এরূপ বলে। 'আমি অজ্ঞ'—এরূপ অনুভব-বলে অজ্ঞানের অস্তিত্ব বোঝা যায়, এবং 'নিজগুণের দ্বারা আবৃত ঈশ্বরের আত্মশক্তিকে' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণ এ বিষয়ে আছে।।৩৪ ।।

অমৃত টীকা ঃ এই অজ্ঞানকে 'সৎ'—আছে বলে বলা যায় না—কারণ ব্রহ্মজ্ঞান হলে অজ্ঞানের অনুভব হয় না—নাই হয়ে যায়। তাকে 'অসৎ'—নাইও বলা যায় না, কারণ অসৎ বস্তু জগতের পরিণামী কারণ হতে পারে না। অধিকন্তু 'আমি অজ্ঞ' এরূপ অজ্ঞানের প্রত্যক্ষ অনুভব হয়। সৎ ও অসৎ একাধারেও হতে পারে না। কারণ তা অসম্ভব। এজন্য তাকে অনির্বচনীয় বলা হয়। নির্বচন অর্থে কথন, তাকে বলা যায় না—'এটা এরকম' এভাবে নিরূপণ করা যায় না। অনির্বচনীয়, এই অর্থেই মিথ্যা বলে বলা হয়। মিথ্যা অর্থাৎ নিরূপণ করা যায় না। অলীক নয়। অলীক যেমন—গগন-কুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, যার শব্দজনিত বোধ হয়, কিন্তু বস্তুসত্তা নেই। প্রাতিভাসিক সত্তাও নেই, তুচ্ছ সত্তা। তাহলে অজ্ঞান যদি কোনরূপেই জ্ঞানের বিষয় না হয় তো সে বস্তু অসৎই হবে—এই আশঙ্কায় বলা হলো 'ত্রিগুণাত্মকম্'—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণাত্মক—'অজামেকাম্ লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং' [শ্বেঃ ৪/৫] এরূপ শ্রুতি প্রমাণ আছে। তাহলে অজ্ঞান সৎ বলা যায়? না তাও নয়, কারণ 'জ্ঞান বিরোধী' বলা হয়েছে। ব্রহ্মজ্ঞান হলে অজ্ঞান ও তার কার্য এই সমগ্র সৃষ্টির বোধ থাকে না, যা এক কালে আছে বলে বোধ হয় ভিন্নকালে নাই, তা সত্য নয়, 'সৎ' নয়। তাহলে 'অসৎ'বলা যাক—না তাও বলা যায় না; কারণ তাহলে আকাশাদি ক্রমে এই বিরাট সৃষ্টি কিভাবে হলো? সৃষ্টির পরিণামী কারণ অজ্ঞান। তাহলে তাকে সৎ ও অসৎ বলা যাক—তা অসম্ভব। একই বস্তু একই কালে সৎ ও অসৎ উভয়রূপ হতে পারে না। তাহলে জ্ঞানের অভাবকে অজ্ঞান বলা যেতে পারে—এরূপ প্রত্যয়ের আশঙ্কায় বলা হলো 'ভাবরূপং'—অভাবরূপ নয়। কেন? না, অজ্ঞানের সাময়িক অনুভব হয়—'অহম্ অজ্ঞঃ' এরূপ বোধ হয়। আর জ্ঞানের অভাবকে যদি অজ্ঞান বলা হয়, তবে প্রশ্ন কোন্ জ্ঞানের অভাবকে অজ্ঞান বলা যাবে? কারণ 'জ্ঞান' শব্দে তিন রকম ভাবে শাস্ত্রে বলা হয়েছে। (১) জ্ঞান শব্দে নিত্য চৈতন্য পরমাত্মাকে বোঝায়, এর অভাব হতেই পারে না। নিত্য চৈতন্যের অভাব কেহ কখনো প্রত্যক্ষ করতে পারে না। নিত্য চৈতন্যের বলেই সর্ববিধ অনুভব সর্বকালে হয়ে থাকে। (২) বুদ্ধিবৃত্তিকে 'জ্ঞান' বলে, বুদ্ধিবৃত্তি জড়। তার আবির্ভাব, লয় হয়; এই বৃত্তিকে অন্তঃস্থ চৈতন্য

প্রকাশ করলে জ্ঞান হয়। বৃত্তি অসংখ্য, সুতরাং কোন্ বৃত্তির অভাবকে অজ্ঞান বলা যাবে? যদি বলি, সকল বৃত্তির অভাবকে অজ্ঞান বলা যায়। তবে লৌকিক কোন জ্ঞানই থাকে না, অজ্ঞানের অভাবাত্মক বোধও থাকবে না। বরং সকল বৃত্তির অভাবে আত্মচৈতন্য প্রথমোক্ত জ্ঞানই থাকবে—অভাব হবে না। (৩) ন্যায় বৈশেষিক দর্শন মতে, জ্ঞান আত্মগুণ। এ মতেও জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান হতে পারে না, কারণ আত্মার জ্ঞানগুণের অভাব কখনই হতে পারে না। গুণ বাদ দিয়ে গুণীর অস্তিত্বই থাকে না। সুতরাং জ্ঞানের অভাব অজ্ঞান নয়। অতএব তাকে 'ভাবরূপং যৎ কিঞ্চিৎ'—ভাবরূপ একটা কিছু বলে ধরতে হয়। 'যৎকিঞ্চিৎ' এজন্য বলা হলো যে, যদি ভাবরূপই বলা হয় তাহলে তার অনাদি সত্তাত্ব এসে যায়। তা না হোক, কারণ অজ্ঞানের অনাদি ভাবরূপতা থাকলে সংসার নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ হতে পারে না। কাজেই বেদান্তী অজ্ঞানের ভাবরূপতাকে পারমার্থিকভাবে স্বীকার করেন না, কেবল অভাব থেকে তাকে ভিন্ন করার জন্য 'ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ' একটা সত্তা বলে বলেন। কোন প্রমাণেই অজ্ঞানের অস্তিত্ব নিরূপণ করা যায় না। অবিদ্যার এই লক্ষণ যে, সে প্রমাণকে সইতে পারে না। যদি তা পারত তবে তো বস্তু সত্য হতো। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে বলা হয়েছে, এই ভ্রান্তি নিরালম্ব, সকল ন্যায় বিরোধী, কোন বিচার সে সইতে পারে না। যেমন সূর্যালোককে তমসা সইতে পারে না। এইজন্য অজ্ঞানকে পরমেশ্বরের শক্তি বলা হয়—'দেবাত্মশক্তিং'। নিজ গুণে স্বয়ং আবৃত।।৩৪।।

অজ্ঞানবিভাগ

ইদমজ্ঞানং সমষ্টি-ব্যষ্টি-অভিপ্রায়েণ একমনেকম্ ইতি চ ব্যবহ্রিয়তে।।৩৫।।

এই অজ্ঞানকে সমষ্টি অভিপ্রায়ে এক ও ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে অনেক বলে ব্যবহার করা হয়।।৩৫।।

অমৃত টীকা : শ্রুতিতে যেমন অজ্ঞানকে অজাম্ একাম্ বলা হয়েছে, তেমনি 'ইন্দ্রো মায়াভিঃ' বাক্যে মায়াকে বহুও বলা হয়েছে। এর সামঞ্জস্য কি? উত্তরে বলা হলো ঃ সমষ্টি হিসাবে এক, ব্যষ্টি হিসাবে দেখলে অনেক বলে মায়াকে ব্যবহার করা হয়। সামান্যভাবে দেখলে এক আর বিশেষভাবে দেখলে অনেক। বুদ্ধি যে-বিষয়ে যুক্ত হয়ে প্রতিভাত, সে তদ্‌বিষয়াত্মকই হয়। যেমন মৃত্তিকাভাবে যুক্ত বুদ্ধি ঘটগত পার্থক্য না দেখে মৃত্তিকাই অনুভব করে। আবার ঘট-অনুরক্ত হলে মৃত্তিকা না দেখে ঘটই দেখে। একটি বস্তু একই সঙ্গে এক ও

অনেক হতে পারে না ঠিকই, কিন্তু সামান্য বিশেষভাবে উপরোক্ত কারণে ভেদাভেদ সঙ্গতই হয়। কাজেই শ্রুতিতে এরূপ ব্যবহার অসঙ্গত নয়।।৩৫।।

তথাহি যথা বৃক্ষাণাং সমষ্টি-অভিপ্রায়েণ বনম্ ইতি একত্বব্যপদেশঃ, যথা বা জলানাং সমষ্টি-অভিপ্রায়েণ জলাশয়ঃ ইতি, তথা নানাত্বেন প্রতিভাসমানানাং জীবগত অজ্ঞানানাং সমষ্টি অভিপ্রায়েণ তদেকত্বব্যপদেশঃ। অজাম্ একাম্ [শ্বেঃ ৪/৫] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ।।৩৬।।**

যেমন বৃক্ষ সকলের সমষ্টি 'বন' বলে কথিত হয়, যেমন জলবিন্দু সকলের একত্রিত রূপকে জলাশয় বলা হয়, তেমনি নানারূপে প্রতিভাত ব্যষ্টি জীবগত অজ্ঞানের সমষ্টি ধরে অজ্ঞানকে 'এক' বলা হয়। শ্রুতিপ্রমাণ যথা 'জন্মরহিত সত্ত্ব, রজঃ তমোগুণান্বিত অজ্ঞান এক'।।৩৬।।

অমৃত টীকা ঃ পূর্বশ্লোকের উক্তিই দৃষ্টান্তযোগে দেখানো হয়েছে। বন ও বৃক্ষ, জল ও জলাশয়ের মধ্যে যেমন একত্ব ও অনেকত্ব ভাব তেমনি শ্রুতিতেও বলা হয়েছে ঃ পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষঃ আবিশৎ [বৃঃ ২/৫/১৮] 'তিনি (পরমাত্মা) দুই পদবিশিষ্ট মানুষ ও পক্ষীর শরীর ও চারিপদ সমন্বিত পশু-শরীর নির্মাণ করলেন ও লিঙ্গ শরীররূপে দেহসমূহে প্রবেশ করলেন।' এ ধরনের কথা আরো আছে, যথা ঃ 'রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।' ইত্যাদি—এতে বোঝা যাচ্ছে, অজ্ঞান ও তৎকার্য-সীমিত বা অজ্ঞান ও তৎকার্য-প্রতিবিম্বিত চিদাত্মা ঈশ্বর ও জীবরূপ ধারণ করেছেন।

এভাবে এক ও অনেক অজ্ঞান স্বীকারের প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যেতে পারে—এক অজ্ঞান ঈশ্বর-কার্য এবং অনেক অজ্ঞান জীবভেদ ব্যাখ্যাকল্পে প্রয়োজন। অজ্ঞান ব্রহ্মাশ্রয়ী না জীবাশ্রয়ী? ব্রহ্মাশ্রয়ী হলে অজ্ঞান এক হয় ও জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের পরিণামী কারণরূপে ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। ব্রহ্ম বিবর্ত কারণরূপে জগতের অভিন্ন নিমিত্ত-উপাদান কারণ হন। কিন্তু মায়া বা অজ্ঞান সৃষ্টির পূর্বে কোথা ছিল? যদি বলা যায় ব্রহ্মে ছিল, তাহলে সিদ্ধান্তহানি হয়। কারণ সিদ্ধান্ত হলো 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু ছিল না, বিশুদ্ধ চৈতন্যে মায়ার লেশ মাত্র নেই। মায়াকে অজ জন্মরহিত বলা হয়েছে; সুতরাং অনাদি মায়া ব্রহ্মেই ছিল বললে, আরো দোষ হয়, তাতে মোক্ষ বা মুক্তি বলে

কিছু থাকবে না। কারণ মায়া থাকায় ব্রহ্ম থেকে সর্বদা সৃষ্টি হতে থাকবে। মুক্ত মানুষ মায়াবলে আবার বদ্ধ হয়ে পড়বে। এর উত্তর হলো, মায়াকে বেদান্তী সৎ পদার্থ বলছেন না। ব্রহ্মজ্ঞানে মায়া থাকে না। কিন্তু সৃষ্টির ব্যাখ্যা করতে গেলে, মায়াকে স্বীকার না করলে ব্যাখ্যা করা যায় না। মায়া বা অজ্ঞান অবচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত বা উপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর হলে, ঈশ্বরকে মায়াধীন বলতে হয়। কিন্তু শাস্ত্রে ঈশ্বরকে মায়াধীশ বলা হয়েছে। পূর্বে মায়ার অস্তিত্ব স্বীকার করে ঈশ্বরত্ব মানতে হচ্ছে—না কি ঈশ্বর হয়ে তিনি মায়াকে সৃষ্টিকার্যে প্ররোচিত করেন? সৃষ্টির পূর্বে মায়া নাই আবার মায়া না থাকলে সৃষ্টি নাই। মায়া না থাকলে ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর না থাকলেও মায়া নাই। কোনটা আগে কোনটা পরে নির্ণয় করা দুর্ঘট হয়ে পড়ে। এই দোষ অনাদি মায়া বলে কাটানো যায়। আদি না থাকায় কোন্‌টি আগে বলার প্রশ্ন ওঠে না। শাস্ত্রে ঈশ্বরকে মায়ার দ্বারে জগৎ কারণ ও কর্মফলদাতা বলা হয়েছে। অপর পক্ষে 'মায়া জীবাশ্রয়ী' যাঁরা বলেন তাঁদের মতে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব ব্রহ্মে মায়ার স্পর্শমাত্র থাকতে পারে না। সুষুপ্তির পর জাগ্রত অবস্থায় যে-জীবের যে সংস্কার থাকে তদনুযায়ীই ব্যক্তির বোধ হয়ে থাকে। অজ্ঞান জীবভেদে ভিন্ন ভিন্ন এবং অজ্ঞান জীবাশ্রয়ী বলেই এ সম্ভব। অজ্ঞান ব্রহ্মাশ্রয়ী হলে সুষুপ্তির পর এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কারবোধ সম্ভব হতো না। তাহলে প্রশ্ন হবে, তবে কি সুষুপ্তিকালে জীবের জীবত্ব থাকে না? যদি তাই হয় তবে, কৃতনাশ অকৃতাভ্যাগম দোষ হবে। অর্থাৎ যা করা হয়েছে তার ফল পাবে না, আবার যা করা হয়নি তার ফল আসতে পারে। এবং জীবরূপের ভিন্নত্ব না থাকায় মুক্ত মানুষেরও বন্ধন হবে। ব্রহ্মাশ্রয়ী হলে সুষুপ্তিতে জীবত্বের নাশ হওয়ায় জীবের জাগরণ অসম্ভব হবে। এসব দোষ দেখিয়ে একদল বেদান্তী অজ্ঞানকে জীবাশ্রয়ী বলতে চান। কিন্তু এপক্ষেও দারুণ যৌক্তিক বাধা আছে। যদি অজ্ঞান জীবাশ্রয়ী হয়, তবে বলতে হবে, অজ্ঞান আশ্রয় থেকে জীবের উৎপত্তি, না জীব হলে পর অজ্ঞান তাকে আশ্রয় করে? কে কাকে আশ্রয় করে? জীবত্ব সিদ্ধ হলে অজ্ঞান আশ্রয় করে, না, অজ্ঞান থাকলে জীবত্ব সিদ্ধ হয়। এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ যদি বলা যায়, অনাদি প্রসঙ্গ বলে দূর করা যায়, তবে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন, না তা বলতে পার না। কারণ ক্রমভাবী অনেক বীজাঙ্কুরবিশিষ্ট ব্যক্তির মতো অনেক অজ্ঞানজীব ব্যক্তির অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই। এ বিষয়ে শ্রৌত প্রমাণ ঃ 'সদা সৌম্য তদা সম্পন্নো ভবতি' (ছাঃ ৬/৮/১) তখন হে সৌম্য, জীব সতের সহিত একীভূত হন। অর্থাৎ জীব পরমাত্মাতেই আশ্রিত। অর্থাৎ সুষুপ্তিতে জীব পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হন। পারমার্থিকভাবে অনেক অজ্ঞানজীব ব্যক্তির

অস্তিত্ব নেই, ব্রহ্মই জীবরূপে প্রতিভাত হন। এভাবে অজ্ঞানের আশ্রয়ভূত ব্রহ্মচৈতন্য সেই অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়ে নিজেকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন জীব বলে মনে করে—একেই অজ্ঞানের বিষয় হওয়া বলে। তাই অজ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় ব্রহ্ম।

জীবাশ্রয়ী অজ্ঞানবাদীরা বলেন, জীব আশ্রয়, পরমাত্মা বিষয়। অবিদ্যা জীবকে আশ্রয় করে বলে তার অনুভব হয় 'আমার অজ্ঞান' এবং ব্রহ্মকে বিষয় করে বলে অনুভব হয়, 'আমি ব্রহ্মকে জানি না'।

অপরপক্ষে ব্রহ্মাশ্রয়ী অজ্ঞানবাদীরা বলেন, না, তা নয়, ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয় হওয়ায় পরমার্থত ব্রহ্ম-অভিন্ন জীবের অনুভব হয় 'আমার অজ্ঞান' এবং বিষয় হওয়ায় অনুভব হয়—'আমি নিজ স্বরূপ জানি না'। জীবাশ্রয়ী অজ্ঞানবাদীরা যে আক্ষেপ করেন 'অজ্ঞান ব্রহ্মাশ্রয়ী হতে পারে না'—কারণ, আলোক যেমন অন্ধকারের আশ্রয় হতে পারে না, সেরূপ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম তার বিরোধী অজ্ঞানের আশ্রয় হতে পারে না। এর উত্তরে বলা হয়েছে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম অজ্ঞানের বিরোধী নয়। ব্রহ্মাকারাবৃত্তিতে আরূঢ় ব্রহ্মজ্ঞান অজ্ঞানের বিরোধী।

অতএব, অজ্ঞান ব্রহ্মে আশ্রিত হয়ে ব্রহ্মে ও জীবে বিভাগ করে এবং ব্রহ্মকে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বররূপে বোধ করায়। অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য ঈশ্বর এবং অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্যকে জীব বলে। সুতরাং অজ্ঞান এক আবার বহু।

আশঙ্কা হতে পারে, নানারূপে প্রতিভাত জীবগণের একটি অজ্ঞান স্বীকার করলে, একের মুক্তিতে সকল জীবের মুক্তি হবে। উত্তরে বলা যায়, মুক্তজীবের দৃষ্টিতে একজনই জীব। অন্য সকল জীব তো তারই দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় মাত্র এবং তা সত্য নয়। কে সেই জীব যার দৃষ্টিতে জীবান্তর ভ্রম হয়? উত্তরে বলা যায় যিনি দেখেন তিনিই। যদি বলা যায়; আমি তো নিজেকে বদ্ধ মনে করি ও অন্যান্য জীবগণকে সেরূপ বদ্ধ দেখছি! উত্তর হলো ঃ তা হলে তুমিই সেই বদ্ধজীব, তোমার দৃষ্টি অনুসারে অন্যান্য জীবকে বদ্ধ মুক্ত সুখী দুঃখী ইত্যাদি বিচিত্ররূপে কল্পনা করছ। ব্রহ্মজ্ঞান হলে এসব স্বপ্নবৎ প্রতিভাত হবে। তোমার মুক্তিতে মনে হবে, সকলেই তো মুক্ত, বন্ধন ভ্রমমাত্র। অতএব অজ্ঞান সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে এক ও অনেক বলে ব্যবহার হলেও দোষ হয় না। এবং এই অজ্ঞানের দ্বারেই ব্রহ্ম সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা ঈশ্বর বলে প্রতিভাত হন।।৩৬।।

সমষ্টি অজ্ঞানের পরিচয় ও ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণনা

ইয়ং সমষ্টিঃ উৎকৃষ্ট-উপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা।।৩৭।।

এই সমষ্টি অজ্ঞান উৎকৃষ্ট ঈশ্বরের উপাধি অথবা উপাধিটি উৎকৃষ্ট বলে বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রধান।।৩৭।।

অমৃত টীকা ঃ ব্যষ্টি নানাজীবগত নিকৃষ্ট অন্তঃকরণ-উপাধি থেকে সমষ্টি উপাধির বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে—ইয়ং সমষ্টিঃ ইত্যাদি। প্রপঞ্চের কারণভূত অজ্ঞানে স্থূল সূক্ষ্মের রাগাদিমালিন্য থাকে না বলে বিশুদ্ধসত্ত্ব, সুতরাং উৎকৃষ্ট উপাধি। রজঃতমের দ্বারা অনভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান সমষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর বলা হয়। ভাবটি হলো, সৃষ্টিকালে মূল প্রকৃতি ভিন্ন অন্য কোন প্রকৃতি-বিকৃতি, মন বুদ্ধি ইত্যাদি থাকে না, সুতরাং মালিন্যবর্জিত সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি হয় না। অসমান হয়ে কোন একটির বৃদ্ধি হলে অর্থাৎ বিষম পরিণাম হলে সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির প্রথমে সত্ত্বের প্রাধান্য হয়—তাতেই ঈশ্বরের 'ঈক্ষণ' সম্ভব হয়। এ অবস্থা জ্ঞানময়, আনন্দময়, সর্বসৃষ্টির বীজস্বরূপ, সর্বপ্রকাশক। এখান থেকেই সিসৃক্ষা বা সৃষ্টির কামনা ও সঙ্কল্প হয়। এ থেকে ক্রমে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি। তারপরে ক্রমে অহং তত্ত্ব ও পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হয়। সুতরাং সমষ্টি অজ্ঞানে বা মহত্তত্ত্বে সত্ত্বগুণের আধিক্য থাকায় সত্ত্বগুণ প্রধান বলা হয়েছে—রজঃ তমোগুণ এখানে অভিভূত বা বিলুপ্তপ্রায় থাকে।।৩৭।।

এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্বজ্ঞত্ব সর্বেশ্বরত্ব সর্বনিয়ন্তৃত্বাদি-গুণকং সদ্-অসদ্-অব্যক্তম্ অন্তর্যামী জগৎকারণম্ ঈশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে। সকল-অজ্ঞান-অবভাসকত্বাদ্ অস্য সর্বজ্ঞত্বম্। 'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ' [মুঃ ১/১/৯] **ইতি শ্রুতেঃ।।৩৮।।**

এই সমষ্টি অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত চৈতন্য সর্বজ্ঞত্ব,সর্বেশ্বরত্ব, সর্বনিয়ন্তৃত্ব গুণবিশিষ্ট সদ্ অসদ্ অব্যক্ত অন্তর্যামী, জগৎকারণ ঈশ্বর বলে অভিহিত হন। সকল অজ্ঞানের প্রকাশক বলে সর্বজ্ঞ। এবিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ—যিনি সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে সব জানেন।।৩৮।।

অমৃত টীকা ঃ পরমার্থত চৈতন্য অসঙ্গ হলেও এই অজ্ঞানের সঙ্গে আধ্যাসিক সম্বন্ধে সম্বন্ধ হয়ে সর্বাবভাসক—সর্বজ্ঞ, সর্বজীব প্রবর্তক অর্থাৎ

নিয়ন্তা সর্বেশ্বর, অব্যক্ত, অন্তর্যামী জগৎ-কারণ ঈশ্বর হন। সমষ্টি অজ্ঞানের অবভাসক বলে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, কর্মানুরূপ ফল দান করে সকল জীবকে শাসন করেন বলে ঈশ্বর; সেরূপ অন্তঃস্থিত চৈতন্যস্পর্শে মন বুদ্ধি চেতন হয়ে বাসনানুরূপ কর্মে প্রেরিত হয় বলে ঈশ্বর নিয়ন্তা-প্রেরক বা অন্তর্যামী বলে অভিহিত হন। সদ্ অর্থে স্থূল, অসদ্ সূক্ষ্ম, স্থূলের বা সূক্ষ্মের কারণ যে অব্যক্ত, ঈশ্বর এই অব্যক্তস্বরূপ এবং যেহেতু স্থূল সূক্ষ্মের অতীত সেহেতু সকল প্রমাণের অগোচর বলেও অব্যক্ত। অনেক গ্রন্থে এ স্থলে সদসদ্ কথাটি নেই। টীকাতেও সদসদ্ কথাটি ধরা হয়নি। মূলে থাকাতে এখানে ওরূপ অর্থ করা হলো। শ্রুতিতেও ঈশ্বরকে 'যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ'—সামান্যত ও বিশেষত সকল কিছুই, ভূত ভবৎ ভবিষ্যৎ কালের সমগ্র তিনি জানেন বলে বলা হয়েছে। আবার 'এষ ত আত্মান্তর্যাম্যমৃতঃ' [বৃঃ ৩/৭/৩] 'মহতঃ পরমব্যক্তম্' [কঠ ঃ ৩/১১] 'যঃ পরঃ সঃ মহেশ্বরঃ' [মহানাঃ ১০/৮] ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ঈশ্বরকে অন্তর্যামী, অব্যক্ত, মহেশ্বর বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণাটি স্পষ্ট করার জন্য স্বামীজীর ২টি ভাষণ দ্রষ্টব্য ঃ বাণী ও রচনা [২/পৃঃ ৩৩৯-৩৪৮] । উপহিত চৈতন্যাংশের কথা বলে এখন উপাধি অংশের কথা বলছেন। অর্থাৎ অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর। উপাধি হলো সমষ্টি বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান প্রকৃতি। চৈতন্যের দিক থেকে বলা হলো, তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বেশ্বর, সর্বনিয়ন্তা জগৎকারণ, উপাধির দিক দিয়ে দেখলে ঈশ্বরকে কি মনে হবে? সে কথাই এখানে বলা হচ্ছে।।৩৮।।

ঈশ্বরের পরিচয়

ঈশ্বরস্যেয়ং সমষ্টিঃ অখিলকারণত্বাৎ কারণশরীরং, আনন্দপ্রচুরত্বাৎ কোশবৎ আচ্ছাদকত্বাৎ চ আনন্দময়কোশঃ সর্ব উপরমত্বাৎ সুষুপ্তিঃ অতএব স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চলয়স্থানম্ ইতি চ উচ্যতে।।৩৯।।

এই ঈশ্বরের উপাধি সমষ্টি অজ্ঞান—সকল সৃষ্টির কারণ বলে তাকে 'কারণশরীর', আনন্দ প্রচুর বলে এবং তরবারির কোশের মতো চৈতন্যকে আবরণ করে বলে 'আনন্দময় কোশ' এবং এতে সমস্ত সৃষ্ট জগৎ লয় হয় বলে 'সুষুপ্তি'—অতএব, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের লয়স্থান ইত্যাদি বলা হয়।।৩৯।।

অমৃত টীকা ঃ মায়ার দিক থেকে ঈশ্বরকে জগৎকারণ বলা যায়। কারণ, জগতের বীজ অজ্ঞান বা মায়া। ঈশ্বর-চৈতন্য সেই মায়াকে যখন আধ্যাসিক সম্বন্ধযোগে উদ্ভাসিত করেন, তখনই জগতের সূক্ষ্মাদিক্রমে উৎপত্তি বা বিকাশ হতে থাকে। যেমন বীজমধ্যে অঙ্কুর ও ভবিষ্যৎ মহীরুহের সম্ভাবনা অব্যক্ত থাকে, তেমনি মায়ায় ভবিষ্যৎ জগতের বীজ থাকে ও ঈশ্বর-চৈতন্যস্পর্শে সেই বীজ ক্রমে বিকশিত হয়ে জগৎ-রূপে প্রকাশিত হয়। এভাবে মায়ার দ্বারা ব্রহ্ম জগতের কারণ হন বলে তাঁকে জগৎ-কারণ বলা হয়। তাই ঈশ্বরের স্বরূপ হলো তিনি কারণ-শরীর। সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের বিকাশ এই কারণ-শরীর থেকে ক্রমে ক্রমে হয়ে থাকে। আবার এই কারণ অবস্থাটি যেহেতু বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান মায়ার আবরণমাত্র, সেহেতু উপহিত ব্রহ্মের আনন্দ বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রধান মায়ায় প্রতিফলিত হয়। রজঃ-তমঃ রহিত পার্থিব মালিন্যবর্জিত এই আনন্দ এত অধিক ও বিশুদ্ধ যে তা তুলনারহিত বলে এটি আনন্দময় অবস্থা। এবং মায়ার ধর্ম আচ্ছাদন করা। তরবারির কোশের মতো তা চৈতন্যকে যেন আচ্ছাদন করেছে, এজন্য বলা হলো—'আনন্দময় কোশ'। ঈশ্বর হলেন আনন্দময় কোশ, কারণ-শরীর।

যেমন জীবের বেলায় গভীর ঘুমে স্থূল দেহাদি ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহং সব লয় হয়—তেমনি জগৎকারণে, স্থূল সূক্ষ্ম সকল কার্যজগৎ লয় হয় বলে তাঁকে সুষুপ্তির মতো প্রলয়স্থান অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্মের লয়স্থানও বলা যায়। ঈশ্বরকে এভাবে চৈতন্য ধর্ম ও উপাধি ধর্মের দিক থেকে দুভাবে প্রকাশ করা হয় ।।৩৯ ।।

ব্যষ্টি অজ্ঞানের পরিচয়

যথা বনস্য ব্যষ্টি-অভিপ্রায়েণ বৃক্ষা ইতি অনেকত্ব-ব্যপদেশঃ যথা বা জলাশয়স্য ব্যষ্টি-অভিপ্রায়েণ জলানীতি, তথা অজ্ঞানস্য ব্যষ্টি-অভিপ্রায়েণ তদ্ অনেকত্ব-ব্যপদেশঃ 'ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপঃ ঈয়তে' [ঋগ্বেদ-৬/৪৭/১] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ ।।৪০ ।।**

যেমন বনের ব্যষ্টি ধরে বলতে গেলে তাকে বৃক্ষসকল, এভাবে অনেকত্বের ব্যবহার করতে হয়। অথবা যেমন জলাশয়ের ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে জলসকল, এরূপ বহুত্বের ব্যবহার করা হয়, সেরূপ অজ্ঞানের ব্যষ্টি ধরে বলতে গেলে অনেক অজ্ঞান বলতে হয়। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ যথা ঃ "ঈশ্বর মায়াসমূহের দ্বারা বহুরূপ প্রাপ্ত হন" ।।৪০ ।।

অমৃত টীকা ঃ অনেক গাছ মিলিয়েই বন হয়। বনের এক্ক একটি গাছ, বহু একক গাছ একত্রে বন। অবচ্ছেদবাদ ধরে এই দৃষ্টান্ত। বন অবচ্ছিন্ন আকাশ অর্থাৎ বন সীমিত আকাশ যেমন বনদ্বারা সীমাভাবাপন্ন, তেমনি সমষ্টি অজ্ঞান অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে ঈশ্বর বলা হয়। অথবা প্রতিবিম্ববাদ মতে যেমন জলবিন্দুর সমাহার জলাশয় অর্থাৎ জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত আকাশের মতো সমষ্টি অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে ঈশ্বর বলা হয়। সেরূপ এক বৃক্ষ অবচ্ছিন্ন আকাশ বা একটি জলবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত আকাশ ধরে জীবের সংজ্ঞা নিরূপিত করার জন্য এরূপ বলা হচ্ছে। বনরূপে এক বন বলে ব্যবহার করলেও আম কাঁঠাল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন গাছ বনে থাকেই, সবকে মিলিয়েই বলি বন। বা বাপী কূপ তড়াগ পুষ্করিণী প্রভৃতি বিভিন্ন মাপের জলাধারগুলির সমষ্টি করে বৃহৎ জলাশয় ধরলেও ব্যষ্টি হিসেবে প্রত্যেকের আলাদা ভাব থাকেই। এভাবেই সকল প্রপঞ্চের কারণ এক অজ্ঞান স্বীকার করলেও অহংকার ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় প্রতি ব্যক্তি-অজ্ঞানকে ধরে বহু অজ্ঞানের ব্যবহার অস্বীকার করা যায় না। এভাবেই অজ্ঞানের বহুত্ব বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ দেওয়া হয়েছে, 'ইন্দ্র' অর্থাৎ পরমেশ্বর, 'মায়াভিঃ' বিক্ষিপ্ত বহু অন্তঃকরণাদিতে, 'পুরুরূপঃ' বহুরূপ হয়ে 'ঈয়তে' প্রকাশিত। অজ্ঞানের বহুত্ব বিষয়ে এই প্রমাণ ।।৪০ ।।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি অজ্ঞান বিভাগ

অত্র ব্যস্ত-সমস্ত-ব্যাপিত্বেন ব্যষ্টি-সমষ্টিতা-ব্যপদেশঃ ।।৪১ ।।

ব্যস্ত অর্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশেষভাবে জীবব্যাপী বোধ হয় বলে ব্যষ্টিভাবে অজ্ঞানের ব্যবহার হয় আর সমস্ত অর্থাৎ সবকে নিয়ে ঈশ্বররূপে ব্যবহার হলে অজ্ঞানকে সমষ্টি এক বলা হয় ।।৪১ ।।

অমৃত টীকা ঃ ব্যস্ত অর্থে ব্যষ্টি, ব্যপদেশঃ মানে বলা। কথন ভেদ বোঝাতে গিয়ে বলা হচ্ছে, ব্যস্ত সমস্ত ইত্যাদি। অর্থাৎ ঘটভেদে মাটির ভেদ যেমন হয়, আবার মাটির পিণ্ড ধরলে যেমন এক মাটি বলা হয়। সেরকম কার্যোপাধি জীবব্যাপী-অজ্ঞান অনেক, আবার কারণোপাধি সমস্তব্যাপী-অজ্ঞান এক বলে বোঝা যায় ।।৪১ ।।

ব্যষ্টি অজ্ঞানের স্বরূপ

ইয়ং ব্যষ্টিঃ নিকৃষ্ট-উপাধিতয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানা ।।৪২ ।।

এই ব্যষ্টি অজ্ঞান নিকৃষ্টের (জীবের) উপাধি বলে অথবা উপাধিটি নিকৃষ্ট বলে মলিনসত্ত্ব প্রধান ॥৪২॥

অমৃত টীকা ঃ মহাপ্রলয়কালে মূলা প্রকৃতিতে সকল সূক্ষ্ম স্থূল প্রপঞ্চ লয় হলে রজঃ তমোমল রহিত সে-সমষ্টি অজ্ঞানে বিশুদ্ধসত্ত্ব গুণটিই প্রধানভাবে থাকে। তার চাইতে দৈনন্দিন প্রলয় অর্থাৎ জীবের সুষুপ্তিতে যে-অজ্ঞানে জীবগত স্থূল সূক্ষ্মের লয় হয়, সেই অজ্ঞান মলিনসত্ত্ব প্রধান। কারণ, সুষুপ্তিতে জীবগত অহংকারাদির সংস্কার অজ্ঞানে থেকে যায়। এজন্য নিকৃষ্ট উপাধি, মলিনসত্ত্ব বলা যায়। এই অজ্ঞানে ব্রহ্ম জ্ঞান হয় না—জ্ঞান প্রতিবন্ধী বিক্ষেপ সংস্কার প্রবল বলে এই ব্যষ্টি অজ্ঞান জীবের নিকৃষ্ট উপাধি। অথবা অজ্ঞানী নিকৃষ্ট জীবের এই উপাধি মলিন কর্তৃপ্রধান। মলিন বলা হয়েছে এ কারণে যে, এখানে রজঃ-তমের মাত্রা বিক্ষেপকারণরূপে বর্তমান থাকে। সত্ত্বগুণ না হলে চিদ্ প্রতিবিম্ব রজঃ-তমঃ গ্রহণ করতে পারে না বলে সত্ত্বপ্রধান হলেও রজঃ-তমের সংস্কার সেখানে অধিক থাকে ॥৪২॥

প্রাজ্ঞের স্বরূপ নির্ণয়

এতদুপহিত-চৈতন্যম্ অল্পজ্ঞত্ব-অনীশ্বরত্ব-আদি-গুণকং প্রাজ্ঞঃ ইতি উচ্যতে এক-অজ্ঞান-অবভাসকত্বাদ্ ॥৪৩॥

এই মলিনসত্ত্বে উপহিত চৈতন্যকে অল্পজ্ঞ অনীশ্বর প্রভৃতি গুণযুক্ত প্রাজ্ঞ বলা হয়। একটিমাত্র অজ্ঞানকে প্রকাশ করেন বলে একে প্রাজ্ঞ বলা হয়।

অমৃত টীকা ঃ ব্যষ্টি অজ্ঞান মলিনসত্ত্ব কেন তা আগে বলা হয়েছে। এই অজ্ঞান যার উপাধি সেই উপহিত চৈতন্যকে জীব বা প্রাজ্ঞ বলে। প্রাজ্ঞ শব্দের মানে হলো অল্পজ্ঞ। কেন অল্পজ্ঞ? না, তিনি সমগ্র মায়াকে উপাধি না করে ব্যষ্টি মায়াকে (পরিণামভূত একটি মাত্র অন্তঃকরণকে) উপাধিরূপে গ্রহণ করে তাতে উপহিত হয়ে বা প্রতিবিম্বিত হয়ে সেই এক অজ্ঞানকে প্রকাশ করছেন। ব্যষ্টি এই অজ্ঞান ব্যষ্টিজীবগত সংস্কার সহযোগে মলিন হওয়ায় তার দ্বারা উপহিত জীব কেবল সেইটুকু জানেন, সমগ্র সৃষ্টিকে জানেন না, তাই অল্পজ্ঞ ॥৪৩॥

অস্য প্রাজ্ঞত্বম্, অস্পষ্টোপাধিতয়া অনতিপ্রকাশকত্বম্ ॥৪৪॥

উপাধি অস্পষ্ট বলে অল্প প্রকাশক ॥৪৪॥

অমৃত টীকা ঃ মলিনসত্ত্ব উপাধিযুক্ত হওয়ায় জীবগত অন্তঃকরণের প্রকাশও অল্প। অনেকের মতে অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্য জীব বা প্রাজ্ঞ। অজ্ঞান থেকে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব থেকে অহংতত্ত্ব, অহং থেকে পঞ্চমহাভূত, পঞ্চমহাভূতের সম্মিলিত সাত্ত্বিক অংশ দিয়ে অন্তঃকরণের সৃষ্টি। অতএব অন্তঃকরণে রজঃ তমের মাত্রাধিক্য থাকায় তা মলিনসত্ত্ব। সুতরাং বিক্ষেপ সংস্কারযুক্ত জীবগত অন্তঃকরণ, অল্পজ্ঞ ও অনতিপ্রকাশক হয় ।।৪৪ ।।

প্রাজ্ঞের বিশেষ গুণবর্ণন

অস্য অপি ইয়ম্ অহংকারাদিকারণত্বাৎ কারণশরীরম্, আনন্দ-প্রচুরত্বাৎ কোশবৎ আচ্ছাদকত্বাৎ চ আনন্দময়কোশঃ সর্বোপরমত্বাৎ সুষুপ্তিঃ। অতএব স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীর-প্রপঞ্চলয়স্থানম্ ইতি চ উচ্যতে।।৪৫।।

এই প্রাজ্ঞের ব্যষ্টি অজ্ঞান ও অহংকারাদির কারণ বলে কারণশরীর, প্রচুর আনন্দ এবং কোশের মতো আচ্ছাদন করে বলে আনন্দময়কোশ, স্থূল ও সূক্ষ্ম সব কিছুর লয় হয় বলে সুষুপ্তি, অতএব স্থূল ও সূক্ষ্মশরীরের লয় স্থান ইত্যাদি নামে অভিহিত হয় ।।৪৫ ।।

অমৃত টীকা ঃ যেমন সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য ঈশ্বরের ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল জগৎকারণ, আনন্দময়কোশ, সমষ্টি স্থূল-সূক্ষ্মের লয় স্থান ইত্যাদি, এখানেও ব্যষ্টি অজ্ঞান-উপহিত-চৈতন্যে একই রূপ হয়। তফাত কেবল ব্যষ্টিত্বে ও সমষ্টিত্বে। জীবের ক্ষেত্রে তা সীমিত। ঈশ্বরের ক্ষেত্রে তা সমগ্র সৃষ্টিকে নিয়ে অসীম। ঈশ্বর ক্ষেত্রে স্থূল-সূক্ষ্মের লয় হলে সমগ্র সৃষ্টির লয় অর্থাৎ মহত্তত্ত্বের, হিরণ্যগর্ভেরও লয় হয়। অতএব সমগ্র স্থূল-সূক্ষ্ম জগতের লয়, মহাপ্রলয় হয়। জীবক্ষেত্রে তা গভীর স্বপ্নবর্জিত ঘুম অর্থাৎ সুযুপ্তি। কারণে স্থূল পঞ্চীকৃত ব্যবহারিক জগৎ ও প্রাতিভাসিক স্বপ্নপ্রপঞ্চ অর্থাৎ বিরাট ও হিরণ্যগর্ভের লয় হয়। প্রাতিভাসিক স্বপ্নপ্রপঞ্চ আবার নিজকারণ অজ্ঞানে লয় হয়। এটিই অব্যক্তাবস্থা। এই অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যকেই ঈশ্বর বলা হয়। যেমন বাক্যসুধায় দৃষ্টান্ত সহযোগে বলা হয়েছে ঃ ফেনা ও তার ধর্ম যেমন তরঙ্গে লয় হয়, তরঙ্গ আবার জলে লয় হয়ে যায়, সেরূপ ব্যবহারিক প্রাতিভাসিকে এবং প্রাতিভাসিক নিজ কারণ সাক্ষি-চৈতন্যে লয় হয়। তারপর বিশুদ্ধ চৈতন্য, সাক্ষিত্বও থাকে না।

এই প্রলয়ে বা সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ ও তার ধর্ম লয় হওয়ার প্রচুর আনন্দের অনুভব কিভাবে হবে? কারণ অন্তঃকরণ বৃত্তি না হলে তো জ্ঞান হয় না, সুতরাং সুষুপ্তি বা প্রলয়ে অন্তঃকরণের লয় হওয়ায় এই লীনাবস্থায় যে প্রচুর আনন্দের কথা বলা হলো তার কি প্রমাণ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়েছে।।৪৫।।

ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞের আনন্দানুভব

তদানীম্ এতৌ ঈশ্বরপ্রাজ্ঞৌ চৈতন্যপ্রদীপ্তাভিঃ অতিসূক্ষ্মাভিঃ অজ্ঞানবৃত্তিভিঃ আনন্দম্ অনুভবতঃ 'আনন্দ-ভুক্ চেতোমুখঃ প্রাজ্ঞঃ' [মাণ্ডূঃ ৫] ইতি শ্রুতেঃ, 'সুখম্ অহম্ অস্বাপ্সং ন কিঞ্চিৎ অবেদিষম্' ইতি উত্থিতস্য পরামর্শোপপত্তেঃ চ।।৪৬।।

সেই প্রলয়ে বা সুষুপ্তিতে এই ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত অজ্ঞানের অতিসূক্ষ্ম বৃত্তিতে আনন্দ অনুভব হয়। এবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ : 'প্রাজ্ঞ আনন্দ ভোক্তা, চৈতন্য উদ্ভাসিত অজ্ঞান বৃত্তি প্রধান।' এবিষয়ে অনুভব প্রমাণ, যথা 'আমি সুখে ঘুমিয়েছিলাম, কিছুই জানতে পারিনি'—এরূপ জ্ঞান (স্মৃতি) জাগরিত ব্যক্তির হয় বলে সুষুপ্তিতে অজ্ঞানের অনুভব সিদ্ধ হয়।।৪৬।।

অমৃত টীকা : জীবের জ্ঞান অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য প্রভায় হয়, এখন সুষুপ্তিতে অন্তঃকরণ নিজ কারণ অজ্ঞানে লয় পাওয়ায় সুষুপ্তিকালীন প্রচুর আনন্দের বোধ কি ভাবে হয়? যদি বলা যায়, চৈতন্য নিত্য সত্তা, তার দ্বারাই সরাসরি বোধ হয়, তবে জীবের জাগরণ অসম্ভব হয়ে পড়বে। কারণ অন্তঃকরণ লয় পাওয়ায় জীবগত সংস্কার না থাকায়, জাগরণ সম্ভব হবে না। অজ্ঞানে জীবগত সংস্কার সূক্ষ্মভাবে থাকে বলে উত্থানকালে ঐ জীবগত সংস্কারবলে অন্তঃকরণ বৃত্তি নেয়, তবেই জাগরণকালে আমি অমুক ইত্যাদি সুষুপ্তিপূর্বকালীন স্মৃতি হতে থাকে ও পূর্ববৎ ব্যবহার সম্ভব হয়। এই শঙ্কা নিরসনের জন্য বলা হচ্ছে, সেইকালে অর্থাৎ প্রলয়ে ও সুষুপ্তিকালে অতি সূক্ষ্মভাবে অজ্ঞানে আত্মানন্দের বৃত্তি থাকে। অজ্ঞানের আশ্রয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হওয়ায় এবং সে-অবস্থায় অন্তঃকরণে বৃত্তি না থাকায়, বিক্ষেপরহিত অজ্ঞানে ব্রহ্মের আনন্দের প্রতিভাস ঘটে। আনন্দের প্রতিভাস থাকলে সত্তা ও চৈতন্যের প্রতিভাসও বুঝতে হবে, তবেই জীবের অস্তিত্ব, জ্ঞান ও আনন্দের স্মৃতি জাগরণকালে হয়। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও সেরূপ হয়। বৃত্তি জড় বলে তার

প্রকাশক চৈতন্যকে ধরতেই হয়; এজন্য চৈতন্যদীপ্ত কথাটি বলা হলো। চৈতন্য প্রকাশিত অতিসূক্ষ্ম অজ্ঞান বৃত্তি স্বীকার না করলে সুষুপ্তি ও প্রলয়ের পর আর জাগরণ বা পুনঃসৃষ্টি সম্ভব হতো না। অজ্ঞানে সৃষ্টির বীজ থাকে, জীবক্ষেত্রে নিজ নিজ অহংকারাদির সংস্কার থাকায় পুনঃ সৃষ্টি বা জাগরণ সম্ভব হয়। এ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ ও অনুভব প্রমাণ মূলে দেওয়া আছে। সুখ ও অজ্ঞানের অনুভব সুষুপ্তিকালে হয়েছিল বলেই জাগরণোত্তরকালে তারই স্মৃতি হয়, 'আমি সুখে ঘুমিয়েছিলাম, আমি কিছুই জানতে পারিনি।' এই অনুভবে এক সঙ্গে সত্ত্বা, বোধ, আনন্দ ও অজ্ঞানের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।।৪৬।।

ব্যষ্টি ও সমষ্টি অজ্ঞানের সম্বন্ধ

অনয়োঃ ব্যষ্টি-সমষ্ট্যোঃ বনবৃক্ষয়োঃ ইব জল-জলাশয়য়োঃ ইব চ অভেদঃ।।৪৭।।

বন ও বৃক্ষ অথবা জল ও জলাশয় যেমন একই, অভেদ, সেইরূপ এই উপাধিভূত ব্যষ্টি ও সমষ্টি অজ্ঞানও অভেদ বুঝতে হবে।।৪৭।।

অমৃত টীকা ঃ এই অজ্ঞানকে এক ও অনেক বলে ব্যবহার করে ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞস্বরূপের বর্ণনা করা হলো—এসবই ব্যাখ্যান মাত্র, কাল্পনিক। কারণ, অজ্ঞানকে এক বা অনেক বলা চলে না—অজ্ঞানকে সত্যি 'আছে' বলে তো বলাই চলে না। আবার একেবারেই 'নেইও' বলা চলে না। এদিকে অনেক ব্যক্তি-জীব ও এক ঈশ্বরের অনুভবও হয়। একমাত্র শুদ্ধ নিরুপাধিক চৈতন্য-স্বরূপে এরূপ একত্ব ও বহুত্বের বোধ মায়িকই। তথাপি ব্যষ্টি ও সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের একত্ব যেমন স্বতঃসিদ্ধ, তেমনি বন ও বৃক্ষ বস্তুত একই—এভাবেই অজ্ঞানকে অভেদরূপে বুঝতে হবে।

অনুভূতি প্রকাশে আচার্য বলেছেন ঃ কার্য উপাধিতে জীব, কারণোপাধিতে ঈশ্বর। কার্য-কারণ ভাব ত্যাগ করলে বাকি থাকেন পূর্ণব্রহ্ম।।৪৭।।

ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞের সম্বন্ধ

এতদ্ উপহিতয়োঃ ঈশ্বরপ্রাজ্ঞয়োঃ অপি বন বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশয়োঃ ইব জলাশয় জলগত প্রতিবিম্ব আকাশয়োঃ ইব চ অভেদঃ—'এষ সর্বেশ্বর এষ সর্বজ্ঞ এষ অন্তর্যামী এষ যোনিঃ সর্বস্য প্রভব-অপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্' [মাণ্ডূঃ ৬] ইত্যাদি শ্রুতেঃ।।৪৮।।

এই সমষ্টি ও ব্যষ্টি অজ্ঞান উপহিত (চৈতন্য) ঈশ্বর এবং প্রাজ্ঞ বন ও বৃক্ষ অবচ্ছিন্ন আকাশের মতো অথবা জল ও জলাশয়ে প্রতিবিম্ব আকাশের মতো অভেদ। একথাই মাণ্ডুক্য শ্রুতিতে বলেছেন, 'ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্বজ্ঞ, ইনি সকলের অন্তর্যামী, ইনি সকলের কারণ, ইনি সকল ভূতের উৎপত্তি ও লয়স্থান'॥৪৮॥

অমৃত টীকা ঃ উপাধি ভেদ না হলে উপহিতের ভেদও হবে না, অভিন্নই হবে। সমষ্টি বা ব্যষ্টি অজ্ঞান কার্যত যেমন অভেদ, তেমনি তাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য 'ঈশ্বর' ও 'প্রাজ্ঞ' নামে কথিত হলেও কার্যত অভেদই। এটি বোঝাতে গিয়ে দুটি উপমা বারে বারে প্রয়োগ করা হচ্ছে; প্রথমটির দ্বারা অবচ্ছেদবাদ, দ্বিতীয়টির দ্বারা প্রতিবিম্ববাদ অবলম্বনে বোঝানো হচ্ছে। যেমন বৃক্ষসীমিত আকাশ ও বনসীমিত আকাশ একই অভিন্ন আকাশ অথবা যেমন জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ ও জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত আকাশ একই মহাকাশ, সেরূপ সমষ্টি অজ্ঞানে আচ্ছাদিত বা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য ও ব্যষ্টি অজ্ঞানে আচ্ছাদিত বা প্রতিবিম্বিত চৈতন্য একই অভিন্ন শুদ্ধ চৈতন্য। উপহিতবাদ অবলম্বনেও একই কথা গ্রন্থকার বলেছেন, সমষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য ও ব্যষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য একই শুদ্ধ চৈতন্য। উপাধিদ্বয় বাদ দিলে চৈতন্যমাত্র থাকে।

এখানে একটা জিনিস বুঝতে হবে, উপাধির ভেদবশত উপহিতের ভেদ আবার উপহিতের অভিন্নতাও বলা হয়েছে। উপাধি কাকে বলে? যা বস্তুর সঙ্গে যুক্ত না হয়েও সেই বস্তুটিকে অপর বস্তু-সকল থেকে ভিন্ন বলে বোধ করায়, তাকে উপাধি বলে। সুতরাং উপাধির ভেদবশত উপহিতের ভিন্নতা আপাতত বোধ হলেও উপহিত যে অভেদ এক, তা বেশ বোঝা যায়। ভেদ কেবল উপাধিতে।

এ-কথাই অনুভূতিপ্রকাশ গ্রন্থে ১০/৬১ শ্লোকে বলা হয়েছে—কার্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ। কার্যকারণতাং হিত্বা পূর্ণবোধোঽবশিষ্যতে। সূক্ষ্ম-স্থূল দেহকে উপাধিরূপে গ্রহণ করলে, সেই উপাধি-উপহিত চৈতন্যকে বলে জীব আর সূক্ষ্ম-স্থূলের কারণ যে অব্যাকৃত প্রকৃতি তাকে উপাধিরূপে গ্রহণ করে সেই একই চৈতন্য হন ঈশ্বর। এই কার্য-কারণতাকে বাদ দিলে একই শুদ্ধ অনুপহিত চৈতন্যমাত্র থাকেন—তিনি জীব বা ঈশ্বর নন। তিনি পূর্ণবোধস্বরূপ পরমাত্মা॥৪৮॥

তুরীয় চৈতন্য

বনবৃক্ষ-তদবচ্ছিন্নাকাশয়োঃ জলাশয় - জলগত - প্রতিবিম্বাকাশয়োঃ বা আধারভূতং অনুপহিত-আকাশবদ্ অনয়োঃ অজ্ঞান তৎ উপহিত চৈতন্যয়োঃ আধারভূতং যৎ অনুপহিতং চৈতন্যং তৎ তুরীয়ং ইতি উচ্যতে।"শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ" [মাণ্ডুঃ ৭] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ ।।৪৯।।**

বন অবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষ অবচ্ছিন্ন আকাশের অথবা জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত ও জলে প্রতিবিম্বিত আকাশের উভয়ের আধারভূত আকাশ যেমন অনুপহিত শুদ্ধ আকাশ [বলে তুরীয়] তেমনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য [যথাক্রমে প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বরের] আধারভূত অনুপহিত চৈতন্যকে তুরীয় বলে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলা হয়েছে, 'জ্ঞানিগণ সর্বদোষমুক্ত মঙ্গলময় অদ্বৈত চৈতন্যকে চতুর্থ (তুরীয়) মনে করেন, তিনি আত্মা, তাঁকে জানতে হবে।' ।।৪৯ ।।

অমৃত টীকা ঃ বৃক্ষ ও বনসীমিত আকাশ ছাড়িয়ে সকল উপাধি বিনির্মুক্ত অসীম আকাশ যেমন শুদ্ধ, এক, আবার জল ও জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত আকাশের অপেক্ষায় বিম্বভূত শুদ্ধ আকাশ যেমন এক, অদ্বিতীয়, তেমনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য এক, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ। এই শুদ্ধ এক আকাশ যেমন বন ও বৃক্ষের অথবা জল ও জলাশয়ের আধার তেমনি এক অনুপহিত শুদ্ধ চৈতন্য ব্যষ্টি ও সমষ্টি অজ্ঞানের আধার।

কোন বস্তু আধার ব্যতীত কল্পিত হতে পারে না। বেদান্তমতে সর্বব্যাপী চৈতন্যই সকল সৃষ্টির আধার। আকাশ বন ও বৃক্ষকে আশ্রয় করে থাকে না। আকাশ দান না করলে সৃষ্টি হতে পারে না। তাই আকাশকেই বন ও বৃক্ষের আধার বলা হয়েছে। আধারভূত অনবচ্ছিন্ন মহাকাশ যেমন, তেমনি প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বরের আধারভূত বিশুদ্ধচৈতন্যকে তুরীয় বলা হয়েছে। তুরীয় শব্দের অর্থ হলো চতুর্থ। এখানে উপমায় যদিও তিনটি চৈতন্যের কথা বলা হয়েছে— প্রাজ্ঞ চৈতন্য, ঈশ্বর চৈতন্য, শুদ্ধ চৈতন্য, তাহলেও পরবর্তীতে প্রকাশ্য স্থূল-সূক্ষ্ম ও কারণকে লক্ষ্য করে কারণাতীত চৈতন্যকেই এখানে চতুর্থ (তুরীয়) বলা হয়েছে। কৈবল্যোপনিষদে ১৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

ত্রিষু ধামসু যদ্‌ভোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যদ্ভবেৎ।
তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রোঽহং সদাশিবঃ।।

তিনলোকে যা কিছু ভোগ্যবস্তু, ভোক্তাজীব ও ভোগক্রিয়া হয়েছে, সে-সকল থেকে আলাদা সাক্ষিস্বরূপ চিন্মাত্র আমি সদাশিব। অর্থাৎ সকল ভোগ্য-ভোক্তা-ভোগ ভাব মুক্ত শুদ্ধ আত্মাই জীবের স্বরূপ। এই উপাধিরহিত আত্মাকেই তুরীয় বলা হয়েছে। তুরীয় চৈতন্যই একমাত্র সত্তা। জগতের অনুভব মায়িক। একথা বোঝানই বেদান্তের উদ্দেশ্য ।।৪৯ ।।

তুরীয়চৈতন্য কিভাবে মহাবাক্যের বাচ্য ও লক্ষ্য

ইদমেব তুরীয়ং শুদ্ধচৈতন্যং অজ্ঞানাদি-তৎ-উপহিত-চৈতন্যাভ্যাং তপ্ত-অয়ঃপিণ্ডবৎ অবিবিক্তং সৎ মহাবাক্যস্য বাচ্যং, বিবিক্তং সৎ লক্ষ্যং ইতি (চ) উচ্যতে।।৫০।।

এই তুরীয় শুদ্ধচৈতন্যই ব্যষ্টি ও সমষ্টি অজ্ঞানরূপ উপাধি সহযোগে তপ্তলৌহপিণ্ডের মতো অপৃথকভাবে মহাবাক্যের বাচ্যার্থ হয় আর পৃথকভাবে অর্থ করলে লক্ষ্যার্থ হয় ।।৫০ ।।

অমৃত টীকা ঃ লোহায় হাত পুড়েছে বললে, অগ্নি ও লোহাকে অপৃথকভাবে ধরে কথা বলা হয়। কারণ, সকলেই জানেন, লোহায় হাত পোড়ে না, আগুনে পোড়ে। লোহা আগুনে তপ্ত হওয়ায় উত্তপ্ত লোহায় হাত পুড়েছে। আগুন ও লোহাকে এক করে আমরা বলি, লোহায় হাত পুড়েছে। আলাদাভাবে বুঝি, লোহা আলাদা আগুন আলাদা। আগুনের ধর্ম লোহায় লেগেছে, তাই লোহা গরম। সেরূপ মহাবাক্যের অর্থও উপাধি সহযোগে এক করে ধরলে হয় বাচ্যার্থ আর উপাধি থেকে বিযুক্ত করে পৃথকভাবে ধরলে হবে লক্ষ্যার্থ। যেমন লোহা আর আগুন এক করে ধরে বলা হলো, লোহায় হাত পুড়েছে—এটি হলো বাচ্যার্থ, অর্থাৎ শব্দের শক্তিতে যা মুখ্যভাবে বোঝা যায় তাই বাচ্যার্থ। এখানে মুখ্যভাবে বোঝা যাচ্ছে, লোহাতেই হাত পুড়েছে। কিন্তু এই অর্থ অসঙ্গত, কারণ লোহাতে কখনো হাত পোড়ে না। সুতরাং লক্ষ্য অর্থ হবে, শব্দ শক্তিলব্ধ অর্থের সঙ্গে সম্বন্ধিত 'অগ্নি' পদ অর্থাৎ অগ্নিসংযোগে উত্তপ্ত লোহায় হাত পুড়েছে বুঝতে হবে। আগুনেই হাত পুড়েছে। এটাই লক্ষ্যার্থ।

তেমনি 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে তৎপদের ও ত্বম্‌পদের বাচ্যার্থ হলো, তৎ—সেই ও ত্বম্—তুমি এবং 'অসি' মানে হও—অর্থাৎ 'সেই তুমি হও'। 'সেই' পদে ঈশ্বর—সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য এবং 'ত্বম্' পদে প্রাজ্ঞ, ব্যষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য—বাচ্যার্থ হলো ঃ (প্রাজ্ঞ জীব) তুমি ঈশ্বর হও। জীব

ও ঈশ্বর এক হলো। আর লক্ষ্যার্থ ধরলে হবে ব্যষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের কেবল চৈতন্যটি ও সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের কেবল চৈতন্যটি এক। জীব ও ব্রহ্ম এক। 'জীবব্রহ্মৈক্য শুদ্ধব্রহ্মাং প্রমেয়ং' এই গ্রন্থের বিষয়। বাচ্যার্থে ও লক্ষ্যার্থে যে-চৈতন্যের কথা বলা হলো, তা তুরীয় শুদ্ধ চৈতন্যকেই বোঝায় ।।৫০ ।।

২৫/১২

অজ্ঞানের দুটি শক্তি

অস্য অজ্ঞানস্য আবরণ-বিক্ষেপ-শক্তিদ্বয়ম্ অস্তি ।।৫১ ।।

এই অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে দুই শক্তি আছে।।৫১ ।।

আবরণ শক্তির পরিচয়

আবরণশক্তিঃ তাবৎ অল্পঃ অপি মেঘঃ অনেক-যোজন-আয়তম্ আদিত্যমণ্ডলম্ অবলোকয়িতৃ নয়নপথ-পিধায়কতয়া যথা আচ্ছাদয়তি ইব, তথা অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নম্ অপি আত্মানম্ অপরিচ্ছিন্নম্ অসংসারিণম্ অবলোকয়িতৃ-বুদ্ধি-পিধায়কতয়া আচ্ছাদয়তি ইব তাদৃশং সামর্থ্যম্। তদুক্তং—ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্ন-মর্কম্, যথা নিষ্প্রভম্মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ। তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ।। ইতি [হস্তামলকম্ ১০] ।।৫২ ।।

আবরণ শক্তি হলো যেমন একখণ্ড ছোট মেঘ, দ্রষ্টা পুরুষের নয়নপথ আচ্ছাদিত করায় অনেক যোজন আয়তন বিশিষ্ট সূর্যমণ্ডল যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে, [সূর্যপ্রভা যেন নিষ্প্রভ ম্লান হয়ে গেছে বলে মনে হয়] সেরূপ অজ্ঞান পরিচ্ছন্ন [অর্থাৎ মেঘের মতো সসীম] হলেও দ্রষ্টা পুরুষের বুদ্ধিকে আচ্ছাদন করায় অসীম অসংসারী আত্মা যেন আচ্ছাদিত হয়েছে, এরূপ বোধ করার সামর্থ্যকে আবরণশক্তি বলে। হস্তামলকাচার্য বলেছেন ঃ অতিমূঢ় যেমন মেঘের দ্বারা আবৃত সূর্যকে আচ্ছাদিত নিষ্প্রভ বলে মনে করে, সেরূপ যার বুদ্ধি আবৃত, তার কাছে যিনি বদ্ধ বলে মনে হয়, সেই নিত্য উপলব্ধিস্বরূপ আত্মাই আমি ।।৫২ ।।

অমৃত টীকা ঃ অজ্ঞান সসীম। তা অসীম আত্মাকে ব্যাপ্ত করতে পারে না। কিন্তু এটা জীবের জ্ঞানকে আবৃত করে ব্রহ্মস্বরূপ বুঝতে দেয় না। এই যে

বুঝতে না দেওয়ার শক্তি, একেই অজ্ঞানের আবরণশক্তি বলা হয়েছে। এ বিষয়ে উদাহরণ ঃ মেঘখণ্ড যেমন সসীম হয়েও বিরাট সূর্যমণ্ডলকে আচ্ছাদন করেছে বলে বোধ হয়। কারণ মেঘখণ্ড দ্রষ্টার দৃষ্টিকে (নয়নপথকে) মাত্র ঢেকে ফেলে—তাতেই বোধ হয় যেন সূর্য ঢাকা পড়েছে, সূর্যের প্রভা ম্লান হয়েছে। এরূপ অজ্ঞানও ব্রহ্মকে যেন ঢেকে রেখেছে। বস্তুত এই বোধ অজ্ঞানী মানুষেরই হয়—জ্ঞানীর হয় না। অজ্ঞানীর বুদ্ধি ব্রহ্মকে ধারণা করতে পারে না বলে সে মনে করে, ব্রহ্ম ঢাকা পড়েছে, অর্থাৎ তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারে না। এখানে মূলে যে 'বুদ্ধি ঢাকা পড়েছে' বলে বলা হয়েছে, তা অসম্ভব। কারণ বুদ্ধি অজ্ঞানের কার্য—অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন। উৎপত্তির পূর্বে অজ্ঞান ব্রহ্মকে আশ্রয় করে যেন ব্রহ্মকে ঢাকে। সুতরাং এখানে বুদ্ধি বলতে মলিন সত্ত্বোপহিত চৈতন্যকে বুঝতে হবে। প্রথমে অজ্ঞান বস্তুর যথার্থ রূপকে বুঝতে দেয় না—যেন আবৃত করে রাখে, এই আবরণই সকল সৃষ্টির কারণ অবস্থা, পরবর্তী বিক্ষেপ শক্তির বীজভূত।।৫২।।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, আবরণশক্তির কার্য কি? তার উত্তরে বলা হচ্ছে ঃ

আবরণশক্তির কার্য

অনয়াবৃতস্য আত্মনঃ কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদি-সংসার-সম্ভাবনা-অপি ভবতি, যথা স্বাজ্ঞানেনাবৃতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসম্ভাবনা।।৫৩।।

অজ্ঞানের এই আবরণশক্তির দ্বারা আবৃত আত্মায় কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সুখিত্ব দুঃখিত্ব প্রভৃতি সংসার সম্ভাবনাও থাকে, যেমন নিজ অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত রজ্জুতে সর্প ভাবনার সম্ভাবনা থাকে।।৫৩।।

অমৃত টীকা ঃ অজ্ঞান প্রথমত বস্তুটির যথার্থ রূপ ঢেকে দেয়। যদি বস্তুটিকে যথাযথভাবে দেখা যেত, তবে ভ্রম হতে পারত না। আবরণশক্তি বস্তুর যথার্থ রূপ ঢেকে দেওয়ায় নানাবিধ ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে। যেমন, যদি কেউ প্রথমে দড়িকে যথাযথ দেখে, তবে দড়িকে সাপ বলে ভুল করে না। দড়িকে যথাযথ ভাবে না দেখার জন্যই সর্প, মালা, জলধারা, ভূমির ফাটল প্রভৃতি রূপে ভুল দেখার সম্ভাবনা থাকে। সেরূপ ব্রহ্মকে যথার্থভাবে না দেখার জন্যই নিজ আত্মাতে 'আমি কর্তা, ভোক্তা, সুখী বা দুঃখী' প্রভৃতি সংসার ধর্মের

সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে দেখার সম্ভাবনা থাকে। এই হলো আবরণশক্তির কাজ ।।৫৩ ।।

বিক্ষেপশক্তির পরিচয়

বিক্ষেপশক্তিঃ তু যথা রজ্জু-অজ্ঞানং স্ব-আবৃতরজ্জৌ স্বশক্ত্যা সর্পাদিকম্ উদ্ভাবয়তি, এবম্ অজ্ঞানমপি স্ব-আবৃত-আত্মনি স্বশক্ত্যা আকাশ-আদি-প্রপঞ্চম্ উদ্ভাবয়তি তাদৃশং সামর্থ্যম্। তদুক্তং "বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ" ইতি [বাক্যসুধা ১৩] ।।৫৪ ।। ৭/২/2000

বিক্ষেপশক্তি হলো, যেমন রজ্জুর অজ্ঞান রজ্জুকে আবৃত করে রজ্জুতে নিজশক্তির দ্বারা সর্প প্রভৃতি কল্পনা করে, সেরূপ [আত্মাশ্রিত] অজ্ঞান আত্মাকে আবৃত করে আত্মাতে নিজশক্তি বলে আকাশাদি জগৎ সৃষ্টি করে। [এভাবে কল্পনা-বলে] সৃষ্টি করার এই সামর্থ্যকে বিক্ষেপশক্তি বলে। এই সম্পর্কে বাক্যসুধায় বলা হয়েছে—বিক্ষেপশক্তি সূক্ষ্মশরীর থেকে আরম্ভ করে ব্রহ্মাণ্ড পর্যন্ত জগৎ সৃষ্টি করে ।।৫৪ ।।

অমৃত টীকা ঃ শুদ্ধচৈতন্য অসঙ্গ উদাসীন। তা থেকে জগতের উৎপত্তি হতে পারে না। সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য ঈশ্বরও অসঙ্গ উদাসীন, তিনিই বা কিভাবে জগৎ কারণ হবেন? এরূপ আশঙ্কার উত্তরেই বলা হয়েছে, বিক্ষেপশক্তি-প্রভাবেই—শক্তির পরিণামবশতই জগৎ প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, অজ্ঞান রজ্জু-আশ্রিত হতে পারে না। কারণ, জড়ে আবরণ থাকে না। জ্ঞানের আবরণ থাকে। সুতরাং 'রজ্জু অজ্ঞানং' বললেও এর অর্থ হবে রজ্জু অবচ্ছিন্ন চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞানের। আবরণশক্তিতে অজ্ঞান নিজ বিক্ষেপশক্তি বলেই সর্প জলধারাদি ভ্রমের কারণ হয়। চৈতন্য আধার না হলে ভ্রম প্রকাশিত হতে পারত না। ভ্রম বোধটাও চৈতন্য প্রযুক্তই হয়ে থাকে, কারণ জড়ে প্রকাশকত্ব নেই। যেমন মেঘ সূর্যকে আবৃত করলেও সূর্যকিরণবলেই মেঘকে দেখা সম্ভব হয়—মেঘের প্রকাশকত্ব নেই। সেরকম রজ্জুনিষ্ঠ অজ্ঞান চৈতন্যাশ্রিত না হলে জ্ঞানের আবরক হতে পারে না। তাই রজ্জু অজ্ঞান বললে বুঝতে হবে রজ্জু অবচ্ছিন্ন চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞান। এই অজ্ঞানই আবরণ এবং তাতেই নিজ বিক্ষেপশক্তিবলে মিথ্যা জগৎ সৃষ্টি করে। অজ্ঞানের আশ্রয় ও

বিষয় চৈতন্য-ই। সুতরাং জড় অজ্ঞানসৃষ্ট বস্তু বলে, অজ্ঞান তাকে আশ্রয় করে না বা বিষয়ও করে না। চৈতন্য সর্বব্যাপক। তার যে অংশে বুদ্ধি, সেই অংশ ভিন্ন অপর অংশকে অজ্ঞান আবৃত করায়, সেই বুদ্ধি-প্রতিবিম্বিত চৈতন্যে কর্তাভোক্তাদির বোধ হয়—এভাবে জীব নিজেকে সর্বব্যাপক চৈতন্য মনে না করে বদ্ধ বলে মনে করে থাকে।।৫৪।।

ঈশ্বরের জগৎকারণতার ব্যাখ্যা

শক্তিদ্বয়বৎ - অজ্ঞান-উপহিতং চৈতন্যং স্বপ্রধানতয়া নিমিত্তং। স্ব-উপাধি-প্রধানতয়া উপাদানং চ ভবতি।।৫৫।।

[এই] শক্তিদ্বয়যুক্ত [আবরণ ও বিক্ষেপ] অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যকে প্রধানরূপে ধরলে (জগতের) নিমিত্ত-কারণ এবং নিজ উপাধিকে প্রধানরূপে ধরলে উপাদান-কারণ হন।।৫৫।।

অমৃত টীকা : প্রশ্ন হতে পারে, আত্মা অবিকারী, তিনি জগতের কারণ কি না? যদি জগৎ কারণ হন তবে, তিনি নিমিত্ত-কারণ অথবা উপাদান-কারণ? যে-কোন কার্যের দুইটি কারণ থাকে। একটি নিমিত্ত-কারণ অন্যটি উপাদান-কারণ। যে কারণটি কার্যের সঙ্গে যুক্ত, তাকে উপাদান-কারণ আর যেটি কার্যের সঙ্গে যুক্ত না থেকে কার্য উৎপাদনে সহায়তা করে, তাকে বলে নিমিত্ত-কারণ। যেমন মাটি ঘটরূপ কার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে মাটি ঘটের উপাদান-কারণ। কুম্ভকার, চাকা, দণ্ড প্রভৃতি ঘট উৎপাদনে সহায়ক হলেও ঘটের সঙ্গে এদের যুক্ত দেখা যায় না। এ সকল কারণকে নিমিত্ত-কারণ বলে। এখন কথা হলো, ঈশ্বর জগতের কোন্ কারণ? ঈশ্বর জগতের অভিন্ন-নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ।।৫৫।।

যথা লূতা তন্তুকার্যং প্রতি, স্বপ্রধানতয়া নিমিত্তং, স্ব-শরীর-প্রধানতয়া উপাদানং চ ভবতি।।৫৬।।

যেমন, মাকড়সা তার জালরূপকার্যে নিজে (চেতন) প্রধানরূপে নিমিত্ত-কারণ আর নিজশরীরকে প্রধান ধরে উপাদান-কারণ হয়।।৫৬।।

অমৃত টীকা : কেমন করে একসঙ্গে নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হতে

পারে? এরই উত্তরে মাকড়সার দৃষ্টান্ত। মাকড়সার চৈতন্যকে অর্থাৎ তার ইচ্ছাশক্তিকে প্রধানভাবে ধরলে মাকড়সা তার জাল রচনার নিমিত্ত-কারণ হয় আর মাকড়সার জালের উপাদান তার নিজ শরীরের লালা। অতএব, মাকড়সার শরীরকে প্রধান করে ধরলে, যেমন মাকড়সা, একই শরীরে উপাদান-কারণও হয়। সেরূপ সমষ্টি অজ্ঞান উপাধিকে প্রধান করে ধরলে, ঈশ্বর হন জগতের উপাদান-কারণ আবার অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যকে প্রধান করে ধরলে, তিনিই হন নিমিত্ত-কারণ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উপনিষদে বলা হয়েছে 'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'—জগৎ সৃষ্টি করে তিনি জগতে অনুপ্রবিষ্ট হলেন—[তৈঃ ২।৬।১]। তবে তিনি নিমিত্ত-কারণ হতে পারেন না। কারণ নিমিত্ত-কারণ কার্যে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারে না। আবার তিনি উপাদান-কারণও হতে পারেন না। কারণ, উপাদান-কারণটির ধর্ম কার্যেও থাকবে, যেমন মাটি ঘটেও থাকে। মাটির ধর্ম ঘটেও থাকবে। তাহলে ব্রহ্ম চেতন, নিত্য, শুদ্ধ, নিরবয়ব, অসীম—তা থেকে উৎপন্ন জগৎও সেরূপ নিত্যশুদ্ধ নিরবয়ব অসীম হবে, কিন্তু তা নয়। জগৎ অনিত্য, অশুদ্ধ, সাবয়ব, সসীম। অতএব জগৎকারণ ব্রহ্ম হতে পারেন না।

এর উত্তরে বলা হয়েছে, যেমন চুম্বকের সম্মুখে জড় লোহাকেও নড়তে দেখা যায়, তেমনি মায়াশক্তি জড় হলেও চৈতন্য স্পর্শে জগৎরূপে পরিণত হয়। মায়ার অধীশ্বর মায়াবী ঈশ্বর বলে পরম্পরাক্রমে ঈশ্বরকে গৌণভাবে উপাদান-কারণ বলাতে অসঙ্গতি কিছু নাই। আর অজ্ঞানের এই বিকারের প্রতি চৈতন্যের এই প্রভাবকে নিমিত্ত-কারণরূপে বলা হয়েছে। চৈতন্যের প্রভাবেই সৃষ্টিকার্যে মায়োপহিত ব্রহ্মের ইচ্ছার উদ্রেক। সুতরাং ঈশ্বর নিমিত্ত-কারণ। আর যে বলা হয়েছে, তৎ সৃষ্ট্বা ইত্যাদি—তা উপাদান-কারণবিষয়ক বলে নিমিত্ত-কারণ হতে পারেন না, একথা বলাও ব্যর্থ হয়।

ঈশ্বর উপাদান-কারণ হলে জগতের নিত্যত্ব প্রভৃতি যে সকল আক্ষেপ করা হয়েছিল তার উত্তরে বলা যায়, পরিণামী কার্যের ক্ষেত্রেই কারণগুলি কার্যে অনুবর্তন করে। কিন্তু বিবর্ত সৃষ্টির ক্ষেত্রে তদ্রূপ কোন নিয়ম নেই। পরিণামী সৃষ্টি হলো, যেমন দুধ পরিণাম প্রাপ্ত হয়ে দই হয় অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ পালটে যায়। বা সোনার তাল পরিণাম প্রাপ্ত হয়ে হার কেয়ূর ইত্যাদি রূপ পায়। এক্ষেত্রে সোনা সোনাই থাকে বটে কিন্তু, নাম রূপ পিণ্ড ধর্ম পালটে যায়। কিন্তু বিবর্তসৃষ্টিতে তা হয় না। উদাহরণ, যেমন ভ্রমস্থলে, রজ্জুতে সর্প দেখাটা

ভ্রমমাত্র। ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টির প্রতি বিবর্ত অধিষ্ঠান বলে আকাশাদি জগৎ প্রপঞ্চ মায়াকার্য, মায়ার পরিণাম, কিন্তু ব্রহ্মের বিবর্ত। সুতরাং ব্রহ্ম-ধর্ম জগতে অনুবর্তন করবে না, বরং মায়ার ধর্ম অনিত্যত্ব, অশুদ্ধত্ব, সসীমত্ব, সাবয়বত্বাদি জগতে দেখা যায় । এখন মায়ার আশ্রয় ব্রহ্ম বলে, আর মায়ার ব্রহ্মভিন্ন পারমার্থিক সত্তা না থাকায় ভ্রমস্থলে সর্পের উপাদান যেমন দড়িই, তেমনি ব্রহ্মই জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদান-কারণ।

তাহলেও প্রশ্ন উঠবে, মায়া যখন মিথ্যা, তখন বন্ধন-মুক্তিও মিথ্যা, মিথ্যা শাস্ত্র আলোচনা, ইত্যাদি? এর উত্তর হলো, ঠিকই তো। এটা বোঝার জন্যই তো সাধন-ভজন, শাস্ত্র পাঠ, আলোচনা ইত্যাদি।

তাহলে মাকড়সার ভিতরে যদি চৈতন্য না থাকত তবে, যেমন মৃত মাকড়সার দেহ থেকে লালা দিয়ে জাল তৈরির ইচ্ছা বা কার্য সম্ভব হতো না, তেমনি অজ্ঞানের আশ্রয় চৈতন্য না থাকলে জগৎ রচনার সঙ্কল্প বা মায়ার পরিণামপ্রাপ্তিও হতো না। একেই বলা হচ্ছে, চৈতন্যকে প্রধানভাবে ধরলে ঈশ্বর জগৎরচনার নিমিত্ত-কারণ আর তার সঙ্গে অভিন্ন মায়া শক্তিকে প্রধান করে ধরলে তিনিই মায়ার দ্বারে জগতের উপাদান-কারণ হন। তাই ব্রহ্মই জগতের অভিন্ন নিমিত্ত-উপাদান-কারণ।।৫৬।। ৮/৭/২০০০

বিক্ষেপশক্তি-উপহিত চৈতন্য থেকে জগৎ সৃষ্টির বর্ণনা

তমঃপ্রধান-বিক্ষেপশক্তিমৎঅজ্ঞান-উপহিত-চৈতন্যাৎ আকাশঃ, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োঃ অগ্নিঃ, অগ্নেঃ আপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চ উৎপদ্যতে, 'তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ' [তৈঃ ২।১।৩] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ।।৫৭।।**

তমঃ-প্রধান বিক্ষেপশক্তি-বিশিষ্ট অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্য থেকে আকাশ, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে তেজ, তেজ থেকে জল, জল থেকে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। যেহেতু শ্রুতিতে আছে, 'সেই এই আত্মা থেকে আকাশ উৎপত্তি হয়েছে' ইত্যাদি।।৫৭।।

অমৃত টীকা ঃ অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য থেকে আকাশ আবার আকাশ উপহিত চৈতন্য থেকে বায়ু, এভাবে সর্বত্র কারণ-উপহিত চৈতন্য থেকে সৃষ্টির ক্রম বুঝতে হবে। তাহলে কিন্তু প্রশ্ন থাকে যে, বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর বলা হয়েছে, সেই ঈশ্বর থেকে সৃষ্টি হলে তমঃ-প্রধান

বিক্ষেপশক্তি বলা হলো কেন? উত্তরে বলা যায়, সত্ত্বগুণে চৈতন্যের প্রতিভাস পড়ে বলে সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের ঐরূপ সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতিতে তিনগুণই সমভাবে থাকায় আবরণ শক্তির পর বিক্ষেপশক্তি থেকে আকাশাদি জড়বর্গের উৎপত্তি দেখে—কার্য জড় দেখে, কারণকেও তমঃপ্রধান বলা হলো। কারণ-গুণ কার্যে অনুবর্তন করে। কারণ তমঃপ্রধান না হলে আকাশাদিতে চেতনার বিকাশ দেখা যেত; কিন্তু আকাশাদিতে চেতনা নাই। স্বতন্ত্রভাবে কেবল জড় অজ্ঞান থেকে জগতের উৎপত্তি হতে পারে না। সত্ত্বগুণপ্রধান আবরণশক্তির পরই ঈক্ষণক্রমে ঈশ্বরের রজঃপ্রধান শক্তির বিকাশে সিসৃক্ষা ও পরে তমঃ-প্রধান ক্রিয়াশক্তিতে জগৎসৃষ্টি হলো বলে ভাবা যেতে পারে। ঈশ্বরই এভাবে জগতের অভিন্ন-নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ। এবিষয়ে শ্রুতিবাক্যগুলি ঃ "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিশংবিশন্তি" [তৈঃ ৩।১।১।], "সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" [ছাঃ ৬।২।১], "এতস্মাৎ জায়তে প্রাণোমনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ" [মুঃ ১।১।৩]। এ বিষয়েই মূলে বলা হয়েছে, তস্মাৎ বা ইত্যাদি।।৫৭।।

সূক্ষ্ম ভূতমধ্যে কারণগুণ

তেষু জাড্যাধিক্যদর্শনাৎ তমঃপ্রাধান্যং তৎকারণস্য। তদানীং সত্ত্বরজঃতমাংসি কারণগুণক্রমেণ তেষু আকাশাদিষু উৎপদ্যন্তে।।৫৮।।

সেই সকল আকাশাদিতে অধিক জড়তা দেখা যায় বলে তাদের কারণের তমঃগুণের আধিক্য (অনুমিত) হয়। তখন অর্থাৎ উৎপত্তিকালে কারণ অজ্ঞানের গুণ অনুসারে (কার্য) আকাশাদিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণের উৎপত্তি হয়।।৫৮।।

অমৃত টীকা ঃ তমঃগুণ প্রাধান্যের কারণ বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক সুতরাং কেমন করে তমঃগুণমাত্র প্রধান থেকে আকাশাদির উৎপত্তি সম্ভবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা হচ্ছে, উৎপত্তি সময়ে সত্ত্বাদি গুণগুলিও কারণগুণানুক্রমে কার্যে অর্থাৎ পঞ্চভূতে পরস্পরক্রমে ন্যূন অধিকরূপে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ আকাশ থেকে বায়ুতে, আবার বায়ু থেকে তেজে, এভাবে পৃথিবীতে সত্ত্বমাত্রা কম তমঃমাত্রা অধিক হতে থাকে। আকাশ থেকে পৃথিবীভূতে জড়তা অধিক। যদিও এগুলি তন্মাত্রা বা অপঞ্চীকৃত

অতিসূক্ষ্মভূত। আবরণ-শক্তিই অব্যাকৃত মায়াশক্তি, এতে উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর। এ থেকে যেমন যেমন সত্ত্বাদিগুণের তারতম্যে কার্যবর্গের উৎপত্তি হলো তেমন তেমন কার্যেও কারণক্রমে সত্ত্বাদিগুণের তারতম্য লক্ষিত হতে থাকল। আধিক্য-শব্দের প্রয়োগেই বোঝা যাচ্ছে, অন্যান্য গুণের অস্তিত্বও সেখানে আছে। কার্যবর্গের যে সত্তা ও জ্ঞান অনুভূত হয়, তাতেই চৈতন্যধর্মের কার্যে অনুপ্রবেশ বুঝতে হবে। একথাই বলা হয়েছে ঃ অস্তিভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্। আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ম্।। [বাক্যসুধা ২০] অস্তি, ভাতি, প্রিয়, নাম ও রূপ এই পাঁচটির বোধই জগতের সকল বস্তুতে হয়। এই পাঁচটির প্রথম তিনটি অর্থাৎ অস্তি ভাতি ও প্রিয় ব্রহ্মধর্ম। বাকি দুটি, নাম ও রূপ মায়ার কার্য।।৫৮।।

ইমানি এব সূক্ষ্মভূতানি তন্মাত্রাণি অপঞ্চীকৃতানি চ উচ্যন্তে।।৫৯।।

এইগুলিকে (পণ্ডিতেরা সেই প্রথমোৎপন্ন পঞ্চভূতকে) সূক্ষ্মভূত, তন্মাত্রা ও অপঞ্চীকৃত [মহাভূত] বলেন।।৫৯।।

সূক্ষ্মভূত থেকে সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূলভূতের উৎপত্তি

এতেভ্যঃ সূক্ষ্মশরীরাণি স্থূলভূতানি চ উৎপদ্যন্তে।। ৬০।।

আকাশাদি এই সকল পাঁচটি সূক্ষ্মভূত থেকে সূক্ষ্ম শরীর সকল ও স্থূলভূত (ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম) সকল উৎপন্ন হয়।। ৬০।।

অমৃত টীকা ঃ সূক্ষ্মশরীর সকল বলতে জীবের সূক্ষ্মশরীর। পাঁচটি স্থূলভূতের উৎপত্তিও এই সূক্ষ্মভূত থেকেই হয়। সূক্ষ্মভূত থেকে স্থূলভূতেরও উৎপত্তি হয়। বালবোধিনীর মতে, ঠিক একথা বলা যায় না, কারণ বেদে এরূপ উক্তি নাই। যেমন সুতো থেকে কাপড়ের উৎপত্তি হয়, বলা যায় না। তবে কি, সুতোর আতান-বিতান রূপ সংযোগ বিশেষে সুতোই কাপড়রূপে দেখায়—একে ঠিক উৎপত্তি বলা চলে না। সুতোর অতিরিক্ত কাপড়ের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। সেরূপ সূক্ষ্মভূত সকলের সম্মিলন বিশেষকেই স্থূলভূত বলে, এ ঠিক উৎপত্তি নয়। তাহলেও এই সম্মিলন বিশেষকেই সাধারণ কথায় উৎপত্তি বলে বলা হয়ে থাকে।।৬০।।

সূক্ষ্মশরীর কি?

সূক্ষ্মশরীরাণি সপ্তদশ-অবয়বানি লিঙ্গশরীরাণি।।৬১।।

সতেরটি অবয়ববিশিষ্ট লিঙ্গশরীরকে সূক্ষ্মশরীর বলে।।৬১।।

অমৃত টীকা ঃ লিঙ্গশরীরের মানে হলো, যার দ্বারা 'লিঙ্গতে' মানে জানা যায়। কি জানা যায়? না, এসকলের ভিতরে চেতন আত্মা আছেন। তিনি থাকাতেই মন-বুদ্ধি, জ্ঞান-কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণসকল স্ব স্ব বিষয়ে চেষ্টিত হতে পারে, এটি জানা যায় এদের দ্বারা। এজন্য একে লিঙ্গশরীর বলা হয়। এদের থেকে অতিরিক্ত, অথচ এদের মধ্যে অনুগত যে চৈতন্য সেই চৈতন্য আধারেই এরা আধারিত বলে এরা স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হতে পারে। কারণ, এই সতেরটি অবয়ব বৃক্ষাদির মতোই জড়, নিজে নিজে কিছু করতে পারে না। চৈতন্যস্পর্শেই এদের চেতন বলে বোধ হয়। একথাই বৃহদারণ্যকোপনিষদে বলা হয়েছে ঃ "প্রাণস্য প্রাণং উত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ উত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো যো মনো বিদুঃ" [বৃঃ ৪।৪।১৮] কেনোপনিষদেও এরূপ বলা হয়েছে। সতের সংখ্যার জায়গায় চিত্ত ও অহংকারকে আলাদা ধরে উনিশ সংখ্যাও ধরা হয়। চিত্ত ও অহংকারকে মন ও বুদ্ধির মধ্যে ধরে সতের। আলাদা ধরলে সূক্ষ্মশরীরের অবয়ব হবে উনিশটি।।৬১।।

অবয়বগুলি কি কি ?

অবয়বাঃ তু জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চকং বায়ু-পঞ্চকং চ ইতি।।৬২।।

পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি বায়ু এবং মন ও বুদ্ধি—এই (সতেরটি) অবয়ব [নিয়ে সূক্ষ্মশরীর গঠিত]।।৬২।।

জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কি?

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি-শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি।।৬৩।।

শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ নামক পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে।।৬৩।।

অমৃত টীকা ঃ এই ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের জ্ঞান হয় বলে এদের জ্ঞানেন্দ্রিয় বলা হয়েছে।।৬৩ ।।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি

এতানি আকাশাদীনাং ব্যস্তেভ্যঃ সাত্ত্বিক-অংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্‌ক্রমেণ-উৎপদ্যন্তে।।৬৪ ।।

এই ইন্দ্রিয়গুলি আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক সত্ত্বাংশ থেকে ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়েছে।।৬৪ ।।

অমৃত টীকা ঃ প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। তা থেকে উৎপন্ন সকল পদার্থের তিনটি গুণ থাকবে। আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতের সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ আছে। আকাশের সত্ত্বগুণাংশ থেকে শ্রোত্র ইন্দ্রিয়ের, বায়ুর সত্ত্বগুণ থেকে ত্বক্ ইন্দ্রিয়ের, তেজের সত্ত্বগুণ থেকে চক্ষুর, অপের সত্ত্বগুণ থেকে রসনার এবং পৃথিবীর সত্ত্ব থেকে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হলো। সত্ত্বগুণে প্রকাশ বা জ্ঞান হয় বলে, এসকল ইন্দ্রিয়পথেই আমরা যথাক্রমে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের জ্ঞান লাভ করে থাকি।

ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যক্ষ হয় না। অপঞ্চীকৃত ভূত প্রত্যক্ষ হয় না। আমরা বাহিরে চক্ষু প্রভৃতি যা দেখি, তা ইন্দ্রিয় নয়, সেগুলি ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রমাত্র—বাসস্থান। স্বামীজীর মতে সত্যিকার ইন্দ্রিয় মগজের মধ্যে।

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধির্দশেন্দ্রিয় সমন্বিতম্। অপঞ্চীকৃত-ভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্। [আত্মবোধ ১।২] অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক থেকে সূক্ষ্মশরীরের উৎপত্তি। আর পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত থেকে স্থূল শরীরের উৎপত্তি। সুবোধিনী টীকায় এরূপ বলা হয়েছে। অব্যাকৃত থেকে পঞ্চতন্মাত্রার উৎপত্তি বেদান্তমতে স্বীকৃত। কিন্তু সাংখ্যমতে অহংকার থেকে পঞ্চভূত এবং পঞ্চমহাভূত থেকেই এদের উৎপত্তি। সাংখ্যের এই সৃষ্টিক্রমকে বেদান্ত একেবারে অস্বীকারও করে না। তবে শ্রৌতমত নয় বলে।।৬৪ ।।

বুদ্ধির পরিচয়

বুদ্ধিঃ নাম নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ।।৬৫ ।।

অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মক বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে।।৬৫ ।।

অমৃত টীকা : কোন কিছুর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা—'এটা-এই'—এরূপ বলে যে ধারণা, তাই বুদ্ধি। বুদ্ধি না হলে কোন কাজই হবে না। একটা বিষয় সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা না থাকলে কোন কাজই হতে পারে না। অন্তঃ মানে ভিতরের, করণ—ইন্দ্রিয়; ভিতরের ইন্দ্রিয়কে অন্তঃকরণ বলে। অন্তঃকরণ একটিই। তথাপি তার বৃত্তিভেদে আলাদা নাম হয়। যেমন একই ব্যক্তি যখন পাঠ করে তখন পাঠক, যখন রান্না করে তখন পাচক, যখন পূজা করে তখন পূজক ইত্যাদি। তেমনি অন্তঃকরণের নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তিকে বুদ্ধি বলে।।৬৫।।

মনের পরিচয়

মনো নাম সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ।।৬৬।।

সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তিকে মন বলে।।৬৬।।

অমৃত টীকা : মনের ধর্মই এই, সংশয় করে। একবার ঠিক করে, এটা এই বলে—একে সংকল্প বলে; পরক্ষণেই বিকল্প—বিপরীত ভাবনা এনে ভাববে, না, এটা তো তা নয়—এই ভাব। এটা 'নীল' এরূপ সঙ্কল্প করার পরই হয়তো বলবে, না, এটা তো নীল নয়, এটা সবুজ—তারপরই আবার অন্যটা। এভাবে স্থির করতে না পারাই মনের ধর্ম। বুদ্ধি স্থির করে—এই ভেদ।।৬৬।।

চিত্ত ও অহংকারের ধারণা

অনয়োঃ এব চিত্ত-অহংকারয়োঃ অন্তর্ভাবঃ।।৬৭।।

মন ও বুদ্ধির মধ্যে চিত্ত ও অহংকার অন্তর্ভুক্ত।।৬৭।।

অমৃত টীকা : সাধারণ কথায় মন-বুদ্ধি বললে চিত্ত ও অহংকার এই দুটি অন্তর্ভুক্ত বলে বুঝতে হবে। কারণ অন্তঃকরণ একটিই, বৃত্তিভেদে চারটি। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার। চিত্ত বুদ্ধিতে ও অহংকার মনেতে অন্তর্ভুক্ত। বিষয় পরিচ্ছিন্নত্বই চিত্ত ও বুদ্ধির অভিন্নত্বের কারণ। তথাপি বুদ্ধি অ-পূর্ব বিষয়কেও গ্রহণ করে, কিন্তু চিত্ত পূর্ব অনুভূত বিষয়কেই গ্রহণ করতে পারে, এই ভেদ। তেমনি মন ও অহংকার বাহ্য ও অভ্যন্তর সকল বিষয় গ্রহণ করলেও মন চঞ্চল, অহংকার অনাত্মা-উপরক্ত আত্মা, এই ভেদ। এজন্যই চারটির ভেদ নির্দেশ করা হয়।।৬৭।।

চিত্তের স্বরূপ

অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ চিত্তম্।।৬৮।।

অনুসন্ধান বা স্মরণাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিকে বলে চিত্ত।।৬৮।।

অহংকারের স্বরূপ

অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিঃ অহংকারঃ।।৬৯।।

'আমি আমি' এরূপ অভিমানরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিকে অহংকার বলে।।৬৯।।

অন্তঃকরণের উৎপত্তি ও স্বরূপ

এতে পুনঃ আকাশাদিগত-সাত্ত্বিকাংশেভ্যঃ মিলিতেভ্যঃ উৎপদ্যন্তে।।৭০।।

এই মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহংকার আকাশাদির মিলিত সত্ত্বাংশ থেকে উৎপন্ন।।৭০।।

অমৃত টীকা : সাংখ্যমতে এগুলি অহংকার থেকে উৎপন্ন। অহংকার থেকে পঞ্চভূতের এবং পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশ থেকে জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং সম্মিলিত সত্ত্বাংশ থেকে অন্তঃকরণের উদ্ভব।।৭০।।

এতেষাং প্রকাশাত্মকত্বাৎ সাত্ত্বিকাংশ-কার্যত্বম্।।৭১।।

প্রকাশাত্মক বলে সাত্ত্বিকাংশের কার্য।।৭১।।

অমৃত টীকা : বেদান্তমতে অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চৈতন্য থেকে আকাশাদি পঞ্চমহাভূত, পঞ্চমহাভূতের আলাদা আলাদাভাবে সত্ত্বাংশ থেকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ও এদের সম্মিলিত সত্ত্বাংশ থেকে মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকারের উদ্ভব। সত্ত্বাংশ কেন ধরা হলো? না, এদের প্রকাশস্বভাব দেখে বলা হলো 'এতেষাং প্রকাশাত্মকত্বাৎ'। গীতায়ও শ্রীভগবান বলেছেন, সত্ত্বগুণের লক্ষণ হলো 'নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।' অন্তঃকরণে শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ উপলব্ধ হয়; কর্ণাদিতে কেবল স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়ের বিষয়ই গৃহীত হয়। এজন্য অন্তঃকরণ মিলিত পঞ্চভূতের সত্ত্বাংশের সৃষ্টি বলা হয়েছে। [বালবোধিনী] ।।৭১।।

বিজ্ঞানময় কোশ

ইয়ং বুদ্ধিঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়কোশো ভবতি।।৭২।।

এই বুদ্ধি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত 'বিজ্ঞানময় কোশ' নামে কথিত হয়।।৭২।।

অয়ম্ এব কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্ব-আদি অভিমানত্বেন ইহলোক-পরলোকগামী ব্যবহারিকঃ জীবঃ ইতি উচ্যতে।।৭৩।।

এই কোশেই 'আমি কর্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী' প্রভৃতি অভিমান হয় বলে একে ইহলোকে ও পরলোকগামী ব্যবহারিক 'জীব' বলা হয়।।৭৩।।

অমৃত টীকা : জীব বলতে বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে বোঝায় অর্থাৎ অন্তঃকরণ অবচ্ছিন্নচৈতন্য। চৈতন্য স্পর্শে বুদ্ধি চেতনায়িত হয়ে 'আমি কর্তা, আমার দেহ, আমি ভোক্তা, আমি সুখী বা দুঃখী' এরূপ অনুভব করে ও মনের সাহয্যে ইন্দ্রিয় চালনা করে সংসারকে অনুভব করে—এভাবে ইহলোকে ব্যবহার করে ও পুণ্যাদি কাজ করে স্বর্গ বা অপুণ্য করে নরকাদি ভোগ করে বারে বারে জন্মমৃত্যুর প্রবাহে যাতায়াত করতে থাকে। তপ্তলোহার মতো বুদ্ধি চৈতন্য স্পর্শেই যে চেতনায়িত হয়েছে, একথা ভ্রান্ত জীব বুঝতে পারে না। লোহা আর অগ্নি যেমন আলাদা হয়েও লোহা অগ্নিতপ্ত হয়ে হাত পোড়ায়; সেরূপ চৈতন্য-প্রতিবিম্বিত বুদ্ধি নিজেকেই কর্তা মনে করে—চৈতন্যই যে আসল স্বরূপ, বুদ্ধির পারের তত্ত্ব, স্বতন্ত্র—একথা বুঝতে পারে না। বিজ্ঞানময়কোশ-সীমিত চিদাত্মাকে জীব বলা হয়। কর্তৃত্বাদি যে আরোপিত, বাস্তব নয়, তা 'অভিমান করেন বলে'—এ-কথার দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। মূলে আছে, কর্তৃত্বাদি অভিমান করে বলে ব্যবহারিক জীব বলা হয়। অভিমানবশত ভুল হয়—নিজেকে সর্বধর্মাতীত চৈতন্য বলে জানতে পারে না।।৭৩।।

মনোময় কোশ

মনস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সৎ মনোময়কোশঃ ভবতি।।৭৪।।

মনের সহিত জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বলা হয় মনোময় কোশ ।।৭৪ ।।

অমৃত টীকা : মন কর্মেন্দ্রিয় সহিত মিলিত হয়ে মনোময় কোষ হয় বলে কেহ কেহ বলেছেন। এখানে ইচ্ছাশক্তির প্রাধান্য দেখা যায়। জ্ঞানের পর ইচ্ছা তাই সত্ত্বোপহিত রজোবিকার বলে কেহ কেহ মনোময় কোশকে বলেন। বুদ্ধি থেকে আরো জড় অবস্থা—সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বলে।

জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ও মন নিয়ে এগারটি ইন্দ্রিয়। এর কমও নয় বেশিও নয়। বৃঃ উপনিষদে বলা হয়েছে ঃ "দশমে পুরুষে প্রাণা আত্মৈকাদশঃ"—দশটি প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, আত্মা শব্দে এখানে মনকে বুঝিয়েছেন, সব মিলিয়ে একাদশ ইন্দ্রিয়। এরা অণু ।।৭৪ ।।

কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটির পরিচয়

কর্মেন্দ্রিয়াণি—বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থাখ্যানি ।।৭৫ ।।

বাক্, পাণি (হাত), পাদ, পায়ু,উপস্থ (জননেন্দ্রিয়) কে কর্মেন্দ্রিয় বলে ।।৭৫ ।।

অমৃত টীকা : এই কয়টি ইন্দ্রিয় দিয়ে মানুষ কাজ করে। বাক্ কথা বলে। হাত পা ইত্যাদি দ্বারা যথাক্রমে আদান-প্রদান, গমন, বিসর্গ, আনন্দ গ্রহণ করে থাকে বলে এদের কর্মেন্দ্রিয় বলা হয় ।।৭৫ ।।

কর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি

এতানি পুনঃ আকাশাদীনাং রজঃ অংশেভ্যঃ ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ক্রমেণ উৎপদ্যন্তে ।।৭৬।।

এই কর্মেন্দ্রিয়গুলি আকাশ প্রভৃতির (অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের) পৃথক পৃথক রজঃ অংশ থেকে ক্রমে ক্রমে পৃথকভাবে উৎপন্ন হয়েছে।।৭৬ ।।

অমৃত টীকা : রজঃ প্রধান আকাশ থেকে বাক্ ইন্দ্রিয়, তেমনি রজঃ প্রধান বায়ু থেকে পাণি, রজঃ প্রধান তেজ থেকে পাদ, রজঃ প্রধান জল থেকে উপস্থ এবং রজঃ প্রধান পৃথিবী থেকে পায়ু ইন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয়। প্রশ্ন উপনিষদে (৪/৮) বলা হয়েছে ঃ বাক্ চ বক্তব্যং চ হস্তৌ চাদাতব্যং চোপস্থশ্চানন্দয়িতব্যং চ। পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যং চ পাদৌ চ গন্তব্যং চ ।।৭৬।।

পঞ্চবায়ুর লক্ষণ

বায়বঃ—প্রাণ-অপান-ব্যান-উদান-সমানঃ ॥৭৭॥

পঞ্চবায়ু হলো—প্রাণ অপান ব্যান উদান ও সমান ॥৭৭॥

প্রাণঃ নাম প্রাগ্‌গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্তী ॥৭৮॥

নাসিকার অগ্রস্থানে অবস্থিত যে বায়ু সম্মুখে গমন করে তাকে প্রাণ বলে ॥৭৮॥

অমৃত টীকা ঃ পাঁচ প্রকার কাজের জন্য পাঁচভাগে বিভাগ করে বলা হলো। মুখ্য এক প্রাণেরই বৃত্তি বিশেষে শরীরের নানাবিধ কাজ হয়ে থাকে। প্রাণ অপান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব নয়। প্রাণ বলে এখানে যা বলা হলো, তা আসলে বায়ুর ক্রিয়া। প্রাণশক্তি ও বায়ু আলাদা তত্ত্ব। কারণ মুণ্ডক উপনিষদে [২।১৩] বলা হয়েছে ঃ 'এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ খং বায়ুঃ'। এ থেকে মুখ্যপ্রাণ মন ইন্দ্রিয়সকল আকাশ ও বায়ু প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। এখানে স্পষ্টতই প্রাণ ও বায়ুকে আলাদা তত্ত্ব বলা হয়েছে। আবার বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে বলা হয়েছে ঃ 'যঃ প্রাণঃ সঃ বায়ুঃ' এই বাক্য প্রমাণবলে মুখ্যপ্রাণকে 'বায়ু' বলে জানা যায়। এ বিষয়ে মীমাংসা কি? শারীরকসূত্রে 'ন বায়ুক্রিয়ে পৃথক্ উপদেশাৎ' [২।৪।৯] বলা হয়েছে। এই মহান্ বায়ুই অধ্যাত্মভাব অর্থাৎ শরীরের মধ্যে প্রাণ ও অপান প্রভৃতি পাঁচ প্রকারে অবস্থানকরত মুখ্যপ্রাণরূপে কথিত হয়েছে, তা অশ্ম (পাথর) থেকে অশ্বের মতে তত্ত্বান্তর নয় অথবা শরীরছিদ্রে অবস্থিত আকাশের মতো শরীর মধ্যে অবস্থিত বায়ুমাত্রও নয়। অথচ পঞ্চদশী বেদান্তসার ও বেদান্তপরিভাষায় মুখ্য প্রাণকে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের সম্মিলিত রজো গুণাংশ থেকে উৎপন্ন, বায়ু থেকে ভিন্ন এবং বায়ুস্বভাবসম্পন্ন বলা হয় ॥৭৮॥

অপানঃ নাম-অবাগ্‌গমনবান্ পায়ু-আদিস্থানবর্তী ॥৭৯॥

অপান অধোদিকে গমনশীল বায়ু, পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্তী ॥৭৯॥

ব্যানঃ নাম বিষ্বগ্‌গমন-বান্ অখিল-শরীরবর্তী ॥৮০॥

সমস্ত শরীরবর্তী যে-বায়ু সর্বদিকে গমন করে তার নাম ব্যান।

অমৃত টীকা ঃ বিষ্বক্ শব্দের অর্থ চারধারে, সর্বত একই প্রাণ ॥৮০॥

উদানঃ নাম কণ্ঠস্থানীয়ঃ উর্দ্ধ-গমনবান্ উৎক্রমণ-বায়ুঃ ।।৮১ ।।

কণ্ঠবর্তী উর্ধ্বগমনশীল উৎক্রমণ [মৃত্যুকালে যে-বায়ুর সাহায্যে জীব দেহত্যাগ করে, সেই] বায়ুকে উদানবায়ু বলে ।।৮১ ।।

সমানঃ নাম—শরীরমধ্যগত-অশিত-পীত-অন্নাদি সমীকরণ-করঃ ।।৮২ ।।

শরীরমধ্যবর্তী খাদ্যপানাদি বস্তুর সমীকরণকারী বায়ুকে সমান বলে ।।৮২ ।।

সমীকরণং তু পরিপাক-করণং রস-রুধির-শুক্র-পুরীষাদি-করণম্ ইতি-যাবৎ।।৮৩ ।।

সমীকরণ মানে পরিপাককরণ; খাদ্যকে রস রক্ত শুক্র বিষ্ঠা প্রভৃতিতে পরিণত করাই সমীকরণ ।।৮৩ ।।

সাংখ্যমতে অন্য পঞ্চবায়ু

কেচিৎ তু নাগ-কূর্ম-কৃকর-দেবদত্ত-ধনঞ্জয়াখ্যাঃ পঞ্চ-অন্যে বায়বঃ সন্তীতি আহুঃ ।।৮৪ ।।

কেহ কেহ (কপিল মতানুসারী) বলেন যে, নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামক আরও পাঁচ প্রকার বায়ু আছে ।।৮৪ ।।

তত্র নাগঃ উদ্গিরণকরঃ কূর্ম উন্মীলনকরঃ, কৃকরঃ ক্ষুধাকরঃ, দেবদত্তঃ জৃম্ভণকরঃ, ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ ।।৮৫ ।।

তার মধ্যে নাগ বায়ুর কাজ উদ্গীরণ। কূর্মের কাজ উন্মীলন, অর্থাৎ চক্ষুরাদির বিকাশ ও সঙ্কোচনাদি। কৃকর বায়ুর কাজ ক্ষুধা, দেবদত্ত জৃম্ভণ (হাই) ও ধনঞ্জয় বায়ুর কার্য শরীরের পুষ্টি সাধন ।।৮৫ ।।

এতেষাং প্রাণাদিষু অন্তর্ভাবাৎ প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ এব ইতি কেচিৎ।।৮৬ ।।

আবার কেহ কেহ বলেন, এই নাগাদি পঞ্চবায়ু প্রাণাদি পঞ্চকের অন্তর্ভুক্ত বলে প্রাণাদি পাঁচটিই বায়ু ।।৮৬ ।।

অমৃত টীকা ঃ সাংখ্যমতে পঞ্চবায়ু পঞ্চপ্রাণের মধ্যে ধরা যায় কিভাবে তা বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকায় বলা হয়েছে। টীকাকার লিখেছেন, উদ্‌গীরণ হলো উর্ধ্বমুখ বায়ুর ক্রিয়া। উর্ধ্বমুখ বায়ু উদানে নাগ অনায়াসে অন্তর্ভূত হতে পারে। তা থেকে পৃথক নয়। সেরূপ উন্মীলন (নিমীলন) অঙ্গচেষ্টার অন্তর্গত তা সমগ্রশরীর সঞ্চারী ব্যান বায়ুর মধ্যে গৃহীত হয় বলে কূর্মকে ব্যানের মধ্যে ধরা যায়। সমান বায়ুর দ্বারা গৃহীত অন্নপানাদি রসাদিতে পরিণত করে সকল শরীরে সঞ্চালন করা হয় এবং তাতে ক্ষুধার উৎপত্তি হওয়ায় কৃকর বায়ুকে সমানের মধ্যে ধরা যায়। জৃম্ভণ নিদ্রা আলস্যাদির কারণ বলে, নিদ্রালস্যাদিও অন্নগ্রহণ নিমিত্ত হয়ে থাকে। অপানবায়ুর দ্বারাই তা নিম্নে যায়, এরূপ পরম্পরাক্রমে জৃম্ভণের হেতু দেবদত্তকে অপানের মধ্যে ধরা যায়। অপানের দ্বারা অন্ন স্বীকরণের কথা ঐতরেয়কে বলা হয়েছে ঃ তদপানেনাজিঘৃক্ষত্তদাবয়ৎ। [ঐঃ উঃ ৩।১০] সমান বায়ুতে রসরক্ত মাংসাদি ক্রমে শরীরের পুষ্টিসাধন হয় বলে পোষণকর ধনঞ্জয়কে সমানের মধ্যে ফেলা যায়। এভাবে প্রাণাদি পঞ্চকের দ্বারাই শরীরের সর্ববিধ চেষ্টার ব্যাখ্যা হয়ে যায় বলে আরো পাঁচটি বায়ুস্বীকারের প্রয়োজন হয় না। এতে গৌরবদোষ হয় মাত্র। তাছাড়া বেদে পঞ্চপ্রাণের কথাই আছে। নাগাদি পঞ্চকের কথা না থাকায় তা অপ্রামাণিক। প্রাণ প্রভৃতিও একটি মুখ্য প্রাণের বৃত্তিভেদ মাত্র; পাঁচ ভিন্ন তত্ত্ব নয়। এ বিষয়ে প্রমাণ হলো—"প্রাণোঽপানো ব্যান উদানঃ সমানোঽনঃ" [বৃহঃ ১।৫।৩]—নিরুপসর্গ অনঃ শব্দবাচ্য বৃত্তিযুক্ত প্রাণের পৃথকভাবে নির্দেশ হেতু বোঝা যায়, প্রাণশক্তি একটিই—প্রাণাদি পাঁচটি তারই বৃত্তিভেদ।।৮৬।।

প্রাণপঞ্চকের উৎপত্তি

এতৎ প্রাণাদিপঞ্চকম্ আকাশাদিগত-রজঃঅংশেভ্যঃ মিলিতেভ্যঃ উৎপদ্যতে।।৮৭।।

এই প্রাণাদি পাঁচটি আকাশাদি পঞ্চভূতের মিলিত রজঃ অংশ থেকে উৎপন্ন।।৮৭।।

অমৃত টীকা ঃ বেদান্তসার গ্রন্থের শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের মতে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের মিলিত রজঃ অংশ থেকে প্রাণের উৎপত্তি। এ বিষয়ে আলোচনা আগেই করা হয়েছে।।৮৭।।

প্রাণময় কোশ

ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সৎ প্রাণময়কোশঃ ভবতি। অস্য ক্রিয়াত্মকত্বেন রজঃ অংশকার্যত্বম্।।৮৮।।

এই প্রাণাদি পঞ্চক কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রাণময়কোশ হয়। এই প্রাণময়কোশ ক্রিয়াত্মক বলে রজঃ অংশের কার্য।।৮৮।।

অমৃত টীকা : পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও পাঁচটি প্রাণ মিলিতভাবে প্রাণপ্রধান বলে প্রাণময় এবং কোশের মতন আত্মাকে ঢেকে রাখে বলে কোশ, প্রাণময় কোশ। প্রাণময়কোশের দ্বারাই জীব সকল কার্য করে থাকে।।৮৮।।

কোশভেদে জীবের অবস্থাভেদ ও সূক্ষ্ম শরীর

এতেষু কোশেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়ঃ জ্ঞানশক্তিমান্ কর্তৃরূপঃ মনোময়ঃ ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপঃ, প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্যরূপঃ, যোগ্যত্বাৎ এবম্ এতেষাং বিভাগ ইতি বর্ণয়ন্তি। এতৎ কোশত্রয়ং মিলিতং সৎ সূক্ষ্মশরীরম্ ইতি উচ্যতে।।৮৯।।

এই কোশসকলের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোশটি জ্ঞানশক্তিসম্পন্ন বলে কর্তৃরূপ, মনোময়কোশটি ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন বলে করণরূপ এবং প্রাণময়কোশ ক্রিয়াশক্তিমান বলে কার্যরূপ। যোগ্যতাবশত এরূপ বিভাগ [বিবেকিগণ] বর্ণনা করে থাকেন। এই তিনটি কোশ [বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়] মিলিত হয়ে সূক্ষ্মশরীর নামে কথিত হয়।।৮৯।।

অমৃত টীকা : বিজ্ঞান বলতে বুদ্ধি। বুদ্ধি আত্মার অত্যন্ত কাছে বলে এবং সত্ত্বগুণময় বলে বুদ্ধিতেই স্বয়ংজ্যোতি আত্মা (পুরুষ), উপহিত হন এবং তিনিই ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে অবস্থিত।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—'যো অয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ' [৪।৩।৭]— এই বুদ্ধির অভ্যন্তরস্থ স্বয়ংজ্যোতিপুরুষের প্রভাবে বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞান করে।

আবার 'কামঃ সঙ্কল্পঃ বিচিকিৎসা' [বৃহঃ ১।৫।৩] ইত্যাদি শ্রুতি কামপর্যায় শব্দ, ইচ্ছারূপ মনোবৃত্তির পোষক বলে ইচ্ছাশক্তিমান মন ও কর্মেন্দ্রিয় মিলিতভাবে হয় মনোময় কোশ। এতে জীব জ্ঞানানুসারে কামনা করে, সঙ্কল্প করে, সংশয় করে। ইচ্ছা থেকেই কর্মের প্রবৃত্তি হয়, তাই মন ইচ্ছার করণরূপ।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ঃ 'স যথা প্রয়োগ্য আচরণে যুক্ত এবমেবায়মস্মিন্ শরীরে প্রাণো যুক্তঃ'—যেমন অশ্বে রথ সংযুক্ত হয়, তেমনি প্রাণও এই দেহে যুক্ত হয় (জীবের কর্মফল ভোগ করার জন্য) ইত্যাদি শ্রুতিবলে প্রাণকে ক্রিয়াশক্তিযুক্ত বলা হয়। প্রাণ ও কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা জীব এই শরীরে কর্মফল অনুসারে কর্মাদি সম্পন্ন করে ভোগ করে। এভাবে কোশত্রয়ের যোগ্যতা অনুসারেই কর্তৃকরণকার্যরূপ বিভাগ মনীষিগণ করেছেন। কোশ তিনটির অবয়ব সাকল্যে সতের। চিত্ত ও অহংকারকে আলাদা করে ধরলে উনিশটি হয়। এই সূক্ষ্মশরীরই মৃত্যুকালে স্থূলশরীর থেকে বাইরে যায় ও স্বর্গ-নরকাদি লোক ভোগ করে ও পুনরায় কর্মবশে স্থূলদেহ ধারণ করে। এই-ই জীব। যতদিন না বাসনা ক্ষয় ও আত্মবোধ হয় ততকাল সূক্ষ্মশরীর থাকে। কর্মবশে স্থূল দেহ ধারণ করে বার বার জন্মমৃত্যুর কবলে পড়ে।।৮৯।।

সূক্ষ্মশরীরের ব্যষ্টি সমষ্টি রূপভেদ

অত্র অপি অখিলসূক্ষ্মশরীরম্ একবুদ্ধিবিষয়তয়া বনবৎ জলাশয়বৎ বা সমষ্টিঃ। অনেক বুদ্ধিবিষয়তয়া বৃক্ষবৎ জলবৎ বা ব্যষ্টিঃ চ ভবতি।।৯০।।

এখানেও সকল সূক্ষ্মশরীর এক বুদ্ধির বিষয় হয়ে বন বা জলাশয়ের মতো সমষ্টি, আর অনেক বুদ্ধির বিষয় হয়ে বৃক্ষের মতো বা জলের মতো ব্যষ্টি হয়ে থাকে।।৯০।।

অমৃত টীকা ঃ উপরের কথাটিতে এরূপ বোধ হয় যে, চরাচর বিশ্বের সকল সূক্ষ্মশরীর মিলিয়ে এক করলেই সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর হয়, যাঁকে শাস্ত্রে সূত্রাত্মা, প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ, বায়ু বা ব্রহ্মা বলেছেন। বস্তুত তা নয়। যদিও মূলে উপমার ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে—বৃক্ষের সমষ্টি বন যেমন এক বৃক্ষসমষ্টি, তদ্রূপ

সূক্ষ্মশরীর সকল একবুদ্ধির বিষয় করে নিয়ে সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ। এরূপ চিন্তা করা ভিন্ন অন্য কোন উপাধি নেই বলেও অখিলসূক্ষ্মশরীরের সমষ্টিই হন হিরণ্যগর্ভ। এরূপ ভাবনায় যুক্তিবাধ ও শাস্ত্রবাধ হয়। যুক্তিবাধ হয় এই ভাবে যে, কারণের সবটাই কার্যরূপ ধারণ করে না। কারণ সর্বদাই কার্য অপেক্ষা অধিক ব্যাপক হয়ে থাকে। পৃথিবীর সকল মৃত্তিকাই ঘট হয় না, ঘটরূপ ছাড়াও অধিক মৃত্তিকা থাকে। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতকে যিনি নিজ শরীর বলে অভিমান করেন তিনিই ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ। এই অপঞ্চীকৃত ভূতসূক্ষ্ম থেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী ব্যষ্টিই অনন্ত সংখ্যক জীবদেহ। সুতরাং জীব সমুদায়ই হিরণ্যগর্ভ হয় না, আরো ব্যাপকরূপই হিরণ্যগর্ভ। শাস্ত্রও 'জ্ঞানম্ অপ্রতিহতং যস্য' ইত্যাদি বলে হিরণ্যগর্ভকে সর্বজ্ঞ, অপহতপাপ্মা ইত্যাদি বলে নির্দেশ করেছেন এবং তাঁকে প্রভূতপুণ্যশালী 'প্রথম জীব' বলে উল্লেখ করেছেন। ইনি তাই ব্যষ্টি জীবসকল থেকে ভিন্ন। আরো কথা, সমষ্টির ব্যষ্টিত্বই যদি আমাদের মতো জীব হয় তবে, সমষ্টির সর্বজ্ঞত্বাদি গুণ আমাদেরও থাকত। কারণগুণ ব্যষ্টিকার্যে অনুস্যূত হবেই। এজন্য লিঙ্গশরীর সমুদয়ই সমষ্টি নয়, কিন্তু ব্যষ্টি লিঙ্গশরীর ব্যাপক যে লিঙ্গ-শরীর তাকে সমষ্টি শব্দে এখানে বলা হয়েছে। ইনি আধিকারিক জীবই, ঈশ্বর নন। কারণ তিনি উৎপন্ন হয়েছিলেন এবং উৎপন্ন হবার পরই 'সোঽবিভেৎ'—ভয় পেয়েছিলেন; ঈশ্বর অভয়। সুতরাং ব্যাপক লিঙ্গ শরীরাভিমানী জীবই হিরণ্যগর্ভ, যিনি আমাদের সকল লিঙ্গশরীরব্যাপক সূক্ষ্ম শরীরাভিমানী এক। ব্যষ্টি শব্দে এখানে সীমিত লিঙ্গ শরীর সকলকে বোঝানো হয়েছে, সমষ্টি শব্দে ব্যষ্টিব্যাপক স্বতন্ত্র এক প্রথমশরীরী জীবকে বলা হয়েছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির অভেদ বলা হয়নি। অভেদ হলে হিরণ্যগর্ভের সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম ব্যষ্টিতেও অনুবর্তন করত। 'সূত্রাত্মা' এই সংজ্ঞার যুক্তি হলো, তিনি সর্বত্র অনুস্যূত। 'বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণ অয়ং চ লোকঃ, পরশ্চ লোকঃ সর্বাণি ভূতানি সংদৃব্ধানি'—এভাবে তিনি সূত্রাত্মা; তাঁর সর্বজ্ঞত্ব বোঝাতেই তাঁকে 'হিরণ্যগর্ভ', ক্রিয়াশীলত্ব বোঝাতে 'প্রাণ' বলে শাস্ত্রে উল্লেখ করেছেন। এভাবেই সূক্ষ্মশরীরের একত্ব ও বহুত্ব শাস্ত্রে বলা হয়েছে। যেমন বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে 'বায়ুরেব ব্যষ্টির্বায়ুঃ সমষ্টিঃ' [৩।৩।২] ॥৯০॥

হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ ও তার নামভেদ

এতৎসমষ্টি-উপহিতং চৈতন্যং সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ প্রাণঃ ইতি চ উচ্যতে। সর্বত্র অনুস্যূতত্বাৎ, জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমৎ অপঞ্চীকৃত-পঞ্চমহাভূত-অভিমানিত্বাৎ চ।।৯১।।

এই সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর উপহিত চৈতন্যকে সর্বত্র অনুস্যূত বলে সূত্রাত্মা; জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া-শক্তি-যুক্ত অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতে অভিমানী বলে হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ বলা হয়।।৯১।।

অমৃত টীকা ঃ এ বিষয়ে ৯০ নং এর টীকায় সামান্যভাবে বলা হয়েছে। সমষ্টি লিঙ্গ শরীরাভিমানী চৈতন্যের বিশেষণ তিনটি ঃ (১) সর্বত্র অনুস্যূত (সম্বন্ধযুক্ত) বলে সূত্রাত্মা। (২) জ্ঞানশক্তি যুক্ত অন্তঃকরণোপহিত চৈতন্য বলে হিরণ্যগর্ভ। (৩) ক্রিয়াশক্তিমান অধিদৈবত প্রাণরূপ বলে 'প্রাণ' সংজ্ঞায় নির্দেশ করা হয়েছে। এবিষয়ে শ্রুতিবাক্য সকল—

'বায়ুর্বৈ গৌতম তৎসূত্রং সূত্রেণ [বৃঃ উঃ ৩।৭।২] ইতি
'হিরণ্যগর্ভঃসমবর্ত্ততাগ্রে' [ঋগ্বেদ ১০।১২১।১] ইতি
'হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্বম্' [শ্বেঃ উঃ ৩।৪] ইতি

'প্রাণ ইতি চ উচ্যতে'—ইতি। এখানে চ শব্দে প্রজাপতি, ক, ব্রহ্মা এই সকল মামকে বোঝানো হয়েছে।।৯১।।

অস্য এষা সমষ্টিঃ স্থূল-প্রপঞ্চাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মশরীরং, বিজ্ঞানময়াদি কোশত্রয়ং, জাগ্রদ্‌বাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নঃ, অতএব স্থূল-প্রপঞ্চলয়স্থানম্ ইতি চ উচ্যতে।।৯২।।

হিরণ্যগর্ভের এই সমষ্টি (সূক্ষ্মশরীর) স্থূল প্রপঞ্চ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলে সূক্ষ্মশরীর, বিজ্ঞানময়াদি তিনটি কোশযুক্ত ও জাগ্রৎকালীন বাসনাময় বলে স্বপ্ন। অতএব স্থূল জগতের লয় স্থান বলা হয়।।৯২।।

অমৃত টীকা ঃ এভাবে সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর-উপহিত চৈতন্যকে বলে এখন উপাধির কথা বলছেন। স্থূল প্রপঞ্চকে বিরাট বলে। পরে এ-বিষয়ে বলা হবে। বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় এই তিন কোশকে বলে লিঙ্গ বা সূক্ষ্মশরীর। ইনি বাসনাময়। বাসনাময়ত্বের প্রমাণ ঃ

'তস্য হৈতস্য পুরুষস্য রূপং যথা মাহারজনং বাসো যথা পাণ্ডাবিকম্' [বৃঃ উঃ ২।৩।৬]। ইনি অব্যাকৃত প্রকৃতি ও বিরাটের (স্থূল শরীরের) সন্ধিস্থান— 'সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানম্' বলে [বৃঃ ৪।৩।৯] বলা হয়েছে। আমাদের স্বপ্নকালে যেমন স্থূলশরীরের লয় হয়—তেমনি এখানে হিরণ্যগর্ভে স্থূল বিরাটের লয় হয়। সমষ্টি স্থূল শরীরের লয় স্থান বলেও হিরণ্যগর্ভকে বলা হয়।।৯২।।

তৈজসের স্বরূপ

এতৎ ব্যষ্টি-উপহিতং চৈতন্যং তৈজসো ভবতি, তেজোময়-অন্তঃকরণ-উপহিতত্বাৎ।।৯৩।।

এই ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর উপহিত চৈতন্যকে তৈজস বলে, যেহেতু তৈজস তেজোময় অন্তঃকরণরূপ উপাধির দ্বারা উপহিত।।৯৩।।

অমৃত টীকা : ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরের তিনটি কোশ। বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময়, এর মধ্যে বিজ্ঞানময় কোশ বুদ্ধি ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের দ্বারা গঠিত। বুদ্ধিতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হওয়ায় তা তেজোময়—এই তেজোময় অন্তঃকরণ উপহিত চৈতন্য জীব। একে পারিভাষিকভাবে বলা হলো তৈজস।।৯৩।।

তৈজস শরীরের নামভেদ

অস্য অপি ইয়ং ব্যষ্টিঃ স্থূলশরীর-অপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মশরীরম্, বিজ্ঞানময়াদি কোশত্রয়ং। জাগ্রৎ-বাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নঃ। অতএব স্থূলশরীর-লয়স্থানম্ ইতি চ উচ্যতে।।৯৪।।

এই তৈজসেরও [ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর] স্থূলশরীর অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলে সূক্ষ্মশরীর, বিজ্ঞানময়াদি তিনটি কোশযুক্ত, জাগ্রদ্‌বাসনাময় বলে স্বপ্ন। অতএব স্থূলশরীরের লয়স্থানও বলা হয়।।৯৪।।

অমৃত টীকা : আমাদের স্থূলশরীরের ভিতরে এই তিনটি কোশ। বিজ্ঞানময় কর্তৃরূপ, মনোময় ইচ্ছারূপ, প্রাণময় ক্রিয়ারূপ। এই সূক্ষ্মশরীরের দ্বারাই আমরা কর্ম করি, ভোগ করি, কর্তৃত্ব করি। নিদ্রাকালে জগতের সকল লয় হয় বলে স্থূলশরীরের লয়স্থান বলা হলো। একে স্বপ্নস্থানও বলা যায়।।৯৪।।

হিরণ্যগর্ভ ও তৈজসের ভোগ

এতৌ সূত্রাত্মতৈজসৌ তদানীং সূক্ষ্মাভিঃ মনোবৃত্তিভিঃ সূক্ষ্মবিষয়ান্ অনুভবতঃ। 'প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসঃ' [মাঃ উঃ ৩] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ ।।৯৫।।**

তখন (স্বপ্নকালে) এই সূত্রাত্মা (হিরণ্যগর্ভ) এবং তৈজস (জীব) সূক্ষ্মমনোবৃত্তি সকলের দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় অনুভব করেন। 'তৈজস সূক্ষ্ম বিষয় ভোগ করেন'—ইত্যাদি শ্রুতিতে উক্ত হয়েছে।।৯৫।।

অমৃত টীকা ঃ সূক্ষ্মশরীরে মনোবৃত্তিমাত্র ভোগ। স্থূলের লয়স্থান বলে সূক্ষ্মশরীরে স্থূলভোগ নেই। মানুষ যে অন্নময় শরীরে স্থূল বিষয় গ্রহণ করে, সেরূপ গ্রহণ সূক্ষ্মশরীরে অসম্ভব। স্থূল বিষয় ভোগও অন্নময়ে স্থূলগ্রহণ মাত্র হয়—ভোগ সূক্ষ্মশরীরেই সম্ভব। সুখ দুঃখের অনুভব অজ্ঞানবৃত্তিতেই মাত্র হতে পারে। সমষ্টি সূক্ষ্মশরীরে হিরণ্যগর্ভেও এই সূক্ষ্মভোগই হয়।

স্বপ্নাবস্থায় নিদ্রাদিদোষ দুষিতের অদৃষ্টাদি থেকে উদ্ভূত সংস্কারবিশেষযুক্ত অন্তঃকরণ সংসৃষ্টচৈতন্যস্থিত অবিদ্যাশক্তি অন্তঃকরণের সংস্কারের অনুরূপ বিষয়াকারে পরিণত হয়—এই বৃত্তিসমূহ জাগ্রদ্বাসনাময় হয়ে অস্ফুটভাবে বোধ হয়। এইভাবেই সূক্ষ্মবিষয় ভোগ হয়ে থাকে। একে স্মৃতি বলা যায় না, কারণ তা অপরোক্ষ অনুভব। ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপারযুক্ত নয় বলে একে প্রত্যক্ষ বলা যায় না। আবার সুষুপ্তিও নয়, কারণ বিষয়ের স্পষ্ট অনুভব হয়। জাগরিত অবস্থাও নয়, কারণ জাগরণকালীন দেশকাল নিমিত্তের অসম্ভাবনা সে-অবস্থায় থাকে। একথাই বলা হয়েছে, 'যথা কেশঃ সহস্রধা ভিন্নঃ' [বৃঃ উঃ ৪।২।৩] সহস্রধা বিভক্ত কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম নাড়ী মধ্যে সঞ্চারিত অন্নরসকে ভোগ করেন বলে তিনি আরো সূক্ষ্মতর। স্বপ্নদর্শনকালে তিনি যেন এ-সকল অতিসূক্ষ্মনাড়ীতে প্রবেশ করেন, নদীসাগর বনগিরি শোভিত দেশ সেখানে না থাকলেও, সেই নাড়ীর মধ্যে থেকে সে-সকল দেখেন। জাগ্রৎ কালীন বস্তুসকলের অভাব স্বপ্নে থাকলেও নূতন বাসনাত্মক বস্তুসকল নির্মাণ করে ভোগ করেন। এভাবে সূক্ষ্মশরীরকে প্রবিবিক্তভুক্ বলা হয়।।৯৫।।

তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের সম্বন্ধ

অত্রাপি সমষ্টিব্যষ্ট্যোঃ তদুপহিত-সূত্রাত্মা-তৈজসয়োঃ চ বনবৃক্ষবৎ তদ্ অবচ্ছিন্ন-আকাশবৎ চ জলাশয়জলবৎ তদ্গতপ্রতিবিম্ব-আকাশবৎ চ অভেদঃ।।৯৬।।

এস্থলেও বন ও বৃক্ষ অথবা জল ও জলাশয় যেমন অভিন্ন সেরূপ সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর ও ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর অভিন্ন। তদ্রূপ বন-অবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষ-অবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন অভিন্ন, অথবা জল-প্রতিবিম্বিত ও জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত আকাশ যেমন অভিন্ন, সেরূপ সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর-উপহিত চৈতন্য সূত্রাত্মা এবং ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর উপহিত চৈতন্য অভেদ।।৯৬।।

অমৃত টীকা : অভেদ শব্দটি পূর্বের মতো ব্যাখ্যা করতে হবে। সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর সকলের ব্যাপক হয়ে এক হলেও, ব্যাপক সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর হিরণ্যগর্ভ জীব থেকে ভিন্ন। সব গ্রথিত করেও বিশাল ব্যাপক এক।।৯৬।।

এবং সূক্ষ্মশরীরোৎপত্তিঃ।।৯৭।।

এইভাবে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি বলা হলো।।৯৭।।

স্থূলভূতের উৎপত্তি

স্থূলভূতানি তু পঞ্চীকৃতানি।।৯৮।।

স্থূলভূতগুলি পঞ্চীকৃত।।৯৮।।

পঞ্চীকরণং তু আকাশাদি পঞ্চসু একৈকং দ্বিধা সমং-বিভজ্য, তেষু দশসু ভাগেষু মধ্যে প্রাথমিকান্ পঞ্চভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্ধা সমং বিভজ্য, তেষাং চতুর্ণাং ভাগানাং স্ব-স্ব-দ্বিতীয়ার্ধ-ভাগং পরিত্যজ্য ভাগান্তরেষু সংযোজনং।।৯৯।।

আকাশ প্রভৃতি পাঁচটি ভূতের এক একটিকে সমান দুইভাগে ভাগ করে সেই দশভাগের মধ্যে প্রথম পাঁচভাগের প্রত্যেককে সমান চার ভাগে ভাগ করে সেই ভাগকে নিজ নিজ দ্বিতীয় অর্ধভাগ ব্যতিরেকে অন্যান্য ভাগসমূহে সংযোজন করাই পঞ্চীকরণ নামে অভিহিত হয়।।৯৯।।

তদুক্তং—দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে। ইতি [পঞ্চদশী ১/২৭] ॥১০০॥

সে-কথা বলা হয়েছে—"এক একটিকে দুভাগে ভাগ করে, প্রথম ভাগগুলিকে চার ভাগে ভাগ করে, পুনরায় সেই চারভাগকে নিজে নিজের থেকে ভিন্ন দ্বিতীয় ভাগে যোজনা করলে তারা পাঁচ পাঁচটি হয় অর্থাৎ প্রত্যেক ভূত পঞ্চাত্মক হয়" ॥১০০॥

অমৃত টীকা ঃ এভাবে পড়ে পঞ্চীকরণের ধারণা করা কষ্টকর। নিম্নের ছক সাহায্য করবে। প্রথমে পঞ্চভূতকে দুইটি সমান ভাগে ভাগ করা গেল। এবং দ্বিতীয় ভাগকে চার ভাগে ভাগ করলে দাঁড়াবে—

আকাশ $\frac{১}{২} + \left(\frac{১}{২} \div ৪\right)$ জল $\frac{১}{২} + \left(\frac{১}{২} \div ৪\right)$

বায়ু $\frac{১}{২} + \left(\frac{১}{২} \div ৪\right)$ ক্ষিতি $\frac{১}{২} + \left(\frac{১}{২} \div ৪\right)$

তেজ $\frac{১}{২} + \left(\frac{১}{২} \div ৪\right)$

এখন আকাশের অর্ধাংশের সঙ্গে অন্য চারটি ভূতের $\frac{১}{৮}$ মিলিত করতে হবে। যেমন ঃ

আকাশ $\frac{১}{২}$ + $\frac{১}{৮}$ বায়ু + $\frac{১}{৮}$ তেজ + $\frac{১}{৮}$ জল + $\frac{১}{৮}$ ক্ষিতি = স্থূল আকাশ।

তদ্রূপ—

বায়ু $\frac{১}{২}$ + $\frac{১}{৮}$ আকাশ + $\frac{১}{৮}$ তেজ + $\frac{১}{৮}$ জল + $\frac{১}{৮}$ ক্ষিতি = স্থূল বায়ু।

এইরূপ ক্রমে দাঁড়াবে—

পঞ্চীকরণ

অপঞ্চীকৃত মহাভূতের পরিমাণ=					উৎপন্ন পঞ্চীকৃত পঞ্চস্থূল ভূত
আকাশ	বায়ু	তেজ	জল	ক্ষিতি	
(১/২) +	১/৮ +	১/৮ +	১/৮ +	১/৮	আকাশ (ব্যোম)
১/৮ +	(১/২) +	১/৮ +	১/৮ +	১/৮	বায়ু (মরুৎ)
১/৮ +	১/৮ +	(১/২) +	১/৮ +	১/৮	তেজ
১/৮ +	১/৮ +	১/৮ +	(১/২) +	১/৮	অপ্
১/৮ +	১/৮ +	১/৮ +	১/৮ +	(১/২)	ক্ষিতি

পঞ্চীকরণ বিষয়ে প্রমাণ

অস্য অপ্রামাণ্যং ন আশঙ্কনীয়ং, ত্রিবৃৎকরণ-শ্রুতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপি উপলক্ষণার্থত্বাৎ॥১০১॥

এই পঞ্চীকরণের প্রামাণ্য নেই—এরূপ আশঙ্কা করবে না। যেহেতু ত্রিবৃৎকরণশ্রুতি পঞ্চীকরণেরও উপলক্ষণ॥১০১॥

অমৃত টীকা ঃ ভাব হলো এই ঃ শ্রুতিতে তেজ অপ্ ও অন্ন এই তিন ভূতের ত্রিবৃৎকরণ বলা হয়েছে। ত্রিবৃৎকরণ হলো তিনটি ভূতকে সমান দুভাগে ভাগ করে, প্রত্যেকের দ্বিতীয়ভাগকে সমান দুভাগে ভাগ করে নিজ নিজ প্রথমাংশ বাদ দিয়ে অপর ভূতের প্রথম অর্ধাংশের সঙ্গে যোজনা। যেমন ঃ—

তেজ $\frac{১}{২}$ + অপ্ $\frac{১}{৪}$ + অন্ন $\frac{১}{৪}$ = স্থূল তেজ

অপ্ $\frac{১}{২}$ + তেজ $\frac{১}{৪}$ + অন্ন $\frac{১}{৪}$ = স্থূল অপ্

অন্ন $\frac{১}{২}$ + তেজ $\frac{১}{৪}$ + অপ্ $\frac{১}{৪}$ = স্থূল অন্ন

এভাবে যে ত্রিবৃৎকরণ তা পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ। পাঁচটি ভূতোৎপত্তি শ্রুতিতে স্পষ্ট উক্ত হওয়ায় এভাবে শ্রুতিদ্বয়ের সামঞ্জস্য করা হয়েছে। শ্রুতিদুটি এই ঃ

'তাসাম্ একৈকাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতং করবাণি' [ছাঃ উঃ ৬/৩/২] ও 'আত্মা আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদি (তৈঃ) আকাশ ও বায়ুকে তেজ প্রভৃতির অন্তর্ভুক্ত সিদ্ধবৎ ধরে নিয়ে ত্রিবৃৎকরণ করা হয়েছে।।১০১।।

পঞ্চীকৃত স্থূলভূত বৈশিষ্ট্য নির্ণয়

পঞ্চানাং পঞ্চাত্মকত্বে সমানে-অপি তেষু চ "বৈশেষ্যাৎ তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ" [ব্রঃ সূঃ ২/৪/২২] **ইতি ন্যায়েন আকাশাদি-ব্যপদেশঃ সম্ভবতি।।১০২।।**

পাঁচটি ভূতের প্রত্যেকের মধ্যে পঞ্চভূত সমভাব থাকলেও তাদের মধ্যে- 'বিশেষবশত [পৃথিবী তেজ আকাশ ইত্যাদির নাম] সেই সেই শব্দের ব্যবহার' এই যুক্তি (ব্রহ্মসূত্র) অনুসারে আকাশাদির নাম সম্ভব হয়।।১০২।।

অমৃত টীকা ঃ বিশেষবশত বলতে স্থূল আকাশাদিতে আকাশাদির অংশ বেশি থাকাতে তাকে সেই নামে বলা যায়, চেনা যায়। যেমন স্থূল আকাশে আকাশের অংশ ১/২ ভাগ। বাকি চারটি ভূতের ১/৮ অংশ থাকায় আকাশভূতকে চেনা যায়। এইভাবে অন্যান্য ভূতের বেলায়ও এরূপ বুঝতে হবে।।১০২।।

স্থূলভূতপঞ্চকের গুণ

তদানীম্ আকাশে শব্দঃ অভিব্যজ্যতে, বায়ৌ শব্দস্পর্শৌ, অগ্নৌ শব্দস্পর্শরূপাণি, জলে শব্দস্পর্শরূপরসাঃ পৃথিব্যাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চ।।১০৩।।

পঞ্চীকরণের পর আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দস্পর্শ, তেজে শব্দস্পর্শরূপ, জলে শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ অভিব্যক্ত হলো।।১০৩।।

অমৃত টীকা : আকাশ থেকে ক্রমান্বয়ে চারটি ভূতের উৎপত্তি হওয়ায় প্রতি কার্যভূতে কারণগুণ সংক্রামিত হয় ও উত্তরোত্তর ভূতে পূর্ব পূর্ব কারণগুণ সহ স্বকীয় গুণ যুক্ত হয়েছে। যেমন বায়ুতে প্রবাহকালে সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যায় এবং বায়ুর স্পর্শ অনুভূত হয়। তেজে—অগ্নি প্রজ্বলিত হলে, ভূগু ভূগু ধ্বনি ওঠে, তার উষ্ণ স্পর্শ হয় ও রূপ দেখা যায়। জলে প্রবাহকালে কলকল ধ্বনি, শীতল স্পর্শ, স্বচ্ছবর্ণ ও রস অনুভূত হয়। পৃথিবীতে আঘাত করলে শব্দ, কঠিনস্পর্শ, নানাবর্ণ, রস ও গন্ধ অনুভব করা যায়। সুতরাং ভূত সকলের এরূপ গুণ কাল্পনিক নয়, বাস্তব সত্য।।১০৩।।

ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি

এতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ ভূর্ভুবঃ স্বর্মহর্জন-স্তপঃসত্যম্ ইতি এতৎ নামকানাং উপরি উপরি বিদ্যমানানাম্ অতল-বিতল-সুতল-রসাতল-তলাতল-মহাতল-পাতাল-নামকানাম্ অধঃঅধঃ বিদ্যমানানাং লোকানাং ব্রহ্মাণ্ডস্য তদ্ অন্তর্গত-চতুর্বিধ-স্থূলশরীরাণাম্ অন্নপানাদীনাং চ উৎপত্তিঃ ভবতি।।১০৪।।

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত থেকে উপরে উপরে অবস্থিত (সপ্তস্বর্গ) ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ ও সত্য নামক লোকসমূহ এবং নিচে নিচে (ক্রমশ) বিদ্যমান অতল বিতল সুতল রসাতল তলাতল মহাতল ও পাতাল নামক (সপ্ত) লোকসমূহের, ব্রহ্মাণ্ডের ও ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চার রকমের স্থূলশরীর ও (তাদের

উপযোগী) অন্ন-পানাদির-উৎপত্তি হলো ।।১০৪ ।।

অমৃত টীকা ঃ এই চতুর্দশ ভুবন চার রকমের প্রাণী শরীর ও তাদের ভোগ্য অন্নপানাদির সমষ্টিকে ব্রহ্মাণ্ড বলে। লক্ষ্য করার বিষয়, নরকের কথা নেই। পাতাল নরক নয়। অথচ সাতটি নরকের কথা পুরাণাদিতে রয়েছে।।১০৪ ।।

চার প্রকার স্থূল শরীরের বর্ণনা

চতুর্বিধস্থূলশরীরাণি জরায়ুজ - অণ্ডজ - স্বেদজ - উদ্ভিজ্জ -আখ্যানি ।।১০৫ ।।

জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চার প্রকার স্থূল শরীর আছে ।।১০৫ ।।

অমৃত টীকা ঃ এই চার প্রকার শরীর ভিন্ন পাঁচ প্রকারের শরীর এই পৃথিবী লোকে নেই। অন্য লোকে আছে।।১০৫ ।।

জরায়ুজানি-জরায়ুভ্যো জাতানি মনুষ্যপশ্বাদীনি ।।১০৬ ।।

জরায়ু থেকে জাত শরীরকে জরায়ুজ বলে। যেমন মানুষ, পশু প্রভৃতি ।।১০৬ ।।

অণ্ডজানি, অণ্ডেভ্যঃ জাতানি পক্ষিপন্নগাদীনি ।।১০৭ ।।

ডিম্ব থেকে জাত শরীরকে অণ্ডজ বলে, যেমন পাখি, সাপ ইত্যাদি ।।১০৭ ।।

স্বেদজানি, স্বেদেভ্যঃ জাতানি যূক-মশকাদীনি ।।১০৮ ।।

স্বেদ অর্থে ঘাম বা স্যাত্স্যাতে জলীয় অবস্থা থেকে জাত যেমন উকুন, মশা ইত্যাদি ।।১০৮ ।।

উদ্ভিজ্জানি, ভূমিম্ উদ্ভিদ্য জাতানি লতাবৃক্ষাদীনি ।।১০৯ ।।

উদ্ভিজ্জ যেমন লতা বৃক্ষাদি, যা ভূমি ভেদ করে ওঠে ।।১০৯ ।।

স্থূলশরীরের ব্যষ্টি সমষ্টি ভেদ

অত্রাপি চতুর্বিধ-স্থূল-শরীরম্ এক-অনেকবুদ্ধি-বিষয়তয়া বনবৎ-জলাশয়বৎ বা সমষ্টিঃ, বৃক্ষবৎ-জলবদ্ বা ব্যষ্টিঃ অপি ভবতি।।১১০ ।।

এখানেও বন বা জলাশয়ের মতো চার প্রকার স্থূলশরীর একবুদ্ধির বিষয় করে ধরলে হয় সমষ্টি এবং অনেক বলে ধরলে হয় ব্যষ্টি; বনের অনেক বুদ্ধির বিষয় (একক) যেমন গাছ, জলাশয়ের (অনেক) একক যেমন জল ৷৷১১০৷৷

এতৎ সমষ্টি-উপহিতং চৈতন্যং বৈশ্বানরো বিরাট্ ইতি চ উচ্যতে। সর্বনর-অভিমানিত্বাৎ বিবিধং রাজমানত্বাৎ চ৷৷১১১৷৷

এই সমষ্টি এক স্থূলশরীর উপহিত চৈতন্যকে বলে বৈশ্বানর বা বিরাট। সমস্ত চরাচর স্থূল প্রকৃতিকে নিজ দেহ বলে অভিমান করেন বলে বৈশ্বানর, এবং নানাভাবে (রূপে) বিরাজ করেন বলে ইনি বিরাট নামে কথিত হন ৷৷১১১৷৷

অমৃত টীকা ঃ মূলের ভাষাতে মনে হতে পারে, আমাদের স্থূলশরীর সম্মিলিত করলেই বুঝি বিরাট হয়। কিন্তু এ ঠিক নয়। শাস্ত্রে বিরাটকে ভিন্নরূপে বিশিষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যদি তা না হতো তো ব্যাপক স্থূলশরীর অভিমানী বিরাট সর্বজ্ঞ হওয়ায়, তা থেকে অভিন্ন আমাদের স্থূল শরীরে অভিমানবশত আমরাও সর্বজ্ঞ হতাম। সুতরাং সমষ্টি উপহিতত্বই বিরাট নন—এ থেকে স্বতন্ত্র। পরিচ্ছিন্ন চতুর্মুখ স্থূলশরীর উপহিত সত্যলোকাধিপতি সর্বজ্ঞ হিরণ্যগর্ভ থেকে শতগুণ অপকৃষ্ট আনন্দভুক্ জীব বিশেষই বিরাট, এমত বালবোধিনী টীকার রচয়িতা শ্রদ্ধেয় আপোদেবের। অন্নম্ বলতে পৃথিবী অর্থাৎ স্থূল ভূত। অন্নের বিকার বলতে স্থূলভূতের বিকার বোঝায়। বৈশ্বানরের রূপ ঃ তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুঃ বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্ বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুরু এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনঃ-অন্বাহার্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ। [ছাঃ ৫/১৮/২]

'দ্যুলোক উক্ত বৈশ্বানর আত্মার মস্তক, আদিত্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, আকাশ দেহস্কন্ধ, জল মূত্রাশয় ও পৃথিবী পাদদ্বয়, বক্ষঃস্থল বেদি, লোমসমূহ কুশ, হৃদয় গার্হপত্যাগ্নি, মন দক্ষিণাগ্নি ও মুখ আহবণীয় অগ্নি।' [ছাঃ ৫/১৮/২] এভাবে বিরাটের বর্ণনা করা হয়েছে।৷১১১৷৷

অস্য এষা সমষ্টিঃ স্থূলশরীরম্, অন্নবিকারত্বাৎ অন্ন-ময়কোশঃ স্থূল-ভোগায়তনত্বাৎ জাগ্রৎ ইতি চ উচ্যতে।৷১১২৷৷

এই যে বিরাটের স্থূলশরীর এটি অন্নের বিকার বলে অন্নময়কোশ এবং স্থূলভোগের আশ্রয় বলে জাগ্রত ৷৷১১২৷৷

ব্যষ্টি স্থূলশরীর বিশ্ব

এতদ্ব্যষ্টি-উপহিতং চৈতন্যং বিশ্ব ইতি উচ্যতে। সূক্ষ্ম-শরীরাভিমানম্ অপরিত্যজ্য, স্থূলশরীরাদি-প্রবিষ্টত্বাৎ॥১১৩॥

এই ব্যষ্টি [অর্থাৎ পৃথক পৃথক] স্থূলশরীরে উপহিত চৈতন্যকে বিশ্ব বলে। যেহেতু তিনি সূক্ষ্মশরীরে অভিমান ত্যাগ না করে স্থূলশরীর প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট॥১১৩॥

অস্য অপি এষা ব্যষ্টিঃ স্থূলশরীরং অন্নবিকারত্বাৎ অন্নময়কোশঃ, স্থূলভোগায়তনত্বাৎ জাগ্রৎ ইতি চ উচ্যতে॥১১৪॥

এই ব্যষ্টি স্থূলশরীরটি অন্নবিকার বলে অন্নময়কোশ, স্থূল ভোগের আশ্রয় বলে জাগ্রৎ নামে অভিহিত॥১১৪॥

ব্যষ্টি স্থূল অবস্থার বিশেষ বর্ণনা

তদানীম্ এতৌ বিশ্ব-বৈশ্বানরৌ দিগ্-বাত-অর্ক-প্রচেতঃ-অশ্বিভিঃক্রমাৎ নিয়ন্ত্রিতেন শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়পঞ্চকেন ক্রমাৎ শব্দ-স্পর্শরূপরসগন্ধান্ অগ্নি-ইন্দ্র-উপেন্দ্র-যম-প্রজাপতিভিঃ ক্রমাৎ নিয়ন্ত্রিতেন, বাগাদীন্দ্রিয়পঞ্চকেন ক্রমাৎ বচন-আদান-গমন-বিসর্গ-আনন্দান্, চন্দ্র-চতুর্মুখ-শঙ্কর-অচ্যুতৈঃ ক্রমাৎ নিয়ন্ত্রিতেন মনঃ-বুদ্ধি-অহঙ্কার-চিত্তাখ্যেন অন্তরিন্দ্রিয়-চতুষ্কেণ ক্রমাৎ সংশয়-নিশ্চয়-অহঙ্কার্য-চৈত্তাং চ সর্বান্ এতান্ স্থূলবিষয়ান্ অনুভবতঃ; "জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ" [মাঃ ৩] ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥১১৫॥

জাগ্রৎকালে এই বিশ্ব ও বৈশ্বানর দিক্, বায়ু, সূর্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার যুগলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ক্রমে ক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় — এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ; অগ্নি, ইন্দ্র উপেন্দ্র যম ও প্রজাপতি দ্বারা ক্রম অনুসারে নিয়ন্ত্রিত বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থের সহায়ে অর্থাৎ কর্মেন্দ্রিয় সহায়ে যথাক্রমে বচন গ্রহণ (আদান) গমন বিসর্গ [ত্যাগ] ও আনন্দ [এই সকল কর্ম করে থাকে]; চন্দ্র, চতুর্মুখ, শঙ্কর ও অচ্যুতের দ্বারা ক্রম অনুসারে মন বুদ্ধি অহঙ্কার ও চিত্ত নামক অন্তঃকরণ চারটি

দ্বারা যথাক্রমে সংশয় নিশ্চয় অহঙ্কার ও চৈত্ত অর্থাৎ সুখদুঃখাদি—এই সকল স্থূলবিষয় অনুভব করে। 'জাগরিত অবস্থায় বহির্বিষয়ে জ্ঞান হয়'—ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত আছে॥১১৫॥

অমৃত টীকা ঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চারটি নিজেরাই নিজ নিজ কর্ম করতে পারে না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের অধিপতি দেবতার নিয়ন্ত্রণাধীন থেকে ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ ব্যাপার করতে পারে। কোন্ ইন্দ্রিয়ের কোন্ দেবতা এবং কি তাদের কাজ তা নিম্নরূপ ঃ

	ইন্দ্রিয়	দেবতা	কাজ
জ্ঞানেন্দ্রিয়	শ্রোত্র	দিক্	শ্রবণ
	ত্বক্	বায়ু	স্পর্শন
	চক্ষু	আদিত্য	দর্শন
	রসনা, জিহ্বা	বরুণ	রসাস্বাদন
	নাসিকা	অশ্বিনীকুমারদ্বয়	ঘ্রাণ
কর্মেন্দ্রিয়	বাক্	অগ্নি	বচন
	পাণি (হস্ত)	ইন্দ্র	আদান
	পাদ	উপেন্দ্র	গমন
	পায়ু	যম	বিসর্গ (ত্যাগ)
	উপস্থ	প্রজাপতি	আনন্দ
অন্তঃকরণ	মন	চন্দ্র	সঙ্কল্প-বিকল্প
	বুদ্ধি	চতুর্মুখ (বিরাট)	নিশ্চয়
	অহঙ্কার	শঙ্কর	গর্ব, 'আমি আমি' করা।
	চিত্ত	অচ্যুত	অনুসন্ধান ও সুখ দুঃখাদি বোধ করা।

ব্যষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য প্রাজ্ঞ, ব্যষ্টি লিঙ্গ শরীরোপহিত চৈতন্য তৈজস এবং ব্যষ্টি স্থূলশরীর উপহিত চৈতন্যকে বিশ্ব বলে। বিশ্ব অবস্থায় স্থূলশরীরাভিমান ত্যাগ হয় না, তা স্থূলের মধ্যে থেকে ভোগাদি সম্পন্ন করে। কর্মেন্দ্রিয়-সকলের অনুভব নেই, অনুভব জ্ঞানেন্দ্রিয়ে হয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় মন, বুদ্ধি ও সাক্ষীর দ্বারা বোধের নিমিত্ত হয়।।১১৫॥

বিরাট ও বিশ্বের সম্বন্ধ

অত্রাপি অনয়োঃ স্থূল-ব্যষ্টি-সমষ্ট্যোঃ তদুপহিতয়োঃ বিশ্ববৈশ্বানরয়োঃ চ বন-বৃক্ষবৎ তদ্ অবচ্ছিন্ন-আকাশবৎ চ, জলাশয়জলবৎ তদ্গত প্রতিবিম্ব আকাশবৎ চ বা, পূর্ববৎ অভেদঃ।।১১৬।।

এখানেও বন ও বৃক্ষ যেমন অভিন্ন অথবা বনাবচ্ছিন্ন আকাশ ও বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশ যেমন অভিন্ন অথবা জলাশয় ও জল যেমন অভিন্ন বা জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত আকাশ ও জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ যেমন অভিন্ন সেরূপ এই ব্যষ্টি স্থূল ও সমষ্টি স্থূল এবং ব্যষ্টি স্থূল-উপহিত চৈতন্য ও সমষ্টি স্থূল-উপহিত চৈতন্য অভেদ।।১১৬।।

অমৃত টীকা ঃ সর্বত্রই উপমার ক্ষেত্রে দুইটি ভাবকে পাশাপাশি ধরে দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে, এরা অভেদ। ভাবদুটি হলো ঃ একটি মায়িক বিকাশের, অপরটি সেই বিকাশে প্রতিবিম্বিত বা বিকাশ-সীমিত চৈতন্যের। মায়িক পরিণামের দিক থেকে সমষ্টি-ব্যষ্টির যেমন মাত্রাগত ভেদ মাত্র, বস্তুগত নয়। ভেদটা পরিমাণগত, প্রকারগত বা তত্ত্বগত নয়, তেমনি বিশ্ব, বৈশ্বানরের ভেদটা বাহিরের দিক থেকে পরিমাণগত, প্রকারগত নয়। কিন্তু চৈতন্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত বা অবচ্ছিন্ন আকাশের ক্ষেত্রে ভেদ বলাই চলে না; কেবল উপাধি ভেদ মাত্র—স্থূলশরীর ও জগৎকে গ্রহণ করে তাকে বিরাট ও বিশ্ব বলে বলা চলে, এইমাত্র। চৈতন্য অভিন্ন। এইভাবে ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ কারণশরীরে, হিরণ্যগর্ভ-তৈজস সূক্ষ্মশরীরে এবং বিরাট-বিশ্ব স্থূলে অভেদ।।১১৬।।

স্থূল প্রপঞ্চ উৎপত্তির উপসংহার

এবং পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতেভ্যঃ স্থূলপ্রপঞ্চ-উৎপত্তিঃ।।১১৭।।

এইভাবে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত থেকে স্থূল জগতের উৎপত্তি বলা হলো।।১১৭।।

অমৃত টীকা ঃ প্রপঞ্চ শব্দ থেকেই এই কথাটা পরিস্ফুট। প্র—প্রকৃষ্টভাবে পঞ্চ পঞ্চ করে যে গঠন তাই প্রপঞ্চ। প্রপঞ্চ মানে স্থূলজগৎ। সূক্ষ্ম ও কারণ অবস্থাকেও একত্রে প্রপঞ্চ শব্দে বোঝানো হয়ে থাকে। কারণ স্থূলের মধ্যে সূক্ষ্ম ও কারণ অন্তর্ভুক্ত।।১১৭।।

মহাপ্রপঞ্চ-স্বরূপ নির্ণয়

এতেষাং স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-প্রপঞ্চানাং সমষ্টিঃ একঃ মহান্ প্রপঞ্চঃ ভবতি। যথা অবান্তর-বনানাং সমষ্টিঃ একং মহৎ বনং। যথা বা অবান্তর জলাশয়ানাং সমষ্টিঃ একঃ মহান্ জলাশয়ঃ ।।১১৮।।

এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগতের সমষ্টি, একটি মহাপ্রপঞ্চ, বিশাল জগৎ। যেমন ছোট ছোট বনসমূহ মিলিয়ে একটি মহাবন, অথবা যেমন অন্যান্য জলাশয়ের সমষ্টি একটি বৃহৎ জলাশয় ।।১১৮।।

এতৎ উপহিতং বিশ্ব-বৈশ্বানরাদ্ ঈশ্বর-পর্যন্তং চৈতন্য-মপি, অবান্তর-বন-অবচ্ছিন্ন-আকাশবদ্ অবান্তর-জলাশয়গত-প্রতিবিম্ব-আকাশবৎ চ একমেব ।।১১৯।।

অন্যান্য বন-সীমিত আকাশ নিয়ে যেমন একটি মহান আকাশ অথবা ভিন্ন ভিন্ন জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত আকাশ যেমন একই মহাকাশ, সেরূপ স্থূল সূক্ষ্ম-কারণ উপহিত বিশ্ব-বৈশ্বানর থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত চৈতন্যও একই ব্রহ্মচৈতন্য ।।১১৯।।

অমৃত টীকা : একক ব্যষ্টি জীবের স্থূল অবস্থাকে বিশ্ব, সূক্ষ্ম অবস্থাকে তৈজস এবং কারণকে প্রাজ্ঞ বলা হয়েছিল। প্রত্যেক অবস্থাতেই মায়িক ভাগ ও তাতে উপহিত চৈতন্য প্রত্যক্ ভাগ। বাহিরের ভাগের উপমা বৃক্ষ বা জল এবং প্রত্যক্ ভাগের উপমা অবচ্ছিন্ন আকাশ বা প্রতিবিম্বিত আকাশ। যেমন বিশ্ব বললে ব্যষ্টিস্থূল শরীর ও তদ্ উপহিত চৈতন্যকে বোঝায়, সেরূপ সমষ্টিগতভাবে স্থূলের দিকে বৈশ্বানর, সূক্ষ্মে হিরণ্যগর্ভ ও কারণে ঈশ্বর সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এই সবকে মিলিয়েই অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণকে মিলিয়ে—ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে অর্থাৎ বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ—বৈশ্বানর, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর, মায়িক পরিণামের দিক থেকেও এক, মায়া সামান্যে এক এবং মায়োপহিত চৈতন্যের দিক থেকেও একই। মায়া সামান্যে এক হলেও পরিমাণগত ভেদ অবশ্যই থাকে, প্রকারগত ভেদ না থাকলেও। সুতরাং বিশ্ব-বৈশ্বানরে, তৈজস-হিরণ্যগর্ভে, প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বরে ভেদ অবশ্যই থাকে—কিন্তু ঐ সকল অবস্থাগত ভেদ বিশিষ্ট উপহিত

চৈতন্যে অর্থাৎ উপমায় কথিত অবচ্ছিন্ন আকাশে বা জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত আকাশের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। এই অবস্থান্তর ভেদ কেবল প্রকৃতির দিক থেকে, চৈতন্যের দিক থেকে নয়—চৈতন্যাংশে তা সদৈব একরূপ। সুতরাং জীবগত চৈতন্যাংশ ও ঈশ্বর চৈতন্য এক। কিন্তু জীবে ঈশ্বরে পার্থক্য অনেক। জীব-ঈশ্বর কখনো এক নয়। ব্রহ্ম ও জীব যে এক বলা হয়, তা চৈতন্যের দিক থেকে। জীবগত স্থূল সূক্ষ্ম কারণ ছাড়ালে যে-চৈতন্য অবশিষ্ট থাকেন, তাঁর সঙ্গে বৈশ্বানর হিরণ্যগর্ভ ও কারণশরীর ঈশ্বর ছাড়ালে যে-চৈতন্য আধারভূত নিরুপাধিক থাকেন, তা একই। ভেদক ধর্ম নাই—নিরবয়ব ভূমা একটিই। সুতরাং সে-দিক থেকে জীব-ঈশ্বর এক। টীকাকার আপোদেব বলেছেন, এ হলো উপাসনার জন্য। নইলে বিরাট ও হিরণ্যগর্ভ জীব বলে ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন হতে পারেন না। বিরাট-হিরণ্যগর্ভেরই যখন এরূপ, তখন আমাদের মতো জীবের কা কথা।।১১৯।।

মহাপ্রপঞ্চ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ

আভ্যাং মহাপ্রপঞ্চ-তদ্‌-উপহিত-চৈতন্যাভ্যাং তপ্ত-অয়ঃ-পিণ্ডবৎ অবিবিক্তং সৎ, অনুপহিতং চৈতন্যং 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' [ছাঃ ৩/১৪/১] **ইতি মহাবাক্যস্য বাচ্যং ভবতি; বিবিক্তং সৎ, লক্ষ্যমপি ভবতি।।১২০।।**

তপ্তলৌহপিণ্ড যেমন অপৃথক অর্থাৎ লোহা ও আগুনকে পৃথক না করে এক ধরে বলা হয়; সেরূপ এই মহাপ্রপঞ্চও তদ্‌-উপহিত চৈতন্য থেকে অপৃথকভাবে অবস্থিত অনুপহিত চৈতন্য—'এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান্ বস্তু ব্রহ্মই' এই মহাবাক্যের বাচ্য অর্থ হন এবং পৃথকভাবে (ধরলে) লক্ষ্যও হয়ে থাকেন।।১২০।।

অমৃত টীকা : এই বিষয়টি পরে বিশদভাবে আলোচিত হবে।।১২০।।

অধ্যারোপের উপসংহার

এবং বস্তুনি অবস্তু-আরোপঃ অধ্যারোপঃ সামান্যেন প্রদর্শিতঃ।।১২১।।

এভাবে বস্তুতে অবস্তু আরোপরূপ অধ্যারোপকে সামান্যভাবে দেখানো হলো।।১২১।।

অমৃত টীকা ঃ সৎ ব্রহ্ম বস্তু। অজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে তার সূক্ষ্ম স্থূল সকল পরিণামই অবস্তু। এই বস্তুতে অবস্তুর আরোপকে অধ্যারোপ বলে। সৎবস্তুতে অসৎবস্তুর কল্পনার নাম অধ্যারোপ, দৃষ্টান্ত রজ্জুসর্প। একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের উপর কথিত প্রকারে ব্রহ্মাণ্ডের আরোপ, ব্রহ্মকে আচ্ছাদিত করে অসৎ পদার্থের কাল্পনিক সৃষ্টিকেই অধ্যারোপ বলা হচ্ছে। কল্পনার আধারমাত্র ব্রহ্মই সত্য; কল্পনা বস্তু নয়। ব্রহ্মাণ্ডরূপ ভ্রম-কল্পনার আধার ব্রহ্মই সত্য, ব্রহ্মাণ্ড সত্য নয়। একথাই শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসে নানাভাবে বলা হয়েছে—ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালের মতন এই সৃষ্টি—ঐন্দ্রজালিকই সত্য, ইন্দ্রজাল মিথ্যা।।১২১।।

বিশেষ অধ্যারোপ প্রকার

ইদানীং প্রত্যগাত্মনি ইদম্ ইদম্ অয়ম্ অয়ম্ আরোপয়তি ইতি বিশেষতঃ উচ্যতে।।১২২।।

এখন প্রত্যেক [প্রতি শরীরবর্তী] আত্মাতে যে-সকল বিশেষ বিশেষ ভাব আরোপ করে 'এই এই'—এরূপভাবে সাধারণ লোকে বলে থাকে, সেই সকল আরোপ-কথা বলা হচ্ছে।।১২২।।

অমৃত টীকা ঃ পূর্বোক্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি অধ্যারোপ ঈশ্বর-সৃষ্টি। এক্ষণে জীবসৃষ্টির কথা বলা হচ্ছে। সামান্য পৃথিবী প্রভৃতি সৃষ্ট পদার্থকে সকল জীব একই রকম ভাবে দেখে না, নিজ নিজ সংস্কার অনুভব অনুসারে পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করে থাকে। এই পার্থক্যই জীবসৃষ্টি; একই গোলাপ ফুলকে গরু এক প্রকার, মানুষ অন্য ভাবে দেখে থাকে। গরুর কাছে তা খাদ্য, মানুষের কাছে তা সৌন্দর্য ও সুগন্ধের আধার। আবার মানুষের মধ্যেও বোধ ভিন্নতায় গোলাপ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গৃহীত হয়ে থাকে। এভাবে জগতে দুরকম সৃষ্টির অনুভব আমাদের হয়ে থাকে। জীবসৃষ্টিই এই বিশেষ অধ্যারোপ। এই বিশেষ অধ্যারোপের প্রকার এখানে দেখানো হচ্ছে, মূল সত্যকে নিরূপণের জন্য।।১২২।।

পুত্র-আত্মবাদী চার্বাকের মত

তথাচ-অতিপ্রাকৃতঃ 'আত্মা বৈ পুত্র নামাসি' [কৌঃ ২/১১] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ স্বস্মিন্ ইব স্বপুত্রে অপি প্রেমদর্শনাৎ, পুত্রে পুষ্টে নষ্টে অহম্ এব পুষ্টঃ নষ্টঃ চ ইত্যাদি অনুভবাৎ চ, 'পুত্র আত্মে'তি বদতি।।১২৩।।**

যেমন—অতি স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ 'আত্মাই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে' ইত্যাদি বেদবাক্য প্রমাণ দিয়ে বলে পুত্রই আত্মা। যেমন নিজেতে ভালবাসা দেখা যায়, তেমনি নিজপুত্রে ভালবাসাবশত পুত্র পুষ্ট হলে 'আমি পুষ্ট'; নষ্ট হলে 'আমি নষ্ট হলাম' এরূপ অনুভববশত 'পুত্রই আত্মা'—এ-কথা (তারা) বলে।।১২৩।।

অমৃত টীকা ঃ আলোচনার রূপটি হলো—প্রথমে শ্রুতিবাক্য প্রমাণ, পরে যুক্তি ও শেষে অনুভব দেখিয়ে কোন মতকে প্রতিষ্ঠা করা। আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রথমে শ্রুতিবাক্য—'আত্মা বৈ পুত্র নামাসি', পরে যুক্তি, নিজেতে যেমন ভালবাসা তেমন ভালবাসা পুত্রের প্রতি হয়—অনুভব হলো, পুত্রের ভালমন্দ পিতার নিজের ভালমন্দ বলে পিতা অনুভব করেন। অতএব পুত্রই আত্মা। এই মত পরবর্তী শ্রুতি যুক্তি অনুভবের দ্বারা খণ্ডিত হয়—এভাবে বেদান্তের চূড়ান্ত মত জীবব্রহ্মৈক্য দেখানো হবে।।১২৩।।

দেহাত্মবাদী চার্বাক

চার্বাকস্তু 'স বা এষ পুরুষঃ অন্নরসময়ঃ' [তৈঃ ২/১/১] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ, প্রদীপ্তগৃহাৎ স্বপুত্রং পরিত্যজ্য অপি স্বস্য নির্গম-দর্শনাৎ, স্থূলঃ অহং কৃশঃ অহং ইত্যাদি অনুভবাৎ চ, স্থূলশরীরম্ আত্মা ইতি বদতি।।১২৪।।**

চার্বাকেরা বলেন, 'সেই এই পুরুষ অন্নরসের বিকার' ইত্যাদি শ্রৌত প্রমাণ; প্রজ্বলিত গৃহ থেকে নিজপুত্রকে ত্যাগ করে নিজে বাহির হয়ে আসে, এরূপ দেখা যায়—এই যুক্তি এবং 'আমি স্থূল' 'আমি কৃশ' ইত্যাদি অনুভব হয় বলে স্থূলদেহই আত্মা।।১ ।।

অমৃত টীকা ঃ পুত্র থেকে নিজের দেহ অধিক প্রিয়। দেহে আত্মা অভিমান ও নিজ দেহের প্রতি পরম আসক্তি প্রায় সকল মানুষেই দেখা যায়। দেখাও যায়, জলন্ত ঘর থেকে মানুষ প্রাণপ্রিয় পুত্রকন্যাকে ত্যাগ করে নিজ শরীর রক্ষার জন্য বেরিয়ে আসে। দেহ রোগা হলে, আমরা বলি 'আমি রোগা', মোটা হলে বলি 'আমি মোটা' ইত্যাদি অনুভব হয়। অতএব দেহই আত্মা।।১২৪।।

ইন্দ্রিয়-আত্মবাদী চার্বাকমত

অপরঃ চার্বাকঃ 'তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং পিতরং এত্যোচুঃ' [ছাঃ ৫/১/৭] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ, ইন্দ্রিয়াণাম্ অভাবে শরীরচলনাভাবাৎ, কাণঃ অহম্, বধিরঃ অহং, ইত্যাদি অনুভবাৎ চ ইন্দ্রিয়াণি আত্মা ইতি বদতি।।১২৫।।**

অপর চার্বাক বলেন—'সেই প্রাণাদি, পিতা প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিল,' ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণবশত; ইন্দ্রিয়ের অভাবে শরীর চলে না বলে (যুক্তি) এবং 'আমি কানা' 'আমি কালা' এরূপ অনুভববশত ইন্দ্রিয়ই আত্মা ॥১২৫॥

অমৃত টীকা : এর দ্বারা পূর্বমত 'দেহই আত্মা' খণ্ডিত হলো। পরবর্তী মতের দ্বারা এই মতেরও খণ্ডন হবে। ইন্দ্রিয়গণ প্রজাপতির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের মধ্যে কে আত্মা?' এই শ্রুতি প্রমাণ দেখিয়ে চার্বাকগণ বলেন, ইন্দ্রিয়গণ চেতন। এই চেতন ইন্দ্রিয়ের অভাবে দেহচালনা হয় না—এই যুক্তি ও ইন্দ্রিয় নষ্ট হলে, যেমন চক্ষু নষ্ট হলে বলে, 'আমি কানা' ইত্যাদি অনুভব হয়। এভাবে তাঁরা বলেন, ইন্দ্রিয় আত্মা ॥১২৫॥

প্রাণ-আত্মবাদী চার্বাকমত

অন্যঃ তু চার্বাকঃ'অন্যঃ অন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ।' [তৈঃ ২।২।১] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ, প্রাণাভাবে ইন্দ্রিয়চলন-অযোগাৎ, অহম্-অশনায়াবান্, অহং পিপাসাবান্ ইত্যাদি অনুভবাৎ চ, প্রাণ আত্মা ইতি বদতি।।১২৬।।**

অন্য চার্বাকেরা বলেন, 'অন্য আন্তর আত্মা প্রাণময়' এই শ্রুতি, প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয় চলে না—এই যুক্তি, এবং অনুভবও হয় যে, 'আমি ক্ষুধার্ত', 'আমি পিপাসার্ত'—সুতরাং প্রাণই আত্মা ॥১২৬॥

অমৃত টীকা : প্রাণবাদী চার্বাকগণের যুক্তি হলো : প্রাণের অভাবে প্রাণের নিজ স্থিতির জন্য অন্নপানাদি না পেলে, শরীর কৃশ হয়, ইন্দ্রিয়সকলের কার্যকারিতাও দেখা যায় না বলে প্রাণাধীন ইন্দ্রিয় আত্মা নয়; প্রাণই আত্মা। তাছাড়া চৈতন্য সংযোগে ইন্দ্রিয় কাজ করতে পারে, না হলে পারে না—এই

অন্বয় ব্যতিরেকী যুক্তিতে বোঝা যায়, ইন্দ্রিয়সকল করণ, আত্মা নয়। ইন্দ্রিয় সকলের কর্তৃত্ব স্বীকার করলে করণের অভাব হয়। আরো কথা, এক শরীরে ইন্দ্রিয়গুলির ভোক্তৃত্ব একসঙ্গে হবে অথবা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা হবে? যদি প্রত্যেকের কর্তৃত্ব স্বীকার করা যায়, তাহলেও প্রশ্ন হবে তা কি যুগপৎ হবে অথবা ক্রমান্বয়ে? প্রথমটি হতে পারে না, কারণ চক্ষুর ভোগ্য জিহ্বার নয়, ইত্যাদি। সকল ইন্দ্রিয় একযোগে একটি কার্য সম্পাদন করে না। তাদের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা কার্য অসাধারণ বিষয় ভেদ একেবারে নিয়মবদ্ধ। দ্বিতীয় পক্ষেও হতে পারে না, উক্ত কারণে যুগপৎ কর্তৃত্বও অসম্ভব। ক্রমভোক্তৃত্বরূপ তৃতীয় পক্ষও যুক্তিসহ নয়। কারণ ইন্দ্রিয় স্বতন্ত্র হওয়ায় তাদের ঐক্যমত না হলে, বিরুদ্ধ ক্রিয়াবশত শরীর অচল হবে বা শরীর ভেদ হতে পারে। যদি তাদের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করা না যায়, তবে তারা যার অধীন তাকেই আত্মা বলা উচিত। শরীর এক—তাতে স্বামি-ভৃত্যভাব যুক্তিযুক্ত নয়। সুতরাং যখন প্রাণ সমগ্র ইন্দ্রিয়ের আশ্রয় ও নিদ্রা জাগরণে অবিচ্ছিন্ন স্বভাব, তখন প্রাণই আত্মা। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় আত্মা হলে একের কার্য অন্যের স্মৃতিতে থাকারূপ অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারণ অনুভব হয়, যে-আমি চক্ষু দিয়ে দেখেছিলাম, সে-ই আমি কান দিয়ে শুনছি ইত্যাদি। সুতরাং ইন্দ্রিয় আত্মা হতে পারে না। ক্ষুধা তৃষ্ণাও প্রাণ-ধর্ম। অন্নপানাদি না পেলে প্রাণ বিয়োগ হয়। এরূপ ধর্মবিশিষ্ট প্রাণকে মানুষ 'আমি' বলে অনুভব করে বলে, প্রাণই আত্মা। [বালবোধিনী] ।।১২৬।।

মন-আত্মবাদী অন্য চার্বাক মত

ইতরস্তু চার্বাকঃ 'অন্যঃ অন্তর আত্মা মনোময়ঃ' [তৈঃ ২।৩।১।] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ, মনসি সুপ্তে প্রাণাদেঃ অভাবাৎ, 'অহং সঙ্কল্পবান্' 'অহং বিকল্পবান্' ইত্যাদি অনুভবাৎ চ, 'মন আত্মা' ইতি বদতি।।১২৭।।**

আরও অন্য চার্বাক বলেন, 'মনোময় অন্য একটি আন্তর আত্মা' ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণ বলে (জানা যায়, মন আত্মা) মন সুষুপ্ত হলে প্রাণাদির অভাব হয় (এই যুক্তিতে বোধ হয়, মন প্রাণকে চালিত করে, আরো) অনুভব হয় 'আমি সঙ্কল্পবান্, বিকল্পবান্' ইত্যাদিবশত মনই আত্মা।।১২৭।।

অমৃত টীকা ঃ প্রাণের প্রবৃত্তি মনের অধীন, প্রাণের অধীন মন হয় না। কারণ জড়ের অধীন চেতন মন হতে পারে না। আরো যুক্তি, প্রাণ আত্মা হলে অপানাদি অন্যান্য বায়ুও আত্মা হয়ে পড়ে। অনেক আত্মার অধিষ্ঠানভূত শরীর যুগপৎ বিভিন্ন বৃত্তিপ্রসঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মন একটি, মনের নিয়ন্ত্রণে প্রাণাদির নিয়মিত কর্ম সম্ভব হয়। এজন্য মন আত্মা।।১২৭।।

'বুদ্ধিই আত্মা'-বাদী বৌদ্ধদের মত

বৌদ্ধস্তু 'অন্যঃ অন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ' [তৈঃ ২।৪।১।] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ কর্তুঃ অভাবে করণস্য শক্তি-অভাবাৎ, 'অহং কর্তা,' 'অহং ভোক্তা' ইত্যাদি অনুভবাৎ চ, 'বুদ্ধিঃ আত্মা' ইতি বদতি।।১২৮।।**

'মনোময়ের অন্তরে অন্য আত্মা বিজ্ঞানময়', ইত্যাদি শ্রুতি, (যুক্তি) যেহেতু কর্তার অভাবে করণের শক্তি থাকে না, এবং 'আমি কর্তা' 'আমি ভোক্তা' এরূপ অনুভব হয়, তাই বৌদ্ধ বলেন, 'বিজ্ঞানই আত্মা' ।।১২৮।।

অমৃত টীকা ঃ কর্তা যেটি তা-ই আত্মা হওয়া যুক্তিযুক্ত। সুখাদি জ্ঞানের করণরূপে মনের অস্তিত্ব বোঝা যায়, সুতরাং মন আত্মা হতে পারে না—মন করণ। করণের পরিচালক আত্মা করণ থেকে ভিন্ন অবশ্যই হবে। এজন্য বিজ্ঞানই আত্মা। কারণ, জ্ঞান হয় যে, আমি কর্তা, আমি ভোক্তা।

এখানে বৌদ্ধ মত বলতে যোগাচার মতকে উত্থাপন করা হয়েছে। তাদের মতে ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা। প্রশ্ন হতে পারে, মনের কর্তৃত্ব স্বীকার করলেই তো হয়, বিজ্ঞানের দরকার কি? এরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করেই ব৺ । হয়েছে, মন করণ। কারণ কর্তার অভাবে করণের শক্তি থাকে না। মনের কর্তৃত্ব স্বীকার করলে সকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ সর্বদা থাকায় সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান একসঙ্গে হতে থাকবে এবং এ-বিষয়ে ক্রমিক জ্ঞানের নিয়ন্ত্রক মনকে স্বীকার করলে দোষ একই হবে যে, যেহেতু মন সকল ইন্দ্রিয়ের আধার এবং সর্বদা সকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত সেহেতু সর্বদা সকল ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান হতে থাকবে। কিন্তু এরূপ দেখা যায় না। সেজন্য মন থেকে স্বতন্ত্র মনের নিয়ামক কোন আত্মা আছে। যোগাচারী বৌদ্ধগণ এজন্য ক্ষণিক বিজ্ঞানকে আত্মা বলে মানেন। এ মত বেদবাহ্য। অর্থাৎ বেদান্তদর্শন সম্মত নয়। তাঁদের মতে জ্ঞান ইচ্ছা প্রযত্ন সংস্কার স্মৃতিসকলের এক আশ্রয় এবং তাদের বিকাশ ক্রমিক হয়ে থাকে।

ক্ষণিক বিজ্ঞান স্বীকার করলে তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। অর্থাৎ একক্ষণে জ্ঞান হয়ে পরক্ষণে ধ্বংস হলে—জ্ঞান থেকে ইচ্ছা, ইচ্ছা থেকে প্রযত্ন, প্রযত্ন থেকে সংস্কার প্রভৃতির ক্রমিক বিকাশ অসম্ভব হবে। সুতরাং একটি স্থির কিছু আছে। যাতে জ্ঞান ইচ্ছা ইত্যাদির ধারাবাহিক ক্রমিক বিকাশ হয়। বৌদ্ধগণ এরূপ স্থায়ী পদার্থ স্বীকার করেন না। ফলে, পূর্বে দেখা সজাতীয় বস্তুর অনুভব ও তা থেকে অভীপ্সিত ফল লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা ও প্রযত্ন এবং তার সংস্কারের অবস্থান ইত্যাদি ক্ষণবিধ্বংসী জ্ঞানধারায় থাকা সম্ভব নয়। তা হলে একজন দেখেন, অন্যজন স্মরণ করেন, এরূপ অবস্থা স্বীকার করতে হয়। তা অসম্ভব, এজন্য বৌদ্ধমত গ্রাহ্য নয়। [বিঃ টীকা]

বুদ্ধি বা জ্ঞান আত্মা বলার পর সে-মতও খণ্ডিত করে আরো অভ্যন্তরে আত্মার সন্ধান করা হচ্ছে।।১২৯।।

অজ্ঞানাত্মবাদী প্রভাকরের মত

প্রাভাকর-তার্কিকৌ তু 'অন্যঃ অন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ' [তৈঃ ২।৫।১] ইত্যাদি শ্রুতেঃ সুষুপ্তৌ বুদ্ধ্যাদীনাম্ অজ্ঞানে লয়-দর্শনাৎ 'অহম্ অজ্ঞঃ' ইত্যাদি অনুভবাৎ চ অজ্ঞানম্ আত্মা ইতি বদতঃ।।১২৯।।

প্রভাকর (মীমাংসক সম্প্রদায়ের একজন আচার্য) ও তার্কিকগণ (নৈয়ায়িক) বলেন, 'অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ' ইত্যাদি শ্রুতি, সুষুপ্তিতে বুদ্ধি প্রভৃতির অজ্ঞানে লয় দেখা যায় এবং 'আমি অজ্ঞ' এরকম অনুভব হয় বলে, 'অজ্ঞান-ই আত্মা'।।১২৯।।

অমৃত টীকা ঃ 'ক্ষণিক বিজ্ঞান-ই আত্মা' এই পক্ষে বন্ধন ও মুক্তির অধিকারি ভিন্ন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ যেক্ষণে 'আমি বদ্ধ' বোধ, তার পরক্ষণেই সে-বোধযুক্ত ব্যক্তিত্বের নাশ হওয়ায় পরবর্তী ক্ষণে নূতন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ হয় বলে মুক্তি কার হবে? যে বদ্ধ তার মুক্তি না হয়ে অপরের মুক্তিবোধ হবে। এবং আরো অনেক অসঙ্গতি থাকায় এই মত সর্বথা অগ্রাহ্য বলে বেদবাদিপক্ষ অবলম্বন করে বিজ্ঞানেরও অভ্যন্তরবর্তী আত্মস্বরূপ নির্ধারণ জন্য বলা হয়েছে, 'অন্যঃ অন্তরঃ আত্মা আনন্দময়ঃ'। মীমাংসক প্রভাকর ও নৈয়ায়িকগণ অজ্ঞানকে আত্মা বলেন। অজ্ঞান ক্ষণিকবিজ্ঞান থেকে ভিন্ন, বিজ্ঞানের অধিকরণ ও দ্রব্য —এঁদের মত। তাঁরা বলেন, আত্মা আনন্দস্বরূপ নন বরং আনন্দের আশ্রয়;

জ্ঞানের আশ্রয় হলে তা জ্ঞানস্বরূপও নয় বা অজ্ঞানও নয়, কারণ জ্ঞানের আশ্রয় অজ্ঞান হতে পারে না। তাঁরা চিদ্রূপ আত্মা স্বীকার করেন না। কিন্তু জ্ঞানের আশ্রয় কোন জড় দ্রব্য স্বীকার করেন, যা অজ্ঞানও নয়। এবং তা অনাদি। সিদ্ধান্তমতে জ্ঞানের আশ্রয়টি জ্ঞান থেকে ভিন্ন হলে তা অবশ্যই অজ্ঞান, সুতরাং তাদের অজ্ঞানেই আত্মত্বভ্রম হয়। এজন্য সুষুপ্তিতে বুদ্ধি প্রভৃতি লয় হলে যে অজ্ঞানের বোধ, তাতে প্রমাণিত হয়, অজ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞানস্বরূপ আত্মা আছেন এবং এ অবস্থায় অজ্ঞানেরও বোধ হয় বলে, অজ্ঞান আত্মা নয়।।১২৯।।

ভাট্টমতে—'অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যই আত্মা'

ভাট্টস্তু 'প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ঃ আত্মা' [মুঃ উঃ ৫/৪] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ সুষুপ্তৌ প্রকাশ-অপ্রকাশ-সদ্ভাবাৎ, 'মামহং ন জানামি' ইত্যাদি অনুভবাৎ চ, 'অজ্ঞান-উপহিতং চৈতন্যম্ আত্মা' ইতি বদতি।।১৩০।।**

ভট্টমতে 'আনন্দময় আত্মা জ্ঞানের ঘনীভূত অবস্থা' ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে (অজ্ঞান উপহিত চৈতন্যই আত্মা), সুষুপ্তিতে জ্ঞান ও অজ্ঞান (উভয়) থাকে এবং 'আমি আমাকে জানিনা' এরূপ অনুভব হয় বলে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই আত্মা।।১৩০।।

অমৃত টীকা : ভাট্ট মীমাংসক সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় আচার্য। তাঁর এই মত। যেহেতু সুষুপ্তিতে জ্ঞান ও অজ্ঞান উভয়েরই বোধ হয়, সেহেতু অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই আত্মা। 'প্রজ্ঞানঘন এব'-এর অর্থ একমাত্র প্রজ্ঞান আছেন, অন্য কোন রস নেই। আনন্দময়ঃ শব্দে আনন্দপ্রচুর, আনন্দবিকার নয়। প্রাচুর্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় নির্দেশ। ঈষৎ আনন্দস্বভাবযুক্ত হলেও প্রজ্ঞানই সেখানে দ্রব্য। কারণ প্রজ্ঞান না থাকলে সুষুপ্তিতে যখন বুদ্ধি প্রভৃতির লয় হয়ে যায়, তখন 'আমি সুখে ঘুমিয়ে ছিলুম' এরূপ জাগ্রতোত্তর স্মৃতি-জ্ঞান কিরূপে হয়? তখন ইন্দ্রিয়াদির ব্যাপার না থাকলেও ঐরূপ জ্ঞানেরও বোধ থাকে বলে সে-অবস্থায়ও প্রজ্ঞানই থাকে। এই হলো বোধাংশের প্রতীতি। আবার 'কিছুই জানতে পারিনি'—এই অনুভবে অপ্রকাশ দ্রব্যাংশের প্রতীতি থাকায় অজ্ঞানের অস্তিত্বও বোধ হচ্ছে। 'অহম্' এই আত্মকর্তৃত্ব প্রকাশিত থাকলেও 'আমি নিজেকে জানি না' এই অনুভব বলে অজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। এভাবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের একত্র বোধবশত তাঁরা বলেন, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই আত্মা।।১৩০।।

শূন্যবাদী বৌদ্ধমতে আত্মা

অপরঃ বৌদ্ধঃ 'অসৎ এব ইদম্ অগ্রে আসীৎ' [ছাঃ ৬।২।১] **ইত্যাদি শ্রুতেঃ, সুষুপ্তৌ সর্ব-অভাবাৎ, অহং সুপ্তঃ সুষুপ্তৌ ন আসম্' ইতি উত্থিতস্য স্ব-অভাব-পরামর্শ-বিষয়-অনুভবাৎ চ 'শূন্যম্ আত্মা' ইতি বদতি।।১৩১।।**

অন্য একদল বৌদ্ধ বলেন, 'এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অসৎই ছিল, এই শ্রুতি বলে, সুষুপ্তিতে সকল কিছুর অভাব থাকায়, 'আমি নিদ্রাকালে ছিলাম না'—নিজের অভাবাত্মক জ্ঞানের এরূপ অনুভব সুষুপ্তির পরে জাগ্রত অবস্থায় হয় বলে 'শূন্যই আত্মা' ।।১৩১ ।।

অমৃত টীকা : বৌদ্ধদের মাধ্যমিক শূন্যবাদীপক্ষ এরূপ মত পোষণ করেন। 'অসদেব সৌম্য ইদমগ্রাসীৎ' এই শ্রুতিবাক্যে বস্তুত অনভিব্যক্ত নামরূপের আত্মস্বরূপে অবস্থানের কথাই বলা হলেও, তাঁরা তাঁদের মত অনুসারে, এই শ্রুতির ব্যাখ্যা করে নিজেদের মতকে পুষ্ট করতে চান। আবার সুষুপ্তির পরে জাগ্রৎকালের অনুভবের ভিন্নতাও করেছেন। সুপ্তোত্থিতের যে বোধ, 'আমি ছিলাম, সুখে ঘুমিয়ে ছিলাম, কিছু জানতে পারিনি'—এ কথা তাঁরা অস্বীকার করে বলেন, তখন আত্মাস্তিত্বের বোধ ছিল না; 'আমি ছিলাম না' এরূপ বোধ হয়। স্পষ্টতই তা অনুভব-বিরোধী কথা। অতএব তাঁদের মত, আত্মা সর্ব অভাবাত্মক কোন দ্রব্য, বোধক নয়। কিছুই নেই, শূন্য আত্মা বলেও কিছু নেই।।১৩১ ।।

উপসংহার

পুত্রাদির শূন্য পর্যন্তের স্বরূপ কথন

এতেষাং পুত্রাদীনাং শূন্যপর্যন্তানাম্ অনাত্মত্বম্ উচ্যতে।।১৩২।।

এই (ভাবে) পুত্র থেকে শূন্য পর্যন্ত সকল পদার্থের অনাত্মত্ব বলা হলো।।১৩২।।

এতৈঃ অতিপ্রাকৃতাদি-বাদিভিঃ উক্তেষু শ্রুতি যুক্তি-অনুভব-আভাসেষু পূর্ব-পূর্ব উক্ত-শ্রুতিযুক্তি-অনুভব-আভাসানাম্ উত্তর-উত্তর-শ্রুতিযুক্তি-অনুভব-আভাসৈঃ আত্মত্ব-বাধ-দর্শনাৎ, পুত্রা-দীনাম্ অনাত্মত্বং স্পষ্টম্ এব ইতি।।১৩৩।।

অতি প্রাকৃত (স্থূলবুদ্ধি) প্রভৃতি বাদিগণ যে-সকল শ্রুতি-যুক্তি ও অনুভবের উল্লেখ করে পুত্রাদি শূন্য পর্যন্ত পদার্থ সকলকে আত্মা বলে বলেন, সেগুলি সার্থক শ্রুতিযুক্তি অনুভব নয়, পরন্তু আভাস মাত্র। তাঁদের সে-সকল শ্রুতি-যুক্তি অনুভব আভাসগুলি পূর্ব পূর্বটি উত্তর উত্তর শ্রুতি-যুক্তি-অনুভব-আভাসের দ্বারা বাধিত হওয়ায় [তাদের কথিত পুত্রাদিশূন্য] পর্যন্ত সবকটিরই অনাত্মত্ব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় ॥১৩৩॥

অমৃত টীকা : আভাস অর্থে প্রকৃত বস্তুর মতো শুনতে বটে কিন্তু, তা প্রকৃত বস্তু নয়। শ্রুতি-আভাস অর্থে শ্রুতিবাক্যের যথাযথ অর্থ না করা—প্রকরণের পূর্বাপর না ধরে অর্থ করা। সেরূপ যুক্তি-আভাস বলতে সঠিক যুক্তি নয়—শুনতে যুক্তির মতো হলেও তা যুক্তি নয়। এরূপ অনুভবের ক্ষেত্রে, অনুভবের আভাস—যথার্থ অনুভব নয়, সুস্পষ্ট বোধ নয় ॥১৩৩॥

পুত্রাদি শূন্য পর্যন্তের অনাত্মত্ব বিষয়ে শ্রুতি

কিঞ্চ 'প্রত্যক্ অস্থূলঃ অচক্ষুঃ অপ্রাণঃ অমনাঃ অকর্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সৎ' ইত্যাদি প্রবলশ্রুতিবিরোধাৎ অস্য পুত্রাদি-শূন্য-পর্যন্তস্য জড়স্য চৈতন্যভাস্যত্বেন ঘটাদিবৎ অনিত্যত্বাৎ, 'অহং ব্রহ্ম' ইতি বিদ্বৎ অনুভব-প্রাবল্যাৎ চ, তৎ-তৎ-শ্রুতিযুক্তি-অনুভব-আভাসানাং বাধিতত্বাৎ অপি, পুত্রাদিশূন্যপর্যন্তম্ অখিলম্ অনাত্মা এব ॥১৩৪॥

আরো কি, আত্মা প্রত্যক্, স্থূল নয়, চক্ষু নয়, প্রাণ নয়, মন নয়, কর্তা নয়, চৈতন্য, চৈতন্য-মাত্র [ও] সৎ ইত্যাদি প্রবল শ্রুতির সঙ্গে পূর্বপক্ষীয়গণের শ্রুতির বিরোধবশত ঘট প্রভৃতির ন্যায় পুত্রাদিও চৈতন্য প্রকাশ্য বলে অসৎ জড়, কারণ তা প্রকাশ্য [এই যুক্তি বলে]। আর 'আমি ব্রহ্ম' এরূপ ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রবল অনুভববশত [পূর্ব পূর্ব বাদিগণের শ্রুতিযুক্তি ও অনুভব আভাসে কথিত পুত্র থেকে শূন্য পর্যন্তের যে আত্মত্ব ভ্রান্তি তা নিরূপিত হয়] পুত্রাদি শূন্য পর্যন্ত সকল পদার্থ অনাত্মাই ॥১৩৪॥

অমৃত টীকা : পুত্র থেকে আরম্ভ করে পর পর পদার্থ সকলকে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীগণ যে আত্মা বলে বলেছিলেন, সে-সকল যে পরের পরের

বাদিগণ কর্তৃক কেবল যুক্তি দিয়েই বাধিত হয়েছে তা নয়, সে-সকল যুক্তির অনুকূল শ্রুতিবাক্য ও অনুভবকেও তাঁরা প্রমাণ বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই পূর্ব পূর্ব শ্রুতিযুক্তি অনুভব বাস্তবিক সত্য নয়, সত্যের আভাসমাত্র। —একথা বলাতে আশঙ্কা হচ্ছে—বেদবাক্য সত্য; প্রতিটি বেদবাক্য সত্য হলে, পুত্র আত্মা, প্রাণ-আত্মা, মন-আত্মা, ইত্যাদি বিষয়ক শ্রুতিবাক্যগুলিও সত্য হয়। এরূপ পরস্পর বিরোধী শ্রুতিবাক্য কেমন করে সত্য হতে পারে? এর মধ্যে একটি মাত্র বাক্য সত্য হলে বাকি বাক্যগুলি অসত্য হয়। তা হলে বেদবাক্য অভ্রান্ত; 'ঈশ্বর নিঃশ্বসিত সত্য' এ-মত বাধিত হয়ে পড়ে। অতএব অন্যান্য শ্রুতিবাক্যগুলির যথার্থ অর্থ কি, তা নিরূপণ করা প্রয়োজন।

এরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়েছে, পুত্র আত্মা, ইন্দ্রিয় আত্মা ইত্যাদি বাক্যগুলির স্ব-অর্থে তাৎপর্য নেই। সেগুলি সর্বশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার সোপান মাত্র। স্থূলবুদ্ধি মানুষকে ধীরে ধীরে বাহিরের স্থূল বিষয় থেকে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর-তম সত্যে পৌঁছে দিতে, স্থূল অনুভবের বিষয়গুলিকে গ্রহণ করে তাকে ধীরে ধীরে অন্তরের সূক্ষ্মতম স্তরের ধারণা দিতেই শ্রুতি ঐরূপ পুত্র আত্মা, ইন্দ্রিয় আত্মা ইত্যাদি ভাবের কথা বলেছেন। এভাবে সোপানক্রমে বোঝানোর একটি উদাহরণকে অরুন্ধতী-ন্যায় বলা হয়েছে। সেটি এরূপ—শাস্ত্রে 'বিবাহের পর বর বধূকে সপ্তর্ষির মণ্ডলমধ্যস্থিত বশিষ্ঠ নক্ষত্রের পাশে অতিক্ষুদ্র অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখাবে' এরূপ বিধান আছে। বর অনভ্যস্তা বধূকে প্রথমে বৃক্ষ শাখায় পরে চন্দ্রে, তারপর সপ্তর্ষিতে, পরে বশিষ্ঠ নক্ষত্রে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়ে পরে বশিষ্ঠের পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র নক্ষত্র অরুন্ধতীকে সে দেখাতে সমর্থ হয়। সেরূপ বেদান্তোক্ত আত্মতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে এরূপ পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতে পূর্ব পূর্ব শ্রুতিবাক্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। কিন্তু প্রতিবাদিগণ ক্রমপরিণত মূল সত্যকে না ধরে প্রতি পর্যায়ে উক্ত শ্রুতিবাক্যের কোন একটিকে তাদের অনুভব ও যুক্তির ভ্রান্তিবশত পুরো সত্য বলে ধরে নিয়েছেন এবং এইভাবে কেউ পুত্রকে আত্মা, কেউ বা মন, প্রাণ ইত্যাদিকে আত্মা বলে বর্ণনা করেছেন।

সর্বশেষ যে শ্রুতিবাক্য—'প্রত্যগ্ অস্থূলঃ' ইত্যাদি উদ্ধার করা হয়েছে, তা আসলে অনেকগুলি শ্রুতিবাক্যের মূলকথাগুলি সংগৃহীত করে শ্রুতিমূল বলে তুলে ধরা হয়েছে। এতে পুত্রাদি প্রতিপর্যায়ের বিরোধী সত্যরূপকে বর্ণনা করে আত্মসত্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেমন 'আত্মা বৈ পুত্র নামাসি' 'প্রত্যক্' এই শ্রুতিবলে বাধিত হয়েছে। 'কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষৎ' [কঠ ৪।১] শ্রুতি

থেকে নেওয়া। সেরূপ 'অস্থূল' শব্দে 'দেহ-আত্মা' এই মত বাধিত হয়; 'অস্থূলমনণুং অহ্রস্বমদীর্ঘং' [বৃঃ ৩।৮।৮] এই শ্রুতিবলে 'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ'—এই শ্রুতি বাধিত হয়। 'তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিম্' এই শ্রুতিবলে ইন্দ্রিয়-আত্মা প্রতিষ্ঠাকামীদের মত 'অচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং' শ্রুতিবলে বাধিত হয় ও মূলের 'অচক্ষুঃ' শব্দটি এই শ্রুতি বাক্য থেকে গৃহীত হয়েছে। সেরূপ অন্যো অন্তর-আত্মা প্রাণময়ঃ শ্রুতির দ্বারা প্রাণবাদীদের মত, 'অন্যঃ অন্তর আত্মা মনোময়ঃ' [তৈ ২।৩] মন্ত্রে, মনোময় আত্মা আবার 'অন্যঃ অন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ' মন্ত্রে, বিজ্ঞানময় আত্মা আবার 'অন্যঃ অন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ' মন্ত্রে বাধিত হয়েছে। এভাবে বিজ্ঞানময় পর্যন্ত আত্মবাদ বাধিত ও 'অনন্তশ্চাত্মা বিশ্বরূপঃ হি অর্কতা' [শ্বেঃ ১।৯] মন্ত্রে অকর্তা আত্মা সমর্থিত হয়েছে। ভট্টমতে 'অজ্ঞান-উপহিত-চৈতন্য আত্মা'—এই বাদ 'প্রজ্ঞানঘন এব আনন্দময়ঃ' এই মন্ত্রে বাধিত ও 'ন চাস্তি বেত্তা মম চিৎ সদাহং' [কৈবল্য উঃ ২১] 'চিন্মাত্র অহং সদাশিবঃ' [কৈবল্য উঃ ১৮] মন্ত্রের 'চিৎ' শব্দ গৃহীত হয়েছে। শূন্যবাদী বৌদ্ধদের মত 'অসদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ' এই শ্রুতি 'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ' মন্ত্রে বাধিত ও 'সত্যং স আত্মা' [ছাঃ ৬।৮।৭] মন্ত্রে সমর্থিত হওয়ায় সকল পূর্ববাদিগণের মত প্রবল শ্রুতিবলে খণ্ডিত বলে দেখানো হয়েছে।।১৩৪।।

আত্মার স্বরূপ ও অধ্যারোপের উপসংহার

অতঃ তৎ তৎ ভাসকং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবং প্রত্যক্-চৈতন্যম্ এব আত্মতত্ত্বম্ ইতি বেদান্তবিদ্ অনুভবঃ।।১৩৫।।

অতএব সেই সেই পুত্রাদি শূন্য পর্যন্তের ভাসক নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্যস্বভাব নিজের অন্তরতম চৈতন্যই আত্মতত্ত্ব, এই-ই বেদান্তজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনুভব।।১৩৫।।

এবম্ অধ্যারোপঃ।।১৩৬।।

এভাবে অধ্যারোপ দেখানো হলো।।১৩৬।।

অপবাদ বর্ণনা

অপবাদঃ নাম—রজ্জুবিবর্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাত্রত্ববৎ বস্তু-বিবর্তস্য অবস্তুনঃ অজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুমাত্রত্বম্।।১৩৭।।

রজ্জুর বিবর্ত সর্প যেমন রজ্জুমাত্র, সেরূপ বস্তুর বিবর্ত যে অজ্ঞানাদি সকল জড়পদার্থ, তাও বস্তু মাত্রই, এইরূপ নিশ্চয় বুদ্ধির নাম অপবাদ ॥১৩৭॥

তদুক্তং সতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথাবিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্ত্বতোঽন্যথাপ্রথা বিবর্ত ইত্যুদাহৃতঃ। ইতি॥১৩৮॥

বলা হয়েছে যে, বস্তুর স্বরূপ অন্য প্রকার অবস্থা গ্রহণ করলে তাকে বিকার বলে, আর বস্তুস্বরূপ ত্যাগ না করে অন্যরূপে প্রতিভাত হওয়াকে বিবর্ত বলে॥১৩৮॥

অমৃত টীকা ঃ আত্মবস্তুতে মিথ্যাবস্তুর অধ্যারোপ কথা সামান্য-বিশেষভাবে বলে এখন অপবাদের কথা বলতে গিয়ে লৌকিক দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হলো। অসঙ্গ উদাসীন পরমাত্ম-বস্তুর বিবর্তভূত অজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে সমূহ জড় জগৎ পর্যন্ত সকল কিছুই স্বরূপত আধার চৈতন্যমাত্রই; দৃশ্য অদৃশ্য জগতের আধারভূত চৈতন্যই বস্তু, বাকি সব অবস্তু, মিথ্যা—এরূপ বোধ করাকেই অপবাদ বলা হলো। দৃষ্টান্ত ঃ রজ্জুসর্প। রজ্জুই সত্য, তার বিবর্ত হলো সর্প। সর্প বাস্তবিক হয়নি, যখন ভুলক্রমে সাপ দেখা যায়, তখনও রজ্জু অধিষ্ঠানই সত্য বস্তু, সাপ অবস্তু—মিথ্যা, তথাপি দেখায়। এভাবে রজ্জু নিজ স্বরূপ ত্যাগ না করে, সাপের আকারে তার যে প্রকাশ, তাকে বিবর্ত বলা হয়। রজ্জু হলো অধিষ্ঠান; ভ্রমের অধিষ্ঠান না থাকলে ভ্রম হয় না। ভ্রমের অধিষ্ঠানকে দেখলে ভ্রম চলে যায়—একেই বলে অপবাদ। যেমন রজ্জুকে দেখতে পেলেই সর্পভ্রান্তি চলে যায়। তেমনি অজ্ঞানাদি সকল জড় জগতের আধারভূত, বিবর্ত অধিষ্ঠানভূত চৈতন্যকে দেখলেই সকল ভ্রান্তির অবসান হয়—চিন্মাত্রতাই অবশেষে থাকে। অজ্ঞানাদি সকল প্রপঞ্চের নাশ হয় তখনই। এই অপবাদ বোঝাতে গিয়ে জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে দুইটি মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমটি বিবর্তবাদ, দ্বিতীয়টি পরিণামবাদ।

বিবর্তবাদ অদ্বৈত বেদান্ত সম্মত। এতে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ জগতের আধার যে শুদ্ধ চৈতন্য, তাকে একমাত্র সত্তা বলে স্বীকার করা হয়। এই শুদ্ধসত্তারূপ অধিষ্ঠানে সূক্ষ্ম ও স্থূল জগতের ভ্রম হয়। ভ্রমের কারণ যে অজ্ঞান, তাকে কারণ-শরীর, অব্যক্ত, অব্যাকৃত, প্রকৃতি, শক্তি, অবিদ্যা প্রভৃতি নামে বলা হয়। ভ্রমের অধিষ্ঠান শুদ্ধ অনুপহিত চৈতন্য। সমষ্টি মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর, সমষ্টি সূক্ষ্মভূতোপহিত চৈতন্য 'হিরণ্যগর্ভ' আর সমষ্টি স্থূলভূতোপহিত চৈতন্য—

'বিরাট'। ব্যষ্টি মায়োপহিত চৈতন্য 'প্রাজ্ঞ', ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরোপহিত চৈতন্য 'তৈজস' ও ব্যষ্টি স্থূলশরীরোপহিত চৈতন্য 'বিশ্ব' নামে অভিহিত হয়। অপবাদের বেলায় এই বিশ্ব-বৈশ্বানর, তৈজস-হিরণ্যগর্ভ ও প্রাজ্ঞ-ঈশ্বর সবই আধারভূত শুদ্ধ চৈতন্য অধিষ্ঠানে দেখায় মাত্র—বাস্তবিক সত্তা শুদ্ধ চৈতন্যমাত্র, বাকি সবকিছু মিথ্যা, অজ্ঞানপ্রসূত ভ্রান্তিমাত্র। অতএব জীব বলে যে-ভিন্নতাবোধ তা মিথ্যা; ব্রহ্মই সত্য—জীব ও ব্রহ্ম এক। এই হলো অদ্বৈতবাদ।

এই অদ্বৈতবাদ বোঝাতে গিয়ে পরিণাম ও বিবর্তের যে-সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তা মূলে বলা হয়েছে। অদ্বৈতবাদ ভিন্ন সকল মতই পরিণামবাদ। অতএব অদ্বৈতবেদান্তে পরিণামবাদ স্বীকৃত হয়নি। দুধ দই-এ পরিণত হওয়ার মতো ব্রহ্ম জগৎ হলে ব্রহ্মের অনিত্যতা দোষ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিবর্তবাদ পক্ষে সে দোষ হয় না। এ কারণে অধিষ্ঠানভূত শুদ্ধ চৈতন্য উপলব্ধি করলে কল্পিত সৃষ্টির নাশ হয়; জীব নিজ স্বরূপ ব্রহ্মত্ব উপলব্ধি করে মুক্ত হয়।।১৩৮।।

অপবাদপ্রসঙ্গ

তথাহি খলু উচ্যতে। যথা এতদ্ ভোগায়তনং চতুর্বিধ-স্থূলশরীরজাতং এতদ্‌ভোগ্যরূপ-অন্নপানাদিকং এতদ্ আশ্রয়-ভূত - ভূঃ-আদি-চতুর্দশ-ভুবনানি এতদ্ আশ্রয়ভূতং ব্রহ্মাণ্ডং চ এতৎ সর্বং এতেষাং কারণরূপ-পঞ্চীকৃত-ভূতমাত্রং ভবতি।।১৩৯।।

[জগৎপ্রপঞ্চ যেভাবে স্ব স্ব কারণে লীন হয়ে ব্রহ্মমাত্রে অবশিষ্ট থাকে] তা-ই বলা হচ্ছে— যেমন ভোগের আধার এই চার প্রকার শরীর [সকল জীব দেহ] এবং (জীবের) ভোগ্য এই যে অন্নপানাদি এবং এই সকলের (জীবশরীর ও ভোগ্য পদার্থের) আশ্রয়ভূত এই যে চতুর্দশ ভুবনের আশ্রয় যে ব্রহ্মাণ্ড— এই সকলই এদের কারণ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতমাত্রই। (অর্থাৎ ঐগুলি অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে লয় প্রাপ্ত হয়)।।১৩৯।।

অমৃত টীকা : অপবাদস্বরূপ এখানে বোঝানো হলো। সৃষ্টির ক্রম যেভাবে বলা হয়েছিল ঠিক তার বিপরীতক্রমে কার্যপদার্থগুলিকে কারণে লয় করতে করতে শেষ পর্যন্ত আধারভূত ব্রহ্মমাত্রই থাকে। স্থূলকে সূক্ষ্মে, সূক্ষ্মকে কারণে, কারণকে মহাকারণে লয়—এইটি বেদান্তের সাধনপ্রক্রিয়া। নিজ শরীর ও অন্যান্য প্রাণীদের শরীর এবং শরীরের পুষ্টি বৃদ্ধির কারণ যে খাদ্যাদি, এই

সব এবং এ সকলের আশ্রয় যে পৃথিবী প্রভৃতি লোকসকল, এ সবই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত—আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি থেকে হয়েছিল। অতএব এগুলিকে পঞ্চভূতে লয় ভাবনা করা হলো।।১৩৯।।

এতানি শব্দ-আদি-বিষয়-সহিতানি পঞ্চীকৃত-ভূতজাতানি সূক্ষ্মশরীর-জাতং চ এতৎ সর্বং এতেষাং কারণরূপম্ অপঞ্চীকৃতভূতমাত্রং ভবতি।।১৪০।।

শব্দাদি বিষয়ের সঙ্গে এই সকল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত ও সূক্ষ্মশরীর-সকল (১৭টি অবয়ববিশিষ্ট) তাদের কারণ অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতমাত্রই। (অর্থাৎ ঐগুলি অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে লীন হয়) ।।১৪০।।

এতানি সত্ত্বাদিগুণসহিতানি অপঞ্চীকৃত-পঞ্চভূতানি উৎপত্তিব্যুৎক্রমেণ এতৎ কারণভূত-অজ্ঞান-উপহিত-চৈতন্যমাত্রং ভবতি।।১৪১।।

এই অপঞ্চীকৃত ভূতগুলি সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের সঙ্গে যে-ক্রমে উৎপন্ন হয়েছিল তার বিপরীত ক্রমে (আকাশ বায়ু তেজ জল ও ক্ষিতি এই ক্রমে উৎপন্ন হয়েছিল এর বিপরীত ক্রমে অর্থাৎ ক্ষিতি অপে, অপ্ তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে—এই ক্রমে লীন হয় বলে) এদের কারণ অজ্ঞান-উপহিতচৈতন্য মাত্রই।।১৪১।।

অমৃত টীকা ঃ পরে এই পঞ্চভূত, আমাদের সূক্ষ্মশরীরগুলি ও শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ যেভাবে অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের সত্ত্বাদিগুণ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল সেগুলিকে তাদের কারণভূত অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতে লয় ভাবনা করা। এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত তন্মাত্রা আবার যে-ক্রমে উৎপন্ন হয়েছিল তার বিপরীত ক্রমে লয় করলে অজ্ঞান-উপহিত-চৈতন্যমাত্র থাকে। অর্থাৎ গন্ধ তন্মাত্রাত্মিকা পৃথিবী বা ক্ষিতি রস তন্মাত্রাত্মিকা জলে, জল রূপতন্মাত্রাত্মিকা তেজে, তেজ স্পর্শতন্মাত্রাত্মিকা বায়ুতে, বায়ু শব্দতন্মাত্রাত্মিকা আকাশে, শব্দ তন্মাত্রাত্মিকা আকাশ তৎকারণ মায়াতে লীন হয়।।১৪১।।

এতদ্ অজ্ঞানং অজ্ঞান-উপহিতং চৈতন্যং চ ঈশ্বরাদিকং এতদ্ আধারভূত-অনুপহিত-চৈতন্যরূপং তুরীয়ং ব্রহ্মমাত্রং ভবতি।।১৪২।।

এই অজ্ঞান, এবং অজ্ঞান-উপহিত চৈতন্য ঈশ্বর প্রভৃতি এদের আধারভূত অনুপহিত চৈতন্যরূপে তুরীয় ব্রহ্মমাত্রই হয়।।১৪২।।

অমৃত টীকা : মায়া চৈতন্যে আশ্রিতা—অধিষ্ঠানভূত সেই চৈতন্যকে প্রত্যক্ষ করলেই মায়ার তিরোধান ঘটে। তখন শুদ্ধ চৈতন্য-মাত্রই অবশেষ থাকেন। বেদান্ত তাই মায়া, মায়োপহিত চৈতন্য ও ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, প্রাজ্ঞ, তৈজসাদিকে পারমার্থিক সত্য বলেন না। তাদের ব্যবহারিক সত্তা আছে স্বীকার করেন। মহাভারতে বলা হয়েছে—

জগৎপ্রতিষ্ঠা দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে,
জ্যোতিষ্যাপঃ প্রলীয়ন্তে জ্যোতির্বায়ৌ প্রলীয়তে।
বায়ুশ্চ লীয়তে ব্যোম্নি তচ্চাব্যক্তে প্রলীয়তে।
অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মনিষ্কলে সম্প্রলীয়তে।। ইতি [মহাঃ ভাঃ ১২।৩৪১ অঃ]

কঠ উপনিষদেও বলা হয়েছে ঃ— পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।। [কঠ ৩।১১] এই অবস্থালাভকেই মুক্তি বলা হয়।।১৪২।।

অধ্যারোপ ও অপবাদের ফল এবং তৎপদের বাচ্য ও লক্ষ্যার্থ কথন

আভ্যাম্ অধ্যারোপ-অপবাদাভ্যাং তত্ত্বম্-পদার্থ-শোধনম্ অপি সিদ্ধং ভবতি।।১৪৩।।

এই অধ্যারোপ ও অপবাদের দ্বারা তৎ ও ত্বম্ পদার্থের শোধনও সিদ্ধ হয়।।১৪৩।।

অমৃত টীকা : এভাবে অধ্যারোপ অর্থাৎ সৃষ্টির ক্রম অনুসারে ঈশ্বর থেকে সৃষ্টির ভাবনা ও বিপরীত ক্রম অনুসারে সকল সৃষ্টির কার্য থেকে কারণক্রমে ব্রহ্মপর্যবসান চিন্তার দ্বারা 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থের শোধন হয়। শোধন করার অর্থ হলো, যথার্থ ভাব ধারণা করা।।১৪৩।।

তথাহি-অজ্ঞানাদিসমষ্টিঃ এতদুপহিতং সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং চৈতন্যং, এতদনুপহিতং চৈতন্যং চ এতৎ ত্রয়ং তপ্ত-অয়ঃপিণ্ডবৎ একত্বেন অবভাসমানং তৎপদ-ব্যাচ্যার্থঃ ভবতি।।১৪৪।।

যেমন—সমষ্টি অজ্ঞান প্রভৃতি (সমষ্টি স্থূল ও সূক্ষ্ম) অজ্ঞানাদি উপাধি উপহিত সর্বজ্ঞত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্য এবং এই সকল উপাধির দ্বারা উপহিত নয় এমন যে অনুপহিত চৈতন্য—এই তিনটি একত্রে তপ্ত লোহার মতো যখন এক বলে বোধ হয়, তখন 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ হয় ।।১৪৪ ।।

এতৎ উপাধি-উপহিত-আধারভূতম্ অনুপহিতং চৈতন্যং তৎপদলক্ষ্যার্থঃ ভবতি।।১৪৫।।

এবং ঐসকল উপাধি ও উপহিতের আধারস্বরূপ অনুপহিত (কেবল) চৈতন্য 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ হয় ।।১৪৫ ।।

অমৃত টীকা ঃ শোধনের রূপটি ব্যাখ্যা করে দুভাবের অর্থ পাওয়া যায়। একটি হলো বাচ্যার্থ, অপরটি লক্ষ্যার্থ। বাচ্য অর্থ হলো, বাক্যের পদসমূহের দ্বারা সহজভাবে যে অর্থ পাওয়া যায়। আর লক্ষ্যার্থ হলো, বাচ্যার্থ সঙ্গত না হলে পদসমূহের দ্বারা যে-অর্থ লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের বাচ্য অর্থ কি তা বিভাগ করে মূলে বলেছেন। 'তৎ' অর্থে 'সেই'। 'সেই' বলতে এখানে বোঝাচ্ছে সমষ্টি অজ্ঞান, সমষ্টি অজ্ঞান উপহিত চৈতন্য (ঈশ্বর) ও এই উভয়ের আশ্রয়ভূত অনুপহিত স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত অক্ষর শব্দবাচ্য চিন্মাত্র, এই তিনকে একত্রে মিশিয়ে 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ। উপমা দিয়ে বুঝিয়েছেন, যেমন আগুন আর লোহা ভিন্ন হলেও, লোহা ও আগুনকে একত্রে মিশিয়ে আমরা বলি, লোহায় হাত পুড়েছে। লোহায় হাত পোড়ে না, আগুনে পোড়ে। লোহা অগ্নিতে উত্তপ্ত হয়েছে, আগুন আর লোহাকে এক করে বলা হয়েছে; লোহায় হাত পুড়েছে—এ হলো বাচ্যার্থ। আর লক্ষ্যার্থ হলো, আগুনে হাত পুড়েছে; লোহাটা সেখানে পোড়াবার হেতু নয়। তেমনি 'তৎ' বলতে পূর্বোক্ত তিনটি হলেও আসল তত্ত্বটি চৈতন্যমাত্র। 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ কেবল চৈতন্য। বাকি, অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্য অধ্যারোপিত হয়েছে। অজ্ঞানাদির 'আদি' পদে সমষ্টি হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটকেও বাচ্যার্থে ধরা হয়েছে। 'ত্বম্' পদে তেমনি, অজ্ঞানাদি ব্যষ্টি; এখানে 'আদি' পদে সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলশরীর এবং এ দুয়ের আশ্রয় যে প্রত্যক্ চৈতন্য—জীবের অন্তরতম যিনি, অনুপহিত চৈতন্য; এই তিন তপ্ত অয়ঃপিণ্ডের মতো একত্রে গৃহীত হয়েছে ত্বম্ পদের বাচ্যার্থে। লক্ষ্যার্থে কেবল অনুপহিত প্রত্যক্ চৈতন্যকে বোঝায়। উভয় ক্ষেত্রেই অর্থাৎ 'তৎ' ও 'ত্বম্' এর ক্ষেত্রে যথাযোগ্য অব্যাকৃত, সমষ্টি স্বপ্ন ও জাগরণ এবং ব্যষ্টি সুষুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগরিতাবস্থা—এই অবস্থা তিনটি গৃহীত হয়েছে বাচ্যার্থে। অজ্ঞান ও তার কার্য সমস্ত প্রপঞ্চের সত্তা ও স্ফূর্তি (বোধ) প্রদাতা ও আনন্দরূপে

অনুস্যূত অদ্বয়াত্মক সৎ-চিৎ-আনন্দ বস্তুই এর লক্ষ্যার্থ। এবং দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি প্রাণ অহংকার ও এর ধর্ম যে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়—এ সকল থেকে আলাদা, অথচ এ-সকলের সাক্ষী যে চিদ্ধাতু, তাই 'ত্বম্' পদের লক্ষ্যার্থ বলা হয়েছে। এ মত বিদ্বন্মনোরঞ্জনীর।

বালবোধিনী টীকায় অজ্ঞানাদির 'আদি' পদে অজ্ঞান যার নিরূপক সেই ঈশ্বর, সমষ্টির বিষয় যিনি, এরূপ অর্থ করেছেন। আরো বলেছেন, 'আদি' পদে সমষ্টি লিঙ্গশরীর যে হিরণ্যগর্ভ, তিনি জীব; প্রথমোৎপন্ন বলে ত্বম্ পদের বাচ্যার্থ হন, 'তৎ' পদের নয়। এখানে 'আদি' পদে সর্বজ্ঞ সর্বনিয়ন্তা প্রভৃতি বোঝায়। 'চৈতন্যম্' পদে ঈশ্বর চৈতন্যকে 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ রূপে ধরা হয়েছে।

বালবোধিনীর মতই সমীচীন প্রতীত হয়। 'তত্ত্বম্ অসি' এই মহাবাক্যকে এভাবে বিশ্লেষণ করে 'জীব ও ব্রহ্ম এক চৈতন্য' এরূপ অনুভব করাই বেদান্তের মুখ্য উদ্দেশ্য। এজন্য 'তৎ' পদের ও 'ত্বম্' পদের অর্থ যথাযথ বোঝার প্রয়োজন রয়েছে। এই যথাযথ বোঝাকেই শোধন বলা হয়েছে।।১৪৫।।

ত্বং পদের বাচ্য ও লক্ষ্যার্থ

অজ্ঞানাদি-ব্যষ্টিঃ এতদ্ উপহিত-অল্পজ্ঞত্বাদি-বিশিষ্টং চৈতন্যং এতদ্ অনুপহিতং চ এতৎ ত্রয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ একত্বেন অবভাসমানং ত্বম্ পদ বাচ্যার্থঃ ভবতি।।১৪৬।।

এতদ্ উপাধি-উপহিত-আধারভূতম্ অনুপহিতং প্রত্যক্ আনন্দরূপং তুরীয়ং চৈতন্যং ত্বং-পদ-লক্ষ্যার্থঃ ভবতি।।১৪৭।।

ব্যষ্টি অজ্ঞান প্রভৃতি (উপাধি), এদের দ্বারা উপহিত অল্পজ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য (যাকে প্রাজ্ঞ বলা হয়েছে) এবং (এই দুয়ের) এদের দ্বারা অনুপহিত চৈতন্য—এই তিনটি পদার্থ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের মতো এক বলে জ্ঞানের বিষয় হলে হয় 'ত্বম্' পদের বাচ্যার্থ এবং ঐ উপাধি ও উপহিতের আধারভূত যে অনুপহিত অন্তরাত্মা আনন্দরূপ তুরীয় চৈতন্য, তা-ই 'ত্বম্' পদের লক্ষ্যার্থ হয়।।১৪৬-১৪৭।।

অমৃত টীকা : এ বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই হয়েছে, তথাপি বিশেষ কথা একটু আছে।

এখানে অজ্ঞানাদি বলতে ব্যষ্টিভূত অন্তঃকরণকে ধরতে হবে, কারণ সৃষ্টি সমষ্টি অজ্ঞান থেকে হয়েছে এবং অন্তঃকরণ মায়ার পরিণামভূত পঞ্চভূতের সম্মিলিত সত্ত্বাংশ থেকে হওয়ায় কার্য ও কারণ একরূপ বলে 'অজ্ঞান' পদে এখানে অন্তঃকরণ ধরতে হবে। 'ত্বম্' পদের বাচ্যার্থ হবে অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণ অবচ্ছিন্ন বা প্রতিবিম্বিত জীবচৈতন্য এবং তদ্ অনুপহিত চৈতন্য, এই তিন। এবং লক্ষ্যার্থ হবে, অন্তঃকরণোপহিত জীব চৈতন্যের আধারভূত অনুপহিত অন্তরতম তুরীয় চৈতন্য ॥১৪৬-১৪৭॥

মহাবাক্যার্থের বিচার

অথ মহাবাক্যার্থঃ বর্ণ্যতে ইদং 'তত্ত্বমসি' বাক্যং সম্বন্ধত্রয়েণ অখণ্ডার্থবোধকং ভবতি॥১৪৮॥

এখন মহাবাক্যের অর্থ বর্ণনা করা হচ্ছে। এই 'তৎ ত্বম্ অসি' বাক্যটি তিন প্রকার সম্বন্ধের দ্বারা অখণ্ড অর্থের জ্ঞাপক হয়॥১৪৮॥

অমৃত টীকা ঃ মহাবাক্য বলতে বোঝায় সেই সকল উপনিষদ্-বাক্য যাতে জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য বোঝায়। মহাবাক্য চারটি 'অহং ব্রহ্মাস্মি', 'তত্ত্বমসি', 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'।

বাক্য দুপ্রকার। সংসৃষ্টার্থ ও অখণ্ডার্থ বোধক। সংসৃষ্টার্থ হলো, যাতে সম্বন্ধ বোধ জন্মায়। যেমন 'গরু আনয়ন কর' বললে, গরু পদের সঙ্গে আনয়ন, ইত্যাদি পদ-সম্বন্ধ স্পষ্ট। কিন্তু যদি বলা যায়, 'প্রকৃষ্ট প্রকাশ চন্দ্র' তবে সম্বন্ধ বোধ জন্মায় না। এর এরূপ অর্থ হয়, যেটি উজ্জ্বল প্রকাশ সেটি চন্দ্র। চন্দ্রের স্বরূপমাত্র এখানে প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য স্থলে অখণ্ডার্থে পদগুলি প্রযুক্ত।

কোন বাক্যে পদগুলি পৃথক পৃথক হলেও একত্রিত হয়ে একটি বস্তুর স্বরূপকে বোঝায় অথবা সংসর্গ বোঝায়। যোগ্যতা, আসক্তি ও আকাঙ্ক্ষা অনুসারে পদগুলি উচ্চারিত হলেই বাক্য অর্থকে প্রকাশ করবে, নতুবা তা শব্দমাত্রই থাকবে। সম্বন্ধ জ্ঞানের অন্তরায় না থাকার নাম যোগ্যতা। 'জল আগুন' এই বাক্যে যোগ্যতা নেই। পর পর উচ্চারণের নাম আসক্তি। এখন 'আমি' বলে ১০ মিনিট পর যদি কেউ বলে 'যাব'—তবে তা অর্থকে প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়। একে বলে আসক্তি—শব্দগুলি পর পর উচ্চারিত হবে। তৃতীয় আকাঙ্ক্ষা—জিজ্ঞাসার উদ্রেক থাকার নাম আকাঙ্ক্ষা। আমি 'ভাত' বললে আকাঙ্ক্ষা জাগে, ভাত কি করবে? 'খাব?' না, 'দান করব'? এরূপ আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই তিন যেখানে পূর্ণ হয়, সেখানে

বাক্য সার্থক হয়। একেই বাচ্যার্থ বলে। বাক্যে পদসমষ্টির সরাসরি অর্থের দ্বারা সঙ্গত ভাব প্রকাশ হলেই বাচ্যার্থ হয়। আর যেখানে এভাবে পর পর যোগ্য শব্দগুলি উচ্চারিত হলেও অর্থ অসঙ্গত হয়, সেখানে অর্থের সঙ্গতি রক্ষার জন্য পদের খানিক ছেড়ে, কোথাও বা কিছু পদ যোজনা করে অর্থগ্রহ করতে হয়। এই ছেড়ে দেওয়া বা যোজনা করাকে লক্ষণা বলে। লক্ষণার দ্বারা যে অর্থ করা হয়, তাকে লক্ষ্যার্থ বলে।।১৪৮।।

সম্বন্ধত্রয়ং নাম পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যম্, পদার্থয়োঃ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ, প্রত্যগাত্মপদার্থয়োঃ লক্ষ্য-লক্ষণ-ভাবশ্চ ইতি।।১৪৯।।

সম্বন্ধ তিনটি হলো ঃ— পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্য, পদার্থ দুইটির বিশেষণ-বিশেষ্যভাব,পদার্থ দুইটি ও প্রত্যগাত্মার লক্ষ্য-লক্ষণভাব সম্বন্ধ।।১৪৯।।

যদুক্তং—

সামানাধিকরণ্যঞ্চ বিশেষণবিশেষ্যতা।
লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধঃ পদার্থপ্রত্যগাত্মনাম্।।
ইতি।।১৫০।।

যেমন উক্ত হয়েছে—সামানাধিকরণ্য, বিশেষণ বিশেষ্যতা, পদার্থ ও প্রত্যগাত্মার লক্ষ্য-লক্ষণভাব।।১৫০।।

অমৃত টীকা ঃ সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ হয় পদগুলির মধ্যে পদের অর্থের মধ্যে হয় বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব সম্বন্ধ এবং পদের অর্থের লক্ষণায় যে প্রত্যক্ বস্তুর ধারণা আসে তাতে হয় লক্ষ্যলক্ষণার অখণ্ডার্থ বোধ। এই তিনভাবে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ করার প্রয়াস কেবল বাক্যার্থের শোধনের জন্য।।১৫০।।

সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধের পরিচয়

সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধঃ তাবৎ যথা—'সঃ অয়ং দেবদত্তঃ' ইতি বাক্যে তৎকাল-বিশিষ্ট-দেবদত্তবাচক-স-শব্দস্য এতৎকাল-বিশিষ্ট-দেবদত্ত-বাচক-অয়ং-শব্দস্য চ একস্মিন্ দেবদত্তপিণ্ডে তাৎপর্য-সম্বন্ধঃ, তথা তত্ত্বমসি বাক্যে অপি পরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্ট-চৈতন্যবাচক-তৎ-পদস্য অপরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্ট-চৈতন্যবাচক-ত্বং পদস্য চ একস্মিন্ চৈতন্যে তাৎপর্য সম্বন্ধঃ।।১৫১।।

সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ হলো—যেমন 'সেই এই দেবদত্ত'—এই বাক্যে তৎকালবিশিষ্ট (অতীতকালে যে দেবদত্তকে দেখা গিয়েছিল, 'সেই' শব্দে অতীতকালকে বোঝানো হয়েছে) দেবদত্তের বাচক 'সেই' শব্দের এবং এতৎকাল-বিশিষ্ট (অয়ং শব্দে বর্তমানকালকে সূচিত করছে) দেবদত্তের বাচক 'এই' শব্দের একই দেবদত্তের শরীরে তাৎপর্য সম্বন্ধ (দেবদত্তকেই বোঝায়) তেমনি তৎ (সেই) ত্বম্ (তুমি) অসি (হও) বাক্যেও পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যবাচক 'তৎ' পদের এবং অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যবাচক 'ত্বম্' পদের একই তাৎপর্য সম্বন্ধ ॥১৫১॥

অমৃত টীকা ঃ সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ হলো, পদগুলি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বাচক হয়েও যখন একটিকেই নির্দেশ করে পর্যবসিত হয় তখন বাক্যস্থিত পদসকলের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ হয়। সমান অধিকরণ। পদগুলির আশ্রয় সমান। যেমন 'সেই এই দেবদত্ত'—এই বাক্যে সেই বলতে আগে, অতীতকালে, ভিন্ন জায়গায় দেখা যে দেবদত্ত, 'এই' পদে বর্তমানকালে, সন্নিহিত জায়গায় দেখা যে দেবদত্ত—একই দেবদত্ত। এখানে 'সেই' ও 'এই' পদ ভিন্ন কাল, ভিন্ন দেশের বাচক হয়েও এক দেবদত্তরূপে আশ্রয় পেল, অধিকরণ সমান হলো, এই সম্বন্ধকে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ বলা হয়।

আলোচ্য তত্ত্বমসি পদের ক্ষেত্রেও 'তৎ' পদের অর্থ 'সেই'—যিনি শাস্ত্রের সর্বজ্ঞ সর্বনিয়ন্তা ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত ঈশ্বর, যিনি অখিল সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্তা তিনি; তিনি তাই পরোক্ষ চৈতন্য। দূরবর্তী পদার্থই পরোক্ষ। ত্বম্ অর্থে 'তুমি'। এখানে 'তুমি' বলতে অপরোক্ষ—যিনি কাছের সেই জীব, যিনি নিজেকে 'আমি' বলে বোধ করছেন, এই দুই চৈতন্য একই চৈতন্য—এভাবে যে তাৎপর্য সম্বন্ধে অর্থ করা, তাকে সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে অর্থ বোধ করা বলে বুঝতে হবে। কিন্তু এভাবে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ হবে না—এ বিষয়ে পরে আলোচিত হবে॥১৫১॥

বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধ

বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাব-সম্বন্ধঃ তু যথা তত্র এব বাক্যে স-শব্দার্থ-তৎকাল-বিশিষ্ট-দেবদত্তস্য অয়ং শব্দার্থ এতৎ-কাল-[illegible]-দেবদত্তস্য চ অন্যোন্যভেদ-ব্যবর্তকতয়া বিশেষণ-বিশেষ্য-[illegible] তথা অত্রাপি বাক্যে তৎ-পদার্থ-পরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্ট-

চৈতন্যস্য ত্বং-পদার্থ-অপরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্ট - চৈতন্যস্য চ অন্যোন্যভেদ-ব্যবর্তকতয়া বিশেষণ-বিশেষ্যভাবঃ।।১৫২।।

বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সম্বন্ধ—যেমন, সেই বাক্যেই (সোঽয়ং দেবদত্তঃ) 'সঃ' শব্দের অর্থ তৎকালবিশিষ্ট দেবদত্ত, এবং 'অয়ং' শব্দের অর্থ যে এতৎকাল-বিশিষ্ট দেবদত্ত, তাদের পরস্পরের (কাল ও স্থান সম্বন্ধী) ভেদ ব্যবর্তক (নিষেধ) করে বিশেষণ বিশেষ্য-ভাব সম্বন্ধ হয়। সেরূপ এই (তত্ত্বমসি) বাক্যে তৎ-পদের অর্থ পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য এবং 'ত্বম্' পদের অর্থ অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যের পরস্পরের ভেদ (পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্ব) নিষেধ করে বিশেষণ-বিশেষ্য ভাব (হয়)।।১৫২।।

অমৃত টীকা ঃ ব্যবর্তক পদটি বিশেষণ। যার প্রতি বিশেষণ প্রযুক্ত, সেটি ব্যবর্ত—বিশেষ্য। বিশেষ্যকে বিশেষিত করে বিশেষণ, বিশেষণযোগ্য পদটি বিশেষ্য অর্থাৎ বিশেষিত হবার যোগ্য। এখানে 'সেই এই দেবদত্ত' বাক্যে 'সেই' পদ 'এই' পদকে এবং 'এই' পদ 'সেই' পদকে, পরস্পর পরস্পরকে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে নির্দেশ করে এক দেবদত্তকে বোঝাচ্ছে। কি রকম দেবদত্ত? না, যিনি অতীতকালে, ভিন্ন দেশে দৃষ্ট, আর বর্তমানে, এই স্থলে দেখা যে-দেবদত্ত, সে একই দেবদত্ত। এভাবে অতীতকালে ও ভিন্নদেশস্থ দেবদত্তকে বিশেষিত করে এইকাল ও এই দেশস্থ দেবদত্ত, এবং এইকাল এই দেশস্থ দেবদত্তকে বিশেষিত করছে ঐ কাল ও ঐদেশস্থ দেবদত্ত—এভাবে পরস্পর পরস্পরের ভেদকে বিশেষণ বিশেষ্যভাবে সম্বন্ধিত করে অখণ্ড দেবদত্তকে বোঝাচ্ছে। এভাবে তৎ ও ত্বম্ পদদ্বয় এক চৈতন্যকে—পরোক্ষ ও অপরোক্ষরূপে বিশেষণে বিশেষিত করে অখণ্ডার্থের জ্ঞাপক হচ্ছে। অর্থাৎ যিনি পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যরূপে বিশেষিত, তিনিই অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট আবার যিনি অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট তিনিই পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্য—একই চৈতন্য।

বিশেষণ সজাতীয় বস্তুর মধ্যে ভেদ করে। সাদা গোলাপ বললে, সাদা বিশেষণ সমজাতীয় বিভিন্ন বর্ণের গোলাপকে ভেদ করে বোঝায়। এখানে তৎ ও ত্বম্ পরস্পর পরস্পরের ভেদ নিষেধ করছে। কি রকম অপরোক্ষ? না, পরোক্ষত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট যিনি। আবার কি রকম পরোক্ষ? না, অপরোক্ষত্বাদি যিনি—এভাবে পরস্পর পরস্পর ভেদকে নিষেধ করে অখণ্ড চৈতন্যকে,

নির্বিশেষ চৈতন্যকেই বিষয় করছে। কিন্তু এভাবে তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ সঙ্গত হয় না—এ বিষয়ে আলোচনা পরে হবে।।১৫২।।

লক্ষ্য-লক্ষণভাব-সম্বন্ধ

লক্ষ্য-লক্ষণভাব সম্বন্ধঃ তু যথা তত্রৈব স-শব্দ অয়ং-শব্দয়োঃ তৎ অর্থয়োঃ বা বিরুদ্ধ-তৎকাল-এতৎকাল-বিশিষ্টত্ব-পরিত্যাগেন অবিরুদ্ধ-দেবদত্তেন সহ লক্ষ্য-লক্ষণভাবঃ, তথা অত্রাপি বাক্যে তৎ-ত্বম্ পদয়োঃ তদর্থয়োঃ বা বিরুদ্ধ-পরোক্ষত্ব-অপরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্টত্ব-পরিত্যাগেন অবিরুদ্ধচৈতন্যেন সহ লক্ষ্য-লক্ষণ-ভাবঃ।।১৫৩।।

লক্ষ্য-লক্ষণভাব সম্বন্ধ—যেমন সেই বাক্যেই (সঃ অয়ং দেবদত্তঃ) 'সঃ' শব্দ ও 'অয়ং' শব্দ অথবা সঃ শব্দের বা অয়ং শব্দের অর্থ, যেমন বিরুদ্ধ তৎ (অতীত) কাল-বিশিষ্টত্ব ও এতৎ (বর্তমান) কাল- বিশিষ্টত্বকে পরিত্যাগ করে অবিরুদ্ধ দেবদত্ত পদের (বা অর্থের) লক্ষ্য-লক্ষণভাব হয়, সেই রকম এই বাক্যেও (তত্ত্বমসি) 'তৎ' পদ ও 'ত্বম্' পদের অথবা তাদের অর্থের বিরুদ্ধ পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্টত্বকে পরিত্যাগ করে অবিরুদ্ধ চৈতন্যের সঙ্গে লক্ষ্য-লক্ষণভাব সিদ্ধ হয়।।১৫৩।।

ইয়ম্ এব ভাগলক্ষণা ইতি উচ্যতে।।১৫৪।।

এরূপ লক্ষ্য লক্ষণভাবকেই ভাগলক্ষণা বলা হয়।।১৫৪।।

অমৃত টীকা ঃ শব্দ যাকে বোঝাতে প্রযুক্ত হয়, তাকে অভিধেয় বলে। অভিধেয়ের অবিনাভূত শব্দের প্রবৃত্তিকে লক্ষণা বলে। অর্থাৎ অভিধেয়কে বোঝাতে যে অসাধারণ ধর্মের উল্লেখ করা হয়, সেই ধর্ম ধরেই ধর্মী বস্তুকে বোঝা যায়। ধর্মটি বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন বলে অভিধেয় অবিনাভূত। এরূপ ধর্মে শব্দের যে প্রবৃত্তি তাকে লক্ষণা বলা হয়। আলোচ্যক্ষেত্রে 'সেই এই দেবদত্ত' বাক্যে 'সেই' পদ অতীতকাল এবং 'এই' পদ বর্তমান কালকে বোঝায়—এই অতীত ও বর্তমান কাল প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন হলেও একই দেবদত্ত শব্দে বা দেবদত্ত শব্দজ্ঞেয় দেবদত্ত ব্যক্তিকে বোঝায়। ব্যক্তি বা শব্দটিতে দুই পরস্পর ভিন্ন কালবাচক শব্দ আপন [illegible]র্থ ত্যাগ করে মিলিত—তারা এক দেবদত্তরূপকে প্রকাশ করে বলে একে [illegible]ক্ষণা বলা হলো। অর্থাৎ বাক্যের বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ করে অবিরুদ্ধাংশে অর্থ

হয়। 'তত্ত্বমসি' বাক্যেও সেরূপ বিরুদ্ধ তৎ ও ত্বম্ পদ ও পদার্থ আপন আপন বিরুদ্ধাংশ ছেড়ে অবিরুদ্ধ চৈতন্যাংশের প্রকাশক হয়। এই ভাগত্যাগ লক্ষণার দ্বারাই মহাবাক্যের অর্থ করা হয়।।১৫৩-১৫৪।।

এই কথাটি পরবর্তী আলোচনার দ্বারা বোঝানো হচ্ছে ঃ

ভাগলক্ষণার বিষয়ে আক্ষেপ

অস্মিন্ বাক্যে 'নীলম্ উৎপলম্' ইতি বাক্যবৎ বাক্যার্থো ন সঙ্গচ্ছতে।।১৫৫॥

এই 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'নীল উৎপল' এই বাক্যের মতো বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না।।১৫৫।।

তত্র নীলপদার্থ-নীলগুণস্য উৎপলপদার্থ-উৎপলদ্রব্যস্য চ শৌক্ল্য-পটাদিভেদব্যবর্তকতয়া অন্যোন্য-বিশেষণ-বিশেষ্যরূপ-সংসর্গস্য অন্যতর-বিশিষ্টস্য অন্যতরস্য বা তৎ ঐক্যস্য বাক্যার্থত্ব-অঙ্গীকরণে প্রমাণান্তর-বিরোধ-অভাবাৎ তদ্‌বাক্যার্থঃ সঙ্গচ্ছতে।।১৫৬।।

কারণ 'নীল উৎপল' বাক্যে 'নীল' (গুণ) রং সাদা প্রভৃতি রং থেকে নিজেকে বিশিষ্ট করেছে; আবার 'উৎপল' পদ অন্যান্য ফুল থেকে নিজেকে আলাদা করেছে। আবার 'নীল ও উৎপল' পদ সম্মিলিত হয়ে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষিত করে তাদের সংসর্গের ঐক্য বুঝিয়েছে এবং তা প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণ বিরুদ্ধ হচ্ছে না বলে এই 'নীল উৎপল' বাক্যার্থ সঙ্গত হয়।।১৫৬।।

অত্র তু তৎপদার্থ-পরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্ট-চৈতন্যস্য ত্বং-পদার্থ-অপরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্ট-চৈতন্যস্য চ অন্যোন্যভেদ-ব্যবর্তকতয়া বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবসংসর্গস্য, অন্যতর-বিশিষ্টস্য অন্যতরস্য বা তদৈক্যস্য বাক্যার্থত্ব-অঙ্গীকারে প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-বিরোধাৎ বাক্যার্থঃ ন সঙ্গচ্ছতে।।১৫৭।।

কিন্তু 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যে পরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ 'তৎ' পদের অর্থের, অর্থাৎ ঈশ্বরের এবং অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ 'ত্বম্' পদের

অর্থের অর্থাৎ জীবের পরস্পরের ভেদনিরোধক রূপে বিশেষণ-বিশেষ্য সম্বন্ধ। অর্থাৎ তৎ-পদ-বিশিষ্ট 'ত্বম্' বা ত্বম্-পদ-বিশিষ্ট 'তৎ' বা উভয়ের ঐক্যরূপ সংসর্গকে বাক্যের অর্থ স্বীকার করলে, তা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিরুদ্ধ হয়ে পড়ে বলে এভাবে বাক্যের অর্থ করা সম্ভব হয় না।।১৫৭।।

অমৃত টীকা ঃ এর সরল মানে দাঁড়াবে—ঈশ্বরবিশিষ্ট জীব বা জীববিশিষ্ট ঈশ্বর বা জীব ঈশ্বর এক—তা স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ প্রমাণবিরুদ্ধ অসম্ভব।

বিশেষণ বিশেষ্যভাবে পূর্বে যে সামান্যত তত্ত্বমসি বাক্যের অখণ্ডার্থ বলা হয়েছিল, তা যে অসম্ভব, তা বলা হচ্ছে। 'নীল পদ্ম' কথাটির অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। বিশেষণ দ্রব্যকে বিশেষিত করে অর্থাৎ সমজাতীয় পদার্থ থেকে ভিন্ন করে বিশেষ্যকে বিশেষিত করে দিচ্ছে। যেমন নীল (গুণ) রং সাদা, কালো প্রভৃতি রং থেকে নিজেকে বিশেষিত করেছে আবার পদ্ম বস্তুটি পদ্মভিন্ন সকল বস্তু থেকে নিজেকে আলাদা করেছে। এখন নীল ও পদ্ম একত্রে পদ্ম নীলকে, নীল পদ্মকে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সম্বন্ধে সম্বন্ধিত করে অর্থ বোঝাচ্ছে। কেমন নীল? না, পদ্ম. সংযুক্ত নীল—পট বা পটযুক্ত নয়; আবার কেমন পদ্ম? না, নীলগুণবিশিষ্ট পদ্ম। এভাবে নীল ও পদ্ম পরস্পর পরস্পরকে বিশেষিত করছে এবং এতে অন্য কোন প্রমাণ বিরোধ ঘটছে না। সুতরাং এখানে মানে হতে পারে বটে কিন্তু, 'তত্ত্বমসি' পদে এভাবে বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সম্বন্ধে মানে হয় না। তাতে প্রত্যক্ষাদি অত্যন্ত প্রমাণ বিরুদ্ধ হয়। তৎ শব্দের বাচ্য অর্থ সর্বজ্ঞ ঈশ্বর, সমষ্টি অজ্ঞান ও অনুপহিত চৈতন্য এবং ত্বম্ পদের অর্থ অল্পজ্ঞ জীব, ব্যষ্টি অজ্ঞান (অন্তঃকরণ) ও এদের দ্বারা অনুপহিত প্রত্যক্ চৈতন্য। তৎ কেমন করে ত্বম্ হবে? 'ত্বম্'-ই বা কেমন করে তৎ হবে? ঈশ্বর, যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই আবার কেমন করে অল্পজ্ঞ জীব হবেন? আবার অল্পজ্ঞ জীব তৎবিশিষ্ট অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হবেন? এতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিরোধ ঘটে যাচ্ছে। সুতরাং মানে হচ্ছে না। তৎ হলেন পরোক্ষ সর্বজ্ঞ-সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বর, তিনিই আবার অপরোক্ষত্ব, অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট হতে পারেন না বা বিপরীতক্রমে অপরোক্ষ স্বল্পজ্ঞ অল্পশক্তিমান জীব পরোক্ষত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট হতে পারে না। সুতরাং নীল উৎপলের মতো বিশেষ্য বিশেষণভাবে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ হবে না।।১৫৬-১৫৭।।

তদুক্তং—

"সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ। অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ।।" ইতি [পঞ্চদশী ৭।৭৫]।।**১৫৮**।।

এইজন্য বলা হয়েছে—'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের প্রকৃত অর্থ দুটি বিষয়ের (তৎ ও ত্বম্) ঐক্যরূপ সংসর্গও নয়, কিংবা তাদের মধ্যে বিশেষ্য বিশেষণ ভাবও নয়। পণ্ডিতদের মতে মহাবাক্যটি অখণ্ড অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্যমাত্রের অববোধক॥১৫৮॥

তত্ত্বমসি পদে জহল্লক্ষণা সম্পর্কে বিচার

অত্র তু গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি ইতি বাক্যবৎ জহৎ-লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে॥১৫৯॥

এখানে কিন্তু (এই তত্ত্বমসি বাক্যে) 'গঙ্গায় গোয়ালারা বাস করে' এই বাক্যের মতো জহল্লক্ষণাও সঙ্গত হয় না॥১৫৯॥

তত্র গঙ্গাঘোষয়োঃ আধার-আধেয়ভাব-লক্ষণস্য বাক্যার্থস্য অশেষতঃ বিরুদ্ধত্বাদ্ বাচ্যার্থম্ অশেষতঃ পরিত্যজ্য, তৎসম্বন্ধি তীর-লক্ষণায়াঃ যুক্তত্বাৎ জহৎ-লক্ষণা সঙ্গচ্ছতে॥১৬০॥

যেহেতু ঐ বাক্যে গঙ্গা ও গোয়ালা আধার আধেয়ভাব লক্ষণ বাক্যার্থের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ হয় বলে, ঐ বাক্যের বাচ্যার্থ সম্পূর্ণ ত্যাগ করে গঙ্গার সম্পর্কিত তীরপদে লক্ষণা যুক্তিসঙ্গত হয়॥১৬০॥

অত্র তু পরোক্ষত্ব - অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট - চৈতন্য-একত্বরূপস্য বাক্যার্থস্য ভাগমাত্রে বিরোধাৎ ভাগান্তরং পরিত্যজ্য অন্যলক্ষণায়া অযুক্তত্বাৎ জহৎ-লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে॥১৬১॥

তাই জহৎ লক্ষণা এখানে সঙ্গত হয়। কিন্তু এখানে তত্ত্বমসি বাক্যে পরোক্ষ ও অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যের একত্বরূপ বাক্যার্থের একাংশমাত্র বিরোধ হওয়ায় অপর অংশও পরিত্যাগ করে ভিন্ন অর্থে লক্ষণা অযৌক্তিক বলে জহৎ লক্ষণা সঙ্গত হবে না। (অপরিত্যজ্য কথা ধরলে মানে অপর অংশ পরিত্যাগ না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে লক্ষণা করা অযৌক্তিক বলে)॥১৬১॥

অমৃত টীকা : লক্ষণা তিন প্রকার। জহৎ, অজহৎ ও জহৎ-অজহৎ লক্ষণা। জহৎ শব্দের অর্থ ত্যাগ করা। 'গঙ্গায় গোয়ালারা বাস করে' এই বাক্য অসঙ্গত। কারণ গঙ্গাপদে গঙ্গার জলধারা যে নদী, তাকে বোঝায়। নদীতে

মানুষ বাস করতে পারে না। সুতরাং মুখ্যার্থ (বাচ্যার্থ) প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিরোধ হওয়ায় বাচ্যার্থ গ্রহণ করা গেল না। লক্ষণার সংজ্ঞা হলো—'মানান্তর বিরোধে তু মুখ্যার্থস্য অপরিগ্রহে। মুখ্যার্থেন অবিনাভূতে প্রবৃত্তির্লক্ষণা ইষ্যতে।' [বাক্যবৃত্তি ৪৯] অর্থাৎ 'অন্য প্রমাণ বিরুদ্ধ হলে যেখানে মুখ্যার্থ গ্রহণ করা যায় না, সেখানে মুখ্যার্থের সঙ্গে অভিন্ন সম্বন্ধে সম্বন্ধিত পদে বা শব্দের যে প্রবৃত্তি তাকে লক্ষণা বলে।' এখানে গঙ্গাপদের মুখ্যার্থ জলধারা গ্রহণ করা যায় না—কারণ তা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিরুদ্ধ। সুতরাং মুখ্যার্থ গঙ্গার সঙ্গে অবিনাভূত অর্থাৎ অভিন্ন সম্পর্কে সম্পর্কিত 'তীর' পদ অধ্যাহার করে লক্ষণায় অর্থ হবে, গঙ্গাতীরে গোয়ালারা বাস করে। এভাবে তত্ত্বমসি পদের তৎ ও ত্বম্ পরস্পর বিরুদ্ধার্থ হওয়ায় দুটি পদকেই ত্যাগ করে অভিন্নার্থে অশ্রুত নূতন পদ অধ্যাহার করে অর্থ করা যাচ্ছে না।

কারণ, জহৎ লক্ষণায় মুখ্যার্থের সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নতুন পদ অধ্যাহার করে অর্থ করতে হয়। তত্ত্বমসি পদের বাচ্যার্থে বিরোধ ঘটে কিন্তু, চৈতন্যাংশে বিরোধ হয় না বলে মুখ্যার্থের সম্পূর্ণ ত্যাগ সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য জহৎলক্ষণার দ্বারা তত্ত্বমসি পদের অর্থ করা যায় না।।১৫৯-১৬১।।

পূর্বপক্ষের জহল্লক্ষণা সমর্থন ও খণ্ডন

ন চ গঙ্গাপদং স্বার্থ-পরিত্যাগেন তীরপদার্থং যথা লক্ষয়তি, তথা তৎপদং ত্বম্পদং বা বাচ্যার্থ-পরিত্যাগেন ত্বংপদার্থং তৎপদার্থং বা বোধয়তু, তৎ কুতঃ জহল্লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে ইতি বাচ্যম্।।১৬২।।

(পূর্ব পক্ষ) আচ্ছা! গঙ্গাপদ যেমন নিজ অর্থ (বাচ্যার্থ জল) পরিত্যাগ করে তীরকে (বা তৎসংসৃষ্ট নৌকাকে) লক্ষণার দ্বারা বোঝায়, সেরকম তৎপদ বা ত্বম্পদ নিজ বাচ্যার্থকে ত্যাগ করে ত্বম্ বা তৎ পদকে বোঝাক, তাহলে জহল্লক্ষণা কেন সঙ্গত হবে না?।।১৬২।।

অমৃত টীকা ঃ পূর্বপক্ষ বলতে বোঝায়, সিদ্ধান্তবাক্যে বা তত্ত্বে যে সংশয় তা প্রকাশ করে প্রশ্ন তোলা। পূর্বপক্ষ প্রশ্ন করছে, গঙ্গাপদ যেমন নিজ অর্থ (স্বার্থ) ত্যাগ করে তীরপদে লক্ষণা করা হলো, সেরকম তৎপদ নিজ অর্থ পরোক্ষ সর্বজ্ঞত্বাদি অর্থ ত্যাগ করে ত্বম্ পদকে অর্থাৎ জীবচৈতন্যকে লক্ষ্য করুক এবং ত্বম্-পদও অপরোক্ষত্বাদি অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্ম ত্যাগ করে ঈশ্বর-

চৈতন্যকে লক্ষ্য করুক—এভাবে জহল্লক্ষণার দ্বারা অর্থ করা হোক। এরূপ অর্থ করা যে সম্ভব নয়, তা সিদ্ধান্তী বলছেন।।১৬২।।

তত্র তীরপদ-অশ্রবণেন তদ্-অর্থ-অপ্রতীতৌ লক্ষণয়া তৎ-প্রতীতি-অপেক্ষায়াম্ অপি তৎ-ত্বম্-পদয়োঃ শ্রূয়মাণত্বেন তদর্থ-প্রতীতৌ, লক্ষণয়া পুনঃ অন্যতরপদেন অন্যতরপদার্থ-প্রতীতি-অপেক্ষা-অভাবাৎ।।১৬৩।।

(উত্তর) না, তা ঠিক নয়। যেহেতু সেখানে ('গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি' এই বাক্যে) তীর পদটি শোনা যাচ্ছে না বলে অর্থের জ্ঞান হয় না, এজন্য লক্ষণার দ্বারা সেই তীর জ্ঞানের অপেক্ষা আছে। এখানে কিন্তু তৎ পদ ও ত্বম্ পদ দুইটিই (উল্লিখিত থাকায় শোনা যাচ্ছে বলে) সেই তৎ ও ত্বম পদের বাচ্যার্থের জ্ঞান হওয়ায় লক্ষণার দ্বারা একটি পদের অর্থ দিয়ে অন্য পদের অর্থকে বোঝাবার কোন প্রয়োজন নেই।।১৬৩।।

অমৃত টীকা : উত্তরে বলা হয়েছে, যে-বাক্য বলা হলো, তার পদের অর্থ যদি অসঙ্গত হয়, তবে লক্ষণা হবে অর্থাৎ মুখ্যার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অশ্রুত কোন পদ অধ্যাহার করে অর্থ করতে হবে—এই মত সকলে মানেন। এখানে 'তীর' পদ বাক্যে বলা ছিল না; গঙ্গার সঙ্গে তীর পদের অবিনাভাব সম্বন্ধ থাকায় গঙ্গাপদ নিজ অর্থ ত্যাগ করে তীর পদে লক্ষণা হলো। আর তত্ত্বমসি বাক্যে তৎ ও ত্বম্ পদ উল্লেখিত থাকায় এবং দুয়ের মুখ্যার্থ সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞত্ব, স্পষ্ট বোধ হওয়ায়, তৎ বা ত্বম্-এ লক্ষণার অবকাশ থাকছে না। আর মুখ্যার্থ বোধ হলে লক্ষণা অন্যায্য। সুতরাং এখানে জহল্লক্ষণা হতে পারছে না। কাকে ত্যাগ করা যাবে? দুটি পদেরই মুখ্যার্থ বোধ হচ্ছে।।১৬৩।।

অজহল্লক্ষণাও সঙ্গত নয়

অত্র 'শোণঃ ধাবতি' ইতি বাক্যবৎ অজহল্লক্ষণা অপি ন সঙ্গচ্ছতে।।১৬৪।।

এখানে (তত্ত্বমসি বাক্যে) 'শোণো ধাবতি' (লাল ছুটছে) এই বাক্যের মতো অজহৎলক্ষণাও সঙ্গত হয় না।।১৬৪।।

তত্র শোণগুণগমন-লক্ষণস্য বাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাৎ তদ্-অপরিত্যাগেন তদ্-আশ্রয়-অশ্বাদি-লক্ষণয়া তদ্ বিরোধপরিহার-সম্ভবাৎ অজহল্লক্ষণা সম্ভবতি।।১৬৫।।

যেহেতু সেখানে লাল রংটি গুণ, গুণের গমনরূপ বাক্যের অর্থ বিরুদ্ধ বলে সেই লাল রংকে পরিত্যাগ না করে, লাল রং-এর আশ্রয় অশ্ব প্রভৃতিতে লক্ষণা স্বীকার করে ঐ বিরোধ পরিহার করা সম্ভব হওয়ায় অজহৎ-লক্ষণা সম্ভব হয়।।১৬৫।।

অমৃত টীকা ঃ জহৎ শব্দের অর্থ ত্যাগ। অজহৎ মানে ত্যাগ না করে। 'শোণো ধাবতি' মানে লাল দৌড়ুচ্ছে। লাল রংটি আপনা আপনি ছুটতে পারে না। তাই লাল পদটি ত্যাগ না করে অর্থ হবে, লাল রংটির আশ্রয় যে-প্রাণী, তাকে লক্ষণা করে অর্থ হবে লাল রং-এর ঘোড়া ছুটছে। যেমন আমরা বলি, 'এই ছাতা এদিকে এসো।' ছত্রধারীকেই এভাবে ডাকা হলো। কারণ ছাতা আপনা আপনি চলতে পারে না। কেউ তাকে বহন করছে। তাকে ডাকাই উদ্দেশ্য। ছাতা পদ ত্যাগ না করে ছাতা শব্দে ছত্রধারীকে বোঝানো হলো। এরূপ লক্ষণাকে অজহৎলক্ষণা বলে।।১৬৫।।

অত্র তু পরোক্ষত্ব-অপরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্ট-চৈতন্য-একত্বস্য বাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাৎ তদ্-অপরিত্যাগেন তৎ সম্বন্ধিনো যস্য কস্যচিৎ অর্থস্য লক্ষিতত্বে অপি তদ্‌বিরোধ-অপরিহারাদ্ অজহল্লক্ষণা অপি ন সম্ভবতি এব।।১৬৬।।

(এখানে কিন্তু তত্ত্বমসি বাক্যে) পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট চৈতন্যের একত্বরূপ বাক্যার্থটি বিরুদ্ধ বলে তাকে (বিরুদ্ধ অংশকে) ত্যাগ না করে তৎসম্বন্ধী অর্থাৎ সেই বিরুদ্ধ চৈতন্যসম্বন্ধী যে-কোন পদার্থকে লক্ষিত করলেও সেই বিরোধের পরিহার না হওয়ায় অজহল্লক্ষণাও সম্ভব হয় না।।১৬৬।।

অমৃত টীকা ঃ কিন্তু এই অজহৎ লক্ষণার দ্বারাও 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ করা যায় না। কারণ তৎপদের অর্থত্যাগ না করে ত্বম্-কে বা ত্বম্ পদের অর্থ ত্যাগ না করে তৎ-কে বোঝালে, মানে দাঁড়াবে অপরোক্ষত্ববিশিষ্ট পরোক্ষ বা পরোক্ষত্ববিশিষ্ট অপরোক্ষ চৈতন্য। সরল কথায়, সর্বজ্ঞ-অল্পজ্ঞ চৈতন্য। এ অর্থ তো হতে পারে না। বিরোধ পরিহার সম্ভব হলো না বলে অজহল্লক্ষণাও সঙ্গত হয় না।।১৬৬।।

প্রকারান্তরেও ভাগলক্ষণা স্বীকার্য নয়

ন চ তৎপদং ত্বং-পদং বা স্বার্থ-বিরুদ্ধাংশ-পরিত্যাগেন অংশান্তরসহিতং তৎপদার্থং ত্বংপদার্থং বা লক্ষয়তু অতঃ কথং প্রকারান্তরেণ ভাগলক্ষণা অঙ্গীকরণম্ ইতি বাচ্যম্।।১৬৭।।

(পূর্বপক্ষ) আচ্ছা, তৎপদ বা ত্বংপদ নিজ নিজ অর্থের বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করে অন্য অবিরুদ্ধ অংশের সঙ্গে ত্বং পদের অর্থকে বা তৎপদের অর্থকে লক্ষণার দ্বারা বুঝাক, সুতরাং অন্যভাবে ভাগলক্ষণা স্বীকার করার প্রয়োজন কি?।।১৬৭।।

একেন পদেন স্বার্থ-অংশ-পদার্থান্তর-উভয়-লক্ষণায়া অসম্ভবাৎ, পদান্তরেণ তদর্থ-প্রতীতৌ লক্ষণয়া পুনঃ অন্যতর-পদার্থ-প্রতীতি-অপেক্ষা-অভাবাৎ চ।।১৬৮।।

(উত্তর, না, তা বলতে পারা যায় না, কারণ) একটি পদের নিজ অর্থের একাংশ ও অন্যপদের সম্পূর্ণ অর্থ—এই উভয় অর্থে লক্ষণা সম্ভব হয় না। আরো কথা, ভিন্ন পদের দ্বারা অর্থ জ্ঞান সম্ভব হওয়ায় তদ্‌ভিন্ন অন্য পদ থেকে তার অর্থ বোঝাবার জন্য লক্ষণা করার কোন প্রয়োজনও পড়ে না।।১৬৮।।

অমৃত টীকা : এখানে আরো একপ্রকার লক্ষণার কথা বলা হচ্ছে, তার নাম ভাগলক্ষণা। যেখানে বিরুদ্ধতা দোষ থাকে, সেখানে এরূপ ভাগলক্ষণা স্বীকার্য। 'শোণো ধাবতি'র ক্ষেত্রে যে অজহৎলক্ষণা কার্যকর হলো তাতে বিরুদ্ধ শোণগুণের গমন শোণগুণবাচী পদ শোণকে ত্যাগ না করে তার আশ্রয়ভূত অশ্বাদি পদে গৃহীত হয়ে মানে হলো। এখানে কিন্তু দুটি পদই উক্ত আছে। সুতরাং অজহৎলক্ষণা খাটছে না। তাই বিরুদ্ধ অংশ দুটির একটিকে পরিহার করে অর্থাৎ পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্বের একটিকে ত্যাগ করে অন্যটির সম্পূর্ণ অর্থের সঙ্গে যোজনা করে অর্থকরণ রূপ যে ভাগলক্ষণা তার দ্বারা অর্থ হয়না বলে ভাগলক্ষণাও স্বীকার্য নয়। তৎ-এর পরোক্ষত্ব বাদ দিয়ে অবিরুদ্ধ চৈতন্যাংশকে ধরে অর্থ করলে শুদ্ধ চৈতন্য অল্পজ্ঞ জীবমাত্র হয়ে পড়েন, আবার ত্বম্-এর অপরোক্ষত্ব বাদ দিয়ে তৎ-এর বাচ্যার্থ নিলে অর্থ দাঁড়াবে ঈশ্বর, মায়া-শুদ্ধ-চৈতন্য একযোগে জীবচৈতন্য; জীব বলে আর কিছু নেই হয়ে যাবে; 'জীব

ব্রহ্ম এক' এরূপ অর্থ দাঁড়াবে না। সুতরাং এখানে একটি শব্দের দ্বারা স্বীয় অবিরুদ্ধ অর্থাংশ আর অন্য এক অশ্রুত পদার্থ—এই দুই রকম জ্ঞান হতে পারছে না। এরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়েছে, ভাগলক্ষণাই স্বীকার করতে হবে, তবে তা নিম্নরূপ ঃ।।১৬৭-১৬৮।।

ভাগলক্ষণাই স্বীকার্য

তস্মাৎ যথা 'সোঽয়ং দেবদত্তঃ' ইতি বাক্যং তদর্থঃ বা তৎকাল-এতৎকাল-বিশিষ্ট-দেবদত্ত-লক্ষণস্য বাক্যার্থস্য অংশে বিরোধাৎ বিরুদ্ধতৎকাল-এতৎকাল-বিশিষ্টত্ব-অংশং পরিত্যজ্য অবিরুদ্ধং দেবদত্তাংশমাত্রং লক্ষয়তি। তথা তত্ত্বমসি ইতি বাক্যং তদর্থঃ বা পরোক্ষত্ব-অপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট-চৈতন্য-একত্বলক্ষণস্য বাক্যার্থস্য অংশে বিরোধাৎ বিরুদ্ধ-পরোক্ষত্ব-অপরোক্ষত্ব-বিশিষ্টত্বাংশং পরিত্যজ্য অবিরুদ্ধম্ অখণ্ডচৈতন্যমাত্রং লক্ষয়তি।।১৬৯।।

সুতরাং, যেমন 'সেই এই দেবদত্ত' এই বাক্য বা তার অর্থ তৎকাল ও এতৎকালবিশিষ্ট দেবদত্তরূপ বাক্যার্থের এক অংশে বিরোধ হয়। সেই বিরুদ্ধাংশ তৎকাল এতৎকালবিশিষ্টত্ব ত্যাগ করে অবিরুদ্ধ দেবদত্ত অংশমাত্রকে লক্ষণার দ্বারা বোঝায়। সেরকম তত্ত্বমসি বাক্য বা তার অর্থে পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্ট চৈতন্যের একত্বরূপ বাক্যার্থের একাংশমাত্র বিরুদ্ধ হয়, এই বিরুদ্ধাংশ (দ্বয়) পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্বাদি-বিশিষ্টাংশ ত্যাগ করলে অবিরুদ্ধ চৈতন্যাংশই মাত্র লক্ষণার দ্বারা বোঝায়।।১৬৯।।

অমৃত টীকা ঃ অন্যভাবে ভাগলক্ষণাকে ব্যাখ্যা করে অর্থসঙ্গতি করা হচ্ছে। ভাগলক্ষণার অর্থ হলো, অবিরুদ্ধ অংশ রেখে বিরুদ্ধ অংশের ত্যাগ করা। আলোচ্য ক্ষেত্রে বিরুদ্ধাংশ হলো তৎ ও ত্বম্ পদের পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব, তাদের উভয়কে বাদ দিয়ে অবিরুদ্ধ যে-চৈতন্যাংশ লক্ষণার দ্বারা বোঝায় তা গ্রহণ করলে অর্থ দাঁড়াবে—তৎ পদজ্ঞাপিত শুদ্ধ চৈতন্য ও ত্বং পদজ্ঞাপিত শুদ্ধ চৈতন্য 'এক চৈতন্য'। অর্থাৎ 'জীব ও ব্রহ্ম এক' এরূপ অর্থ হয়। এভাবে ভাগলক্ষণার দ্বারা তত্ত্বমসি পদের অর্থ করা হয়।।১৬৯।।

'আমি ব্রহ্ম' এরকম অনুভব বিচার

অথ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' [বৃঃ উঃ ১।৪।১০] ইতি অনুভব বাক্যার্থঃ বর্ণ্যতে।।১৭০॥

এখন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই অনুভব বাক্যের অর্থ বলা হচ্ছে।।১৭০॥

এবম্ আচার্যেণ অধ্যারোপ-অপবাদ-পুরঃসরং তত্ত্বম্ পদার্থৌ শোধয়িত্বা বাক্যেন অখণ্ডার্থে অববোধিতে অধিকারিণঃ 'অহং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাব-পরমানন্দ-অনন্ত-অদ্বয়ং ব্রহ্ম অস্মি' ইতি অখণ্ড-আকার-আকারিতা চিত্তবৃত্তিঃ উদেতি।।১৭১॥

গুরু এভাবে অধ্যারোপ ও অপবাদক্রমে তৎ ও ত্বম্ পদের অর্থ সংশোধন করে মহাবাক্যের দ্বারা অখণ্ড পদার্থ বুঝিয়ে দিলে অধিকারির (শিষ্যের) 'আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্যস্বভাব পরমানন্দ অনন্ত অদ্বয় ব্রহ্ম'—এরূপ অখণ্ড আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয়।।১৭১॥

অমৃত টীকা : বেদান্তের সার কথা এটাই—জীব ও ব্রহ্ম এক, ব্রহ্মই সত্যবস্তু, জগৎ ভ্রমমাত্র। গুরু এভাবে অধিকারি শিষ্যকে শুদ্ধ অসঙ্গ চৈতন্যে অবিদ্যাবশত যেভাবে অহংকার থেকে আরম্ভ করে শরীর পর্যন্ত মিথ্যাপদার্থ আরোপিত হয়ে জীবকে বিভ্রান্ত বদ্ধ করে এবং এই সকল মিথ্যাবোধ যে-ভাবনা পরম্পরায় দ্রবীভূত থাকে, তা 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের পদের অর্থ শোধন করে জহৎ-অজহৎ স্বার্থ লক্ষণার দ্বারা (ভাগলক্ষণার দ্বারা) বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করে অবিরুদ্ধ চৈতন্যাংশকেই বুঝিয়ে এক অখণ্ড চৈতন্যই যে সত্য তা বুঝিয়ে দেন। শিষ্যের তখন যে-চিত্তবৃত্তি ওঠে তার স্বরূপ এখানে বলা হয়েছে। গুরুর উপদেশে সবই ভ্রান্ত বোধ হলে কি সব অসত্তা হয়ে যাবে? এই আশঙ্কা নিবারিত করে বলছেন, না, 'অহং' অর্থাৎ আমি বলতে আমরা যে শরীর মন বুদ্ধি অহং এই পিণ্ডকে বোঝাই—জ্ঞান হলে কেবল প্রত্যগাত্মাকেই সে তখন 'অহং' পদের বিষয় করে। সেই অহং কিরূপ? তার বর্ণনা করছেন 'নিত্য' পদে অনিত্য আশঙ্কা দূর করে, 'শুদ্ধ' পদে অবিদ্যাদোষশূন্য, 'বুদ্ধ' পদে স্বপ্রকাশ স্বরূপ বলে জড়ধর্ম থেকে আলাদা, 'মুক্ত' পদে সকল উপাধিরাহিত্য, 'সত্য' পদে অবিনাশী স্বভাব, আত্মা যে পরম আনন্দ তা বুঝিয়েছেন। আনন্দের আগে 'পরম' বিশেষণ দেওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, এ-আনন্দ বিষয়লোলুপ মানুষ-দেবতা থেকে আরম্ভ করে চতুর্মুখ

ব্রহ্মার আনন্দ পর্যন্ত, সকল আনন্দই কর্মফলে উৎপন্ন বলে তা পরস্পর আপেক্ষিকত্ববশত ন্যূন অতিশয়যুক্ত ও ক্ষয়িষ্ণু (কর্মশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়) বলে তুচ্ছ। এই ব্রহ্মানন্দ ঐ সকল আনন্দ থেকে আলাদা, নিত্য শ্রেষ্ঠ পরম আনন্দ। 'অনন্ত' পদে ঘট প্রভৃতির মতো তা দেশ-কাল বা ভিন্নবস্তু-সীমিত নয়, এরূপ চৈতন্য একটিই, অদ্বয়; জীব ও ব্রহ্ম একই চৈতন্য—এরূপ চিত্তের বৃত্তি হয়। এরূপ অখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তির উদয় হয়। এটি পরোক্ষ জ্ঞান নয়। কারণ শ্রুতিতে বলা হয়েছে, 'যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্বান্তরঃ'। [বৃঃ উঃ ৩।১।৪] এইটি শব্দবাহিত পরোক্ষ জ্ঞান নয়—পরন্তু অপরোক্ষ জ্ঞান। সাক্ষাৎকাররূপ অপরোক্ষজ্ঞান। যদি গুরূপদিষ্ট মহাবাক্যে পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র জন্মে তবে, বেদের প্রামাণ্য থাকে না। শব্দ সাহায্যেই জ্ঞান হয়—জ্ঞানের অন্য কোন হেতু নেই। শব্দ যে কেবল পরোক্ষজ্ঞানের জনকই হবে, অপরোক্ষ জ্ঞানজনক হবে না, এরূপ কোন নিয়ম নেই। যে-মনে সুখাদিরূপ অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে সেই মনেই আবার স্মৃতিরূপে পরোক্ষজ্ঞানও হয়। 'দশমস্তমসি'র বেলায় যেমন শব্দার্থবোধটি অপরোক্ষজ্ঞানের জনক হয়—-এখানেও 'তত্ত্বমসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' প্রভৃতি মহাবাক্য অপরোক্ষজ্ঞানের হেতু হয়। আরো কথা, জ্ঞানের পরোক্ষত্ব বা অপরোক্ষত্ব ভাবটি ইন্দ্রিয়জনিত নয়, বরং অর্থের উপরই নির্ভরশীল—অর্থাৎ জ্ঞানটি যখন স্বীয় আত্মার সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উদিত হয় তখনই তা অপরোক্ষ, যখন তা আত্মবস্তু থেকে ভিন্নরূপ বোধ করায় তখন তা পরোক্ষরূপেই জ্ঞানের বিষয় হয়।।১৭০-১৭১।।

'আমি ব্রহ্ম' এই অন্তঃকরণবৃত্তির ফল

সা তু চিৎপ্রতিবিম্বসহিতা সতী প্রত্যগ্ অভিন্নম্ অজ্ঞাতং পরং ব্রহ্ম বিষয়ীকৃত্য তদ্গত-অজ্ঞানমেব বাধতে, তদা পটকারণতন্তুদাহে পটদাহবৎ অখিল-কার্যকারণে অজ্ঞানে বাধিতে সতি তৎকার্যস্য অখিলস্য বাধিতত্বাৎ তদন্তর্ভূত-অখণ্ড-আকার-আকারিতা চিত্তবৃত্তিঃ অপি বাধিতা ভবতি।।১৭২।।

সেই চিত্তবৃত্তি ('আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ চিত্তবৃত্তি) কিন্তু চৈতন্য প্রতিবিম্ব যুক্ত হয়ে অন্তরাত্মা থেকে অভিন্ন অজ্ঞানবিশিষ্ট পরব্রহ্মকে বিষয় করে পরব্রহ্মাবরক অজ্ঞানকেই বিনষ্ট করে। যেমন বস্ত্রের কারণ তন্তু পুড়ে গেলে বস্ত্রটাই পুড়ে যায়, সেরকম সমস্ত কার্যের কারণরূপ অজ্ঞান বাধিত হয়ে গেলে

তার (অজ্ঞানের) সমস্ত কার্যও বাধিত হওয়ায় অজ্ঞানের কার্যের অন্তর্গত অখণ্ড আকার আকারিতা চিত্তবৃত্তিও বাধিত হয়ে যায় ॥১৭২॥

অমৃত টীকা ঃ বৃত্তি অন্তঃকরণের একটি অবস্থা। অন্তঃকরণ মায়ার সৃষ্টি, সুতরাং জড়। এই জড় চিত্তবৃত্তি চৈতন্যকে প্রকাশ করতে পারে না। তার প্রয়োজনও নেই, যেমন প্রদীপ সূর্যকে প্রকাশ করতে পারে না বা তার প্রয়োজনও নেই। তাহলেও নিত্যশুদ্ধ স্বপ্রকাশ আত্মাকে জড় চিত্তবৃত্তি কিভাবে প্রকাশ করবে? এই প্রশ্নের উত্তরেই বলা হচ্ছে যে, ঐ বৃত্তি শুদ্ধ ব্রহ্মবিষয়ক নয়, কিন্তু, অজ্ঞানের আধারভূত বা অজ্ঞানের বিষয়ভূত প্রত্যক্ থেকে অভিন্ন পরব্রহ্মকে বিষয় করে। কারণ তখনও ব্রহ্মবোধ না হওয়ায়, ব্রহ্মাশ্রয়ী অজ্ঞানসহিত ব্রহ্মকে, যিনি অন্তরাত্মার সহিত অভিন্ন, তাঁকে বিষয় করে। এই বৃত্তি অন্তরস্থিত চৈতন্যপ্রভায় প্রজ্বলিত হয়ে চৈতন্যগত অজ্ঞানকেই ধ্বংস করে দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে যে-অজ্ঞানে অন্তঃকরণ ও তার বৃত্তি উদিত, তাও ধ্বংস হয়ে যায়। বৃত্তির প্রয়োজন চৈতন্যগত অজ্ঞান আবরণ ধ্বংস করা মাত্র, কিন্তু তা চৈতন্যকে প্রকাশ করতে পারে না, তা হলেও, অজ্ঞানের কার্য—সকল চরাচর প্রত্যক্ষরূপে তখনও যদি প্রকাশিত থাকে, তাহলে তো অদ্বৈতসিদ্ধি হয় না—এই আশঙ্কার উত্তরেই বলা হয়েছে, কারণ-অজ্ঞাননাশে সকল কার্য-প্রপঞ্চ নাশ হয়ে যায় বলে অদ্বৈত সিদ্ধ হয়। এ অবস্থায় যদি অখণ্ডাকার আকারিত চিত্তবৃত্তি থেকে যায়, তা হলেও তো অদ্বৈতহানি হবে? এরই উত্তরে বলা হলো, অজ্ঞানের অন্তর্গত যে অখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তি তারও নাশ হয়ে যায়। সুতরাং ব্রহ্মমাত্রই থাকে। একেই মোক্ষ বলে ॥ ১৭২ ॥

ব্রহ্মাকারাবৃত্তির বিলয়

তত্র বৃত্তৌ প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যম্ অপি, যথা প্রদীপপ্রভা আদিত্যপ্রভা-অবভাসন-অসমর্থা সতী তয়া অভিভূতা ভবতি, তথা স্বয়ংপ্রকাশমান-প্রত্যগভিন্ন-পরব্রহ্ম-অবভাসন-অনর্হতয়া তেন অভিভূতং সৎ স্ব-উপাধিভূত-অখণ্ডবৃত্তেঃ বাধিতত্বাৎ দর্পণ-অভাবে মুখ-প্রতিবিম্বস্য মুখমাত্রত্ববৎ প্রত্যগভিন্ন-পরব্রহ্মমাত্রং ভবতি ॥১৭৩॥

যেমন প্রদীপপ্রভা আদিত্যপ্রভাকে প্রকাশ করতে না পেরে আদিত্যপ্রভায় অভিভূত হয়ে থাকে, সেরূপ চিত্তবৃত্তিতে (অখণ্ডাকার আকারিতচিত্তবৃত্তিতে)

প্রতিবিম্বিত চৈতন্যও স্বয়ংপ্রকাশমান প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্মকে প্রকাশ করতে না পেরে, সেই পরব্রহ্মদ্বারা অভিভূত হয়ে থাকে এবং যেমন দর্পণ না থাকলে প্রতিবিম্বও থাকে না, কেবল (বিম্বভূত) মুখমাত্র থাকে, তেমনি প্রতিবিম্বিত চৈতন্যের উপাধিভূত অখণ্ডবৃত্তিটি বাধিত হয়ে যাওয়ায় প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্মমাত্র হয়ে যায় ॥১৭৩॥

অমৃত টীকা ঃ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যকে জীব বলা হয়। অন্তঃকরণ বৃত্তি যখন স্বাভিন্ন অজ্ঞানাশ্রয় ব্রহ্মকে বিষয় করে অখণ্ডভাবে স্থির থাকে, তখন বৃত্তিস্থ চৈতন্যপ্রতিবিম্ব পরব্রহ্মকে প্রকাশ করতে না পেরে অভিভূত হয়ে পড়ে। এবং যখন বৃত্তি অজ্ঞানাবরণ ধ্বংস করে, তখন বৃত্তিও ধ্বংস হওয়ায় বৃত্তিস্থ চৈতন্যপ্রভা, যাকে জীব বলা হচ্ছিল, সেও প্রত্যগ্ অভিন্ন ব্রহ্ম চৈতন্যেই একীভূত হয়ে যায়। উপমা হলো ঃ দর্পণ অভাবে যেমন প্রতিবিম্ব মুখ মুখমাত্রে একীভূত হয়, সেরূপ তখন ব্রহ্মমাত্রই থাকে। নিজ উপাধির লয় হলে উপহিত অধিষ্ঠানমাত্র থাকে—যেমন সর্পভ্রান্তি চলে গেলে রজ্জুমাত্রই থাকে, সেরূপ জীবত্ব আর থাকে না, অধিষ্ঠান ব্রহ্মমাত্র থাকে।।১৭৩॥

ব্রহ্মের মনোগ্রাহ্যত্ব বিষয়ে শ্রুতিবিরোধ নিরসন

এবং চ সতি 'মনসা এব অনুদ্রষ্টব্যম্' [বৃঃ ৪।৪।৯] **'যৎ মনসা ন মনুতে'** [কেনঃ ১।৫] **ইতি অনয়োঃ শ্রুত্যোঃ অবিরোধঃ। বৃত্তিব্যাপ্যত্ব অঙ্গীকারেণ ফলব্যাপ্যত্ব-প্রতিষেধ-প্রতিপাদনাৎ॥১৭৪॥**

এরূপ হলে (বৃত্তিব্যাপ্যত্ব ও ফলব্যাপ্যত্বের ভেদ থাকলে) 'তাকে মনের দ্বারা দর্শন করবে' ও 'যাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না'—এই উভয়বিধ শ্রুতির মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। যেহেতু (সেই ব্রহ্মে) বৃত্তিব্যাপ্যত্ব স্বীকার করে ফলব্যাপ্যত্বের নিষেধ করা হয় ॥১৭৪॥

উক্তঞ্চ—

"ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য শাস্ত্রকৃদ্ভির্নিবারিতম্।
ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা॥"

ইতি। [পঞ্চদশী ৬।৯০] **॥১৭৫॥**

বলাও হয়েছে—"শাস্ত্রকারগণ এই ব্রহ্মের ফলব্যাপ্যত্ব খণ্ডন করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের জন্য ব্রহ্মে মনোবৃত্তি ব্যাপ্যত্বের প্রয়োজন আছে" ॥১৭৫॥

"স্বয়ংপ্রকাশমানত্বান্নাভাস উপযুজ্যতে।" ইতি চ। [পঞ্চদশী ৬।৯২] **॥১৭৬॥**

"ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলে চৈতন্যাভাসের অর্থাৎ প্রতিবিম্বের উপযোগিতা নেই" ॥১৭৬॥

অমৃত টীকা ঃ শ্রুতিতে পরস্পর বিরুদ্ধ মত ব্যক্ত করা হয়েছে—একবার বলা হয়েছে, 'মনের দ্বারা ব্রহ্ম বোধ করবেন' আবার বলা হয়েছে, 'মন যাঁকে প্রকাশ করতে পারে না'। এই মত দুইটিকে ঠিকভাবে বুঝলে বিরোধ থাকে না। বাক্যদুটির তাৎপর্য বিচার করে শাস্ত্রকারগণ বলেছেন, মনোবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মাবরক অজ্ঞান নাশ হয় ঠিক কথা, কিন্তু স্বয়ংপ্রকাশ ব্রহ্মকে মনোবৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য প্রকাশ করতে পারে না। যেভাবে মনোবৃত্তি জড় বিষয়কে ব্যাপ্ত করে বিষয়াবরক অজ্ঞানকে নাশ করে এবং সেই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত বা আভাসিত চৈতন্য বিষয়কে প্রকাশ করে থাকে, এখানে তা হতে পারে না। বৃত্তি ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানকে নাশ করে মাত্র, কিন্তু চৈতন্য-আভাস চৈতন্যকে প্রকাশ করতে পারে না। যেমন প্রদীপপ্রভা সূর্যকে প্রকাশ করতে পারে না। আভাস তো চৈতন্যেরই অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত রূপ। আভাস বা প্রতিবিম্ব দিয়ে তো আর সত্যসূর্যকে (বিম্বকে) দেখা যায় না। সুতরাং, মনের দ্বারা দেখা যায় অর্থে ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান নাশ হয়। আর মনের দ্বারা তাকে বিষয় করা যায় না অর্থে তাঁকে মন প্রকাশ করতে পারে না। এই উভয় অর্থই সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো। অজ্ঞানাবরণ ভঙ্গের পরে যে চিদাভাস-রূপ জীবচৈতন্য, যা ঘটকে প্রকাশ করে তাই ফলচৈতন্য। আভাসবাদ মতে বিষয় প্রকাশ চৈতন্যকেই ফলচৈতন্য বলা হয়। এই ফলচৈতন্যকে মনোবৃত্তিতে প্রতিফলিত চৈতন্য প্রকাশ করতে গিয়ে স্বয়ংই অভিভূত হয়ে পড়ে এবং শেষে দর্পণ অভাবে যেমন প্রতিবিম্ব বিম্বভূত মুখমাত্রে পরিগণিত হয়, আভাসও তদ্রূপ চৈতন্যে মিশে এক হয়ে যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মাকারা মনোবৃত্তি ব্রহ্মাশ্রিত অজ্ঞানকে নাশ করে মাত্র, কিন্তু ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারে না। স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যকে অন্য কোন প্রকাশ দ্বারা প্রকাশিত বলে ভাবনা করা যায় না, তা হলে অনবস্থা দোষ হয়, আর তার কোন প্রয়োজনীয়তাও থাকে না ॥১৭৪-১৭৬॥

ব্রহ্মাকারা ও ঘটাকারা অন্তঃকরণবৃত্তির পার্থক্য

জড়পদার্থ-আকার-আকারিত-চিত্তবৃত্তেঃ বিশেষঃ অস্তি ॥১৭৭॥

জড়পদার্থের আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির (ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্তবৃত্তি থেকে) ভেদ আছে ॥১৭৭॥

তথাহি—'অয়ং ঘটঃ' ইতি ঘটাকারাকারিত-চিত্তবৃত্তিঃ অজ্ঞাতং ঘটং বিষয়ীকৃত্য তদ্‌গত-অজ্ঞাননিরসন-পুরঃসরং স্বগত-চিদাভাসেন জড়ং ঘটম্ অপি ভাসয়তি ॥১৭৮॥

যেমন 'এইটি ঘট' এরূপে ঘটাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তি অজ্ঞাত ঘটকে বিষয় করে সেই ঘটগত অজ্ঞানকে নাশ করে নিজেতে স্থিত চিৎ-প্রতিবিম্ব দ্বারা জড় ঘটকেও প্রকাশ করে ॥১৭৮॥

তদুক্তং—

বুদ্ধিতৎস্থ চিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্।
তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ।

ইতি [পঞ্চদশী ৭।৯১] **॥১৭৯॥**

এ বিষয়ে বলা হয়েছে, 'বুদ্ধি এবং বুদ্ধিস্থিত চিদাভাস উভয়ই ঘটকে ব্যাপ্ত করে। তাদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা ঘটাবরক অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং বৃত্তিগত চিদাভাসের দ্বারা ঘট প্রকাশিত হয়' ॥১৭৯॥

অমৃত টীকা : লৌকিক ঘট-পটাদির জ্ঞান আর অখণ্ড ব্রহ্মজ্ঞান এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। আমরা জড় পদার্থকে মনের দ্বারা গ্রহণ করি, মনোবৃত্তি ছাড়া বাহিরের জগৎ বোধের আর কোন বিকল্প পথ নেই। এই বোধ কি ভাবে হয়? প্রথমে মন বিষয়ের আকার ধারণ করে, একেই চিত্তবৃত্তি বলে। চিত্ত এক একটি বিশেষ রূপের আকার নেয়। তখন সেই বৃত্তিকে চৈতন্য প্রকাশ করে দেন। চৈতন্য সর্বব্যাপক বলে ঘটগত অজ্ঞান-অবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম-চৈতন্য ও জীবগত ব্রহ্ম-চৈতন্যের মধ্যে থাকে প্রমাণরূপে চিত্তবৃত্তিগত ব্রহ্মচৈতন্য। এই জীব চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য ও বিষয়-অবচ্ছিন্ন প্রমেয় চৈতন্য (বা বিষয় উপাধি উপহিত চৈতন্য) ভাষান্তরে প্রমাতৃ চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য ও প্রমেয় চৈতন্য বিষয়দেশে একীভূত হয়। তখন মনোবৃত্তি বিষয়গত হলে, বিষয়রূপ ধারণ করলে, বিষয়গত অজ্ঞান মনোবৃত্তির দ্বারা নষ্ট হয় ও সেই মনোবৃত্তিতে প্রতিফলিত ব্রহ্মচৈতন্য, যা জীবরূপে অন্তঃকরণে

ছিল তারই প্রভায় বিষয় প্রকাশিত হয়। একেই বলে ফলব্যাপ্যত্ব। বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যের দ্বারা বিষয় প্রকাশিত হয়। নতুবা জড় বৃত্তির প্রকাশসামর্থ্য নেই। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষেত্রে বৃত্তি ব্রহ্মকে বিষয় করে ব্রহ্মাবরক অজ্ঞানকে নাশ করে দিলেও বৃত্তিস্থ চিদাভাস ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারে না, স্বয়ংই ব্রহ্মের সঙ্গে মিশে যায়॥১৭৯॥

যথা প্রদীপ-প্রভামণ্ডলম্ অন্ধকারগতং ঘটপটাদিকং বিষয়ীকৃত্য তদ্‌গতান্ধকার-নিরসন-পুরঃসরং স্বপ্রভয়া তদবভাসয়তি ইতি।।১৮০।।

যেমন প্রদীপ প্রভাসমূহ অন্ধকারাবৃত ঘটপ্রভৃতিকে বিষয় করে ঘটপটাদিগত অন্ধকারকে দূর করে নিজপ্রভার দ্বারা ঘটাদিকে প্রকাশ করে।।১৮০।।

অমৃত টীকা : যেমন প্রদীপপ্রভা সূর্যকে প্রকাশ করতে পারে না, স্বয়ংই সূর্যপ্রভায় অভিভূত হয়ে থাকে । অবচ্ছেদ ব্রহ্ম মতে ফলচৈতন্য মানে ব্রহ্মচৈতন্য, বৃত্তিস্থ আভাস ব্রহ্ম-চৈতন্যেরই প্রতিবিম্ব। সুতরাং প্রতিবিম্বস্থানীয় আভাস ব্রহ্মকে প্রকাশ করতে পারে না। আর তার প্রয়োজনও নেই।।১৮০।।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকার পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় নির্দেশ

এবংভূত-স্বস্বরূপ-চৈতন্য-সাক্ষাৎকার-পর্যন্তং শ্রবণ মনন-নিদিধ্যাসন-সমাধি অনুষ্ঠানস্য অপেক্ষিতত্বাৎ তে অপি প্রদর্শ্যন্তে।।১৮১।।

যেরূপ পূর্বে বলা হয়েছে নিজের স্বরূপভূত চৈতন্যের সেরূপ সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধি অনুষ্ঠানের প্রয়োজন আছে বলে সে-সকলও দেখানো হচ্ছে।।১৮১।।

অমৃত টীকা : বেদান্তের তাত্ত্বিক আলোচনা শেষ হলো। এখন এই তত্ত্বকথা আলোচনা করেই ক্ষান্ত হলে বিদ্যা অবিদ্যামাত্র। পরন্তু, সেই তত্ত্বকে অনুভব করতে যে-সকল সাধন-পরম্পরার প্রয়োজন তার আলোচনাও বেদান্ত আলোচনার অন্তঃপাতি বিষয় বলে এখানে সে-সকলের আলোচনা করা যাচ্ছে। একথাই 'আবৃত্তিঃ অসকৃৎ উপদেশাৎ' [ব্রহ্মসূত্র ৪।১।১] এই সূত্রে ভগবান বেদব্যাস বলেছেন, এই ন্যায়কে অবলম্বন করে আত্মযাথাত্ম্য সাক্ষাৎকাররূপ অনুভবের দৃঢ়তা সম্পাদন না করা পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় শ্রবণাদি সাধন সকলের কথা বলা হচ্ছে।।১৮১।।

শ্রবণ ও ষড়্‌বিধলিঙ্গনিরূপণ

শ্রবণং নাম ষড়্‌বিধলিঙ্গৈঃ অশেষবেদান্তানাম্ অদ্বিতীয়-বস্তুনি তাৎপর্য-অবধারণম্।।১৮২।।

ছয় প্রকার লিঙ্গের (পরিচায়ক প্রমাণের) দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে সকল বেদান্তের তাৎপর্য তা নিশ্চয় করার নাম শ্রবণ।।১৮২।।

অমৃত টীকা : কেবল শোনাকেই 'শ্রবণ' বলে না। এখানে শ্রবণ শব্দে উপরোক্ত ছয়টি বোধক নিয়মের দ্বারা সমস্ত বেদান্তের মূলকথা যে 'এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সত্য' এরূপ অবধারণ করা। নতুবা শ্রবণ হয় না। শ্রবণ শব্দে তাহলে বেশ ভালভাবে বেদান্ত অধ্যয়নকেই ফলত বোঝায়।।১৮২।।

লিঙ্গানি তু উপক্রমোপসংহার-অভ্যাস-অপূর্বতা-ফল-অর্থবাদ-উপপত্তি-আখ্যানি।।১৮৩।।

পরিচায়ক প্রমাণগুলি হলো— (১) উপক্রম-উপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ, ও (৬) উপপত্তি (যুক্তি)।।১৮৩।।

তদুক্তং—

উপক্রমোপসংহারাভ্যাসাপূর্বতাফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য-নির্ণয়ে।।১৮৪।।

যেমন বলা হয়েছে—তাৎপর্য অবধারণের প্রতি উপক্রম-উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল [প্রয়োজন], অর্থবাদ (প্রশংসা) ও উপপত্তি—এইগুলি লিঙ্গ (জ্ঞাপক চিহ্ন)।।১৮৪।।

অমৃত টীকা : ছয় প্রকার বোধক নিয়মকে উপনিষদ্‌বাক্যে প্রয়োগ করে বুঝে নিতে হবে যে, দ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত মতবাদ অদ্বৈত তত্ত্বে উপনীত হবার সোপানমাত্র।।১৮৪।।

ষড়্‌বিধ লিঙ্গের বর্ণনা
উপক্রম-উপসংহার

তত্র প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য-অর্থস্য তদাদ্যন্তয়োঃ উপপাদনং উপক্রম-উপসংহারৌ। যথা ছান্দোগ্যে ষষ্ঠ প্রপাঠকে প্রকরণ-

প্রতিপাদ্যস্য-অদ্বিতীয়-বস্তুনঃ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" [ছাঃ ৬।২।১] **ইতি অন্তে চ ইত্যাদৌ "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্"** [ছাঃ ৬।৮।৭] **প্রতিপাদনম্।।১৮৫।।**

প্রকরণপ্রতিপাদ্য বিষয়কে প্রথমে (আরম্ভে) ও শেষে বলাকে যথাক্রমে উপক্রম (আরম্ভ) ও উপসংহার (সমাপ্তি) বলে। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের (অধ্যায়ের) প্রারম্ভে এক অদ্বিতীয় বস্তুকে—'এক অদ্বিতীয়ই' এভাবে আদিতে এবং সমাপ্তিতে 'এই সমস্ত (জগৎ) এই আত্মা থেকে ভিন্ন নহে'—এইভাবে বুঝানো হয়েছে।।১৮৫।।

অভ্যাস

প্রকরণ-প্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ তন্মধ্যে পৌনঃপুন্যেন প্রতিপাদনম্ অভ্যাসঃ, যথা তত্র এব অদ্বিতীয়-বস্তুনি মধ্যে 'তত্ত্বমসি' ইতি নবকৃত্বঃ প্রতিপাদনম্।।১৮৬।।

প্রকরণপ্রতিপাদ্য বস্তুকে প্রকরণের মধ্যে পুনঃ পুনঃ বুঝানোর নাম অভ্যাস। যেমন ঃ সেই স্থলেই (ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে) আলোচনার মধ্যে নয় বার তত্ত্বমসি ইত্যাদি রূপে অদ্বিতীয় বস্তুকে বুঝানো হয়েছে।।১৮৬।।

অপূর্বতা

প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ প্রমাণান্তরেণ-অবিষয়ীকরণম্ অপূর্বত্বম্। যথা তত্রৈব অদ্বিতীয়বস্তুনঃ মানান্তর অবিষয়ী-করণম্।।১৮৭।।

অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রকরণপ্রতিপাদ্য বস্তুকে বুঝাতে না পারার নাম অপূর্বতা। (যা অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় নি, তারই উপদেশ। এজন্য ব্রহ্ম একমাত্র উপনিষদ্‌গম্য) যেমন, সেইখানেই অদ্বিতীয় বস্তুকে অন্য কোন প্রমাণের অবিষয়ীভূত বলে বুঝানো হয়েছে।।১৮৭।।

ফল

ফলং তু প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য আত্মজ্ঞানস্য তদনুষ্ঠানস্য বা তত্র তত্র শ্রূয়মাণং প্রয়োজনম্, যথা তত্রৈব 'আচার্যবান্ পুরুষো বেদ,

তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে’ [ছাঃ ৬।১৪।২] **ইতি অদ্বিতীয়বস্তু জ্ঞানস্য তৎপ্রাপ্তিঃ প্রয়োজনম্ শ্রূয়তে।।১৮৮।।**

প্রকরণপ্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞানের অথবা জ্ঞানলাভের উপযোগী সাধনের সেই সেই স্থলে শ্রূয়মাণ প্রয়োজনকে ‘ফল’ বলে। যেমন সেইখানে (বলা হয়েছে)—‘যিনি গুরুর উপদেশ পান, তিনি ব্রহ্মকে জানেন, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিকে ততকাল অপেক্ষা করতে হয়, যতক্ষণ না তাঁর শরীর নাশ হয়, শরীর ছাড়লেই তাঁর বিদেহ মুক্তি হয়।’ এইভাবে অদ্বিতীয় বস্তুজ্ঞানের প্রয়োজন যে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধ করা, তা শোনা যায়।।১৮৮।।

অর্থবাদ

প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য তত্র তত্র প্রশংসনম্ অর্থবাদঃ। যথা তত্রৈব “উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যো যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” [ছাঃ ৬।১।৩] **ইতি অদ্বিতীয়বস্তু-প্রশংসনম্।।১৮৯।।**

প্রকরণপ্রতিপাদ্য বস্তুকে প্রকরণের সেই সেই স্থানে প্রশংসা করার নাম অর্থবাদ। যেমন সেইখানেই—‘বৎস! তুমি কি সেই উপদেশগম্য বস্তুবিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলে—যা শুনলে অশ্রুতসব কিছু শ্রুত হয়ে যায়, যা মনন করলে সব কিছু মনন করা হয়ে যায়, যাকে সাক্ষাৎকার করলে অজ্ঞাত সকল বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়ে যায়, ইত্যাদিরূপে অদ্বিতীয় বস্তুর প্রশংসা’। (প্রশংসার দ্বারাও বোঝা যায়, প্রতিপাদ্য বস্তুটির স্বরূপ যথার্থ, নতুবা এরূপ উপযোগিতা কিভাবে হতে পারে?)।।১৮৯।।

উপপত্তি (যুক্তি)

প্রকরণ প্রতিপাদ্য অর্থসাধনে তত্র তত্র শ্রূয়মাণা যুক্তিঃ উপপত্তিঃ, যথা তত্র “সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ঃ বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং” [ছাঃ ৬।১।৪] **ইত্যাদৌ অদ্বিতীয় বস্তু সাধনে বিকারস্য বাচারম্ভণমাত্রত্বে যুক্তিঃ শ্রূয়তে।।১৯০।।**

প্রকরণ প্রতিপাদ্য বস্তুকে প্রমাণিত করার জন্য (সাধনে) সেই সেই স্থানে শ্রূয়মাণ যে যুক্তি তার নাম উপপত্তি। যেমন সেই ছান্দোগ্যে—“হে প্রিয়দর্শন, যেমন একখণ্ড মাটিকে জানলে মাটির বিকার ঘট প্রভৃতি সমস্ত জানা যায়, যেহেতু বিকার মাত্রই নামমাত্র—মৃত্তিকাই সত্য।” ইত্যাদি প্রকারে অদ্বিতীয় বস্তু বুঝাবার উপযোগী বিকার পদার্থের শব্দমাত্রত্ব বিষয়ে যুক্তি শোনা যায় ॥১৯০॥

অমৃত টীকা : ছান্দোগ্য উপনিষদের মতো অন্যান্য উপনিষদ্ থেকেও এরূপ ছয়টি লিঙ্গপ্রমাণ সহযোগে দেখানো যেতে পারে যে, সমগ্র বেদান্তের তাৎপর্য অদ্বৈতব্রহ্মসত্য বিঘোষণায় পরিসমাপ্ত। যথা বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকায় বৃহদারণ্যকে—‘আত্মেত্যেবোপাসীত অত্র হ্যেতে সর্ব একং ভবন্তি’ [বৃহঃ ১।৪।৭]—‘আত্মা এইরূপেই উপাসনা করবে (জানবে), কারণ ইহাতেই এই সমস্ত অভিন্নতা লাভ করে।’ এটি উপক্রম; ‘পূর্ণমদঃ’ [বৃঃ ৫।১১]—ব্রহ্ম পূর্ণ—এটি উপসংহার বাক্য; ‘স এষ নেতি নেতি আত্মা’—[বৃহঃ ৩।৯।২৬] তিনিই এই আত্মা যাঁকে নেতি নেতি বলা হয়েছে—এ হলো অভ্যাস; ‘তং তু উপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি’ [বৃঃ উঃ ৩।৯।২৬] ‘কেবল উপনিষদ্ থেকে জানা যায় যে-পুরুষকে, আপনাকে তাঁরই কথা জিজ্ঞেস করছি।’ —এতে অপূর্বতা সূচিত; ‘অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি’ [বৃঃ ৪।২।৪]—‘হে জনক! আপনি অভয় প্রাপ্ত হলেন’, ‘ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি’ [বৃঃ ৪।৪।৬]—‘ব্রহ্মস্বরূপ তিনি ব্রহ্মেই লীন হন’—এতে ফল বর্ণিত; ‘তদ্ যো যো দেবানাম্’—[বৃঃ ১।৪।১০] ‘দেবগণের মধ্যে যে কেহই জ্ঞান লাভ করলেন, তিনিই উক্ত ব্রহ্ম হলেন’—এই বাক্যে অর্থবাদ এবং ‘স যথা দুন্দুভেঃ’ [বৃঃ ২।৪।৭]—যেমন দুন্দুভি আহত হতে থাকলে তা থেকে নির্গত বিশেষ শব্দগুলিকে পৃথকভাবে গ্রহণ করা যায় না, ইত্যাদিতে যুক্তি, উপপত্তি দেখানো হয়েছে। এভাবে তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, মুণ্ডক উপনিষদ্, প্রভৃতি থেকেও অখণ্ড ব্রহ্ম-প্রতিপাদক এই ছয়টি প্রমাণ দেখানো যায়। এই ছয়টি সূচক লক্ষণের দ্বারা উপনিষদের মূল কথা—অখণ্ড অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে সত্য, তা বেশ বোঝা যায়।

এরূপে শ্রবণ বলতে বোঝা যায়, শাস্ত্রসমূহ ভালভাবে পড়ে তার তাৎপর্য ধারণা করা। গুরুমুখে শুনে এবং স্বয়ং পড়ে গ্রন্থের ও গুরুবাক্যের মূল তাৎপর্য নিশ্চয় করা॥১৯০॥

মনন শব্দের অর্থ

মননং তু শ্রুতস্য অদ্বিতীয়বস্তুনঃ বেদান্ত-অর্থ-অনুগুণ-

যুক্তিভিঃ অনবরতম্ অনুচিন্তনম্ ।।১৯১ ।।

শ্রুত অদ্বৈতবস্তুকে বেদান্তশাস্ত্রের তাৎপর্যের অনুকূল যুক্তির দ্বারা অনবরত চিন্তা করা ।।১৯১ ।।

অমৃত টীকা : শ্রুত গুরুবাক্যের, (পূর্বকালে গ্রন্থাদি না থাকায় শুনেই সকল শাস্ত্র অধিগত করতে হতো বলে মনে হয়), বা শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠের পর, অর্থাৎ পূর্বের লক্ষণ অনুসারে শাস্ত্রের মূল তাৎপর্য ধারণার পর, সেই ধারণার সহায়ক, অনুকূল অবিরোধী যুক্তির দ্বারা তত্ত্ববস্তুকে দৃঢ় নিশ্চয় করার নাম মনন। এভাবে অনবরত চিন্তনের কথা বলা হয়েছে। এতে যারা ব্রহ্মবস্তুকে লাভ করতে আগ্রহী, সে-সকল সাধকের অবশ্য কর্তব্য বলা হলো। কেবল গ্রন্থপাঠ ও তার মূলকথা বোঝাকে শ্রবণের অন্তর্গত করা হয়েছে। মনন তাই সাধকের সাধন। জ্ঞানযোগের সাধন অনবরত চিন্তন। কেবল পুরুষের বুদ্ধিসৃষ্ট যুক্তি অবলম্বন করে শুষ্ক তর্কের কথা এখানে বলা হয়নি। সেজন্য উপনিষদ্‌গম্য তত্ত্বকে উপনিষদের অনুকূল চিন্তায় ধারণা করাকেই মনন বলা হয়েছে— এভাবে মনকে চালিত করলেই নির্বিশেষ অখণ্ডস্বরূপের সাক্ষাৎকার সম্ভব। বিরোধী যুক্তি তুললে সে শুষ্কবিচারের শেষ নেই, তাতে কেবল সংশয়ই বাড়ে—মন বস্তুনিষ্ঠ হয় না। অবশ্য একবার গুরুমুখ থেকে শোনামাত্র যাঁদের তত্ত্ববোধ হয়ে যায়, তাঁদের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এখানে সাধারণের ক্রমই বলা হয়েছে। শ্রবণ থেকেই জ্ঞান হবে, এ-মত প্রসিদ্ধ আচার্যদের ।।১৯১ ।।

নিদিধ্যাসন শব্দের অর্থ

বিজাতীয়-দেহাদি-প্রত্যয়-রহিত-অদ্বিতীয়বস্তু-সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহঃ নিদিধ্যাসনম্ ।।১৯২ ।।

দেহ প্রভৃতি ব্রহ্মের বিজাতীয় বিষয়ে চিত্তবৃত্তি ত্যাগ করে অদ্বিতীয় বস্তু (ব্রহ্ম) বিষয়ক চিত্তবৃত্তিধারা প্রবাহিত করার নাম নিদিধ্যাসন ।।১৯২ ।।

অমৃত টীকা : নিদিধ্যাসন অর্থাৎ অবিচ্ছেদী ধ্যান। মাঝে অন্য কোন বৃত্তি উঠবে না। শ্রবণ ও মননের দ্বারা বিচার করে যে-স্বরূপে মন স্থির হয়ে যায়, তা ছেড়ে অন্য কোন বৃত্তি চিত্তে না ওঠাই নিদিধ্যাসন। বিচারমুখে নেতি নেতি করে অবশেষে যে চৈতন্যমাত্র থাকে, তাতে চিত্ত স্থির করাকেই নিদিধ্যাসন বলা হয় ।।১৯২ ।।

সমাধি

সমাধিঃ তু দ্বিবিধঃ—সবিকল্পকঃ নির্বিকল্পকঃ চ ইতি।।১৯৩।।

সমাধি দু-প্রকার—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক।।১৯৩।।

অমৃত টীকা : ব্যুত্থান সংস্কারের অভিভব (পরাভব) ও নিরোধ সংস্কারের উদয় হলে চিত্তের যে একাগ্রতারূপ পরিণাম তাকে সমাধি বলে।

সমাধি সবিকল্পক অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত এবং নির্বিকল্পক অর্থাৎ অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে দু-রকম।।১৯৩।।

সবিকল্পক সমাধি

তত্র সবিকল্পকঃ নাম জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি-বিকল্প-লয়-অনপেক্ষয়া অদ্বিতীয়-বস্তুনি তদাকার-আকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ অবস্থানম্।।১৯৪।।

তার মধ্যে সবিকল্প সমাধি হলো (চিত্তের যে একাগ্র অবস্থায়)—জ্ঞান জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা— এই সকল বিভাগ-বোধ লুপ্ত না হয়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে চিত্ত সেই ব্রহ্মবস্তুর আকারে আকারিত হয়ে অবস্থান করে।।১৯৪।।

তদা মৃন্ময় গজাদিভানে অপি মৃদ্ভানবৎ দ্বৈতভানে অপি অদ্বৈতং বস্তু ভাসতে।।১৯৫।।

যেমন মাটির তৈরি গজ প্রভৃতির জ্ঞানকালেও 'এগুলি মাটি' এরূপ বোধ হয়, সেরূপ সবিকল্পক সমাধিকালে জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি দ্বৈতবোধ হলেও অদ্বৈতবস্তু প্রকাশিত হয়।।১৯৫।।

—তদুক্তম্ অভিযুক্তৈঃ—

দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরং,
সকৃদ্বিভাতং ত্বমজমেকমক্ষরম্।
অলেপকং সর্বগতং যদদ্বয়ং
তদেব চাহং সততং বিমুক্তমোম্।। ইতি

[উপদেশসাহস্রী ৭৩।১০।১] **দৃশিস্তু শুদ্ধঃ অহম্ অবিক্রিয়াত্মকো ন মে অস্তি বন্ধঃ ন চ মে বিমোক্ষঃ। ইত্যাদি।।১৯৬।।**

যেমন জ্ঞানিগণ বলেছেন—দ্রষ্টাস্বরূপ, আকাশসদৃশ, শ্রেষ্ঠ, সর্বদা একরূপে প্রকাশমান, জন্মরহিত, উপাধিশূন্য, কূটস্থ, অসঙ্গ, সর্বব্যাপী সদামুক্ত যে অদ্বয়বস্তু তাহাই আমি।

'আমি শুদ্ধ, বিকারশূন্য, চৈতন্যস্বরূপ, আমার বন্ধন নাই, মুক্তিও নাই' ইত্যাদি ॥১৯৬॥

অমৃত টীকা ঃ দু-প্রকারের সমাধির মধ্যে সবিকল্পক সমাধির সামান্যভাবে আলোচনা বেদান্তসার গ্রন্থে করা হয়েছে। অনেক আচার্যের মতে বেদান্ত অনুভব করতে সমাধি সাধনার প্রয়োজন নেই। মনন বলে দৃঢ় ধারণায় প্রতিষ্ঠিত মন স্বয়ংই নিদিধ্যাসনাখ্য ধ্যানে তন্ময় হয় এবং তাতেই ব্রহ্মাববোধ হয়। কেহ বলেন, শ্রবণেই তাৎক্ষণিক বোধ ঘটে, শ্রবণই ব্রহ্মাবোধের একমাত্র উপায় ইত্যাদি বিষয়ে মতভেদ আছে। আলোচ্য গ্রন্থে সমাধির কথা বলায় কেহ কেহ একে বেদান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছেন। পতঞ্জলোক্ত সমাধি বেদান্তবোধের পক্ষে আবশ্যকীয় নয়, এই তাঁদের মত। যদি তা অত্যাবশ্যকীয় হয়, তবে জ্ঞানযোগে সাক্ষাৎ মুক্তি না হয়ে যোগমতের সাধনাতেই মুক্তি হবে বলে ধরে নিতে হয়। সে-ক্ষেত্রে বেদান্ত যোগের সহায়কমাত্র হয়ে দ্বিতীয় স্থানাধিকার করবে। সুতরাং তাঁদের মতে জ্ঞান-বলেই ব্রহ্মাববোধ বা মুক্তি লাভ—এ ক্ষেত্রে সমাধির প্রয়োজন নেই।

সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক সমাধির বিস্তারিত বর্ণনা যোগগ্রন্থে দ্রষ্টব্য ॥১৯৪-১৯৬॥

নির্বিকল্প সমাধি

নির্বিকল্পকঃ তু জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়-অপেক্ষয়া অদ্বিতীয়-বস্তুনি তদাকার-আকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ অতিতরাং একীভাবেন অবস্থানম্ ॥১৯৭॥

নির্বিকল্প সমাধিতে কিন্তু জ্ঞাতা জ্ঞান জ্ঞেয় প্রভৃতি লয় হওয়ার অপেক্ষা (অর্থাৎ বিকল্প তিনটির লয় হয়ে) থাকে। চিত্তবৃত্তি অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে ব্রহ্মাকারাকারিতা হয়ে ব্রহ্মের সঙ্গে অতিশয় একীভূত হয়ে অবস্থান করে—একেই নির্বিকল্প সমাধি বলে ॥১৯৭॥

অমৃত টীকা ঃ নির্বিকল্প অর্থাৎ কোন বিকল্পভাব নেই। বিকল্পভাব এখানে—আমি জ্ঞাতা, জ্ঞানক্রিয়া ও জ্ঞেয় ব্রহ্মের বোধ। চিত্ত অতি দ্রুত এই

তিনের বৃত্তি নিতে থাকে, তাতেই জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার বোধরূপ বিকল্প চিন্তা হতে থাকে। এইভাবে মগ্ন থাকাই হলো সবিকল্প—বিকল্প সহিত বর্তমান থাকা। এই তিনটির মধ্যে চিত্তের দ্রুত গমনাগমন রুদ্ধ হয়ে কেবল ব্রহ্মাকারা বৃত্তি স্থির হলে নির্বিকল্প সমাধি হয়। এই নির্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞান ও জ্ঞাতার বোধ থাকে না, জ্ঞেয় ব্রহ্মাকারা বৃত্তিটি অজ্ঞায়মান হয়ে থাকে বলে তারও লয় বলা হয়েছে। যদি অজ্ঞায়মান হয়ে চিত্তবৃত্তি না থাকে তবে, তার ব্যুত্থান সম্ভব হবে না। একেবারে বিদেহ মুক্তি হয়ে যাবে। একথাই শ্রীরামকৃষ্ণদেব একুশ দিনে দেহত্যাগের কথায় বলেছেন বলে অনুমিত হয়। এই নির্বিকল্প সমাধি দু-প্রকারের হয় বলে সুবোধিনী টীকাকার টীকায় উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি দীর্ঘকালীন সবিকল্প সমাধির সংস্কার সহিত ত্রিপুটী জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের লয় হয়ে অদ্বিতীয় ব্রহ্মে একীভূত হয়ে হয়; দ্বিতীয়টিতে নির্বিকল্প সমাধি অভ্যাসজনিত সংস্কার লুপ্ত হয়ে জ্ঞাত্রাদি ত্রিপুটী লয়পূর্বক অখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তির নিজ স্ফূর্তি ছাড়াই কেবল চিদানন্দাত্মায় অবস্থান। এটি পূর্বানুভূত নির্বিকল্প সমাধির অভ্যাসবলে নিরোধ সংস্কারের প্রাবল্যে হয়ে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যে উভয়বিধ সমাধির বর্ণনা দেখা যায়। একটিতে কোন ভাব অবলম্বনে সবিকল্প সমাধির ক্রমে নির্বিকল্পে, অপরটিতে হঠাৎ একেবারে নির্বিকল্প অবস্থায় অবস্থান ।।১৯৭।।

সুষুপ্তি ও নির্বিকল্প সমাধির ভেদ

তদা তু জলাকার-আকারিত-লবণ-অনবভাসেন জল-মাত্র-অবভাসবৎ অদ্বিতীয়বস্তু-আকার-আকারিত-চিত্তবৃত্তি-অনবভাসেন অদ্বিতীয়বস্তুমাত্রম্ এব অবভাসতে।।১৯৮।।

লবণ জলে মিশে গেলে জলের আকারে আকারিত লবণের পৃথক জ্ঞান না হয়ে যেমন জলমাত্রেরই জ্ঞান হয়, সেরূপ নির্বিকল্পক অবস্থাতে অদ্বিতীয় বস্তুর আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির জ্ঞান না হয়ে কেবল অদ্বিতীয় বস্তুই প্রকাশিত হয় ।।১৯৮।।

ততঃ চ অস্য সুষুপ্তেঃ চ অভেদাশঙ্কা ন ভবতি, উভয়ত্র বৃত্তি-অভানে সমানে অপি তৎ-সদ্‌ভাব, অসদ্‌-ভাবমাত্রেণ অনয়োঃ ভেদ-উপপত্তেঃ ।।১৯৯।।

সেই কারণে, এই নির্বিকল্প সমাধি ও সুষুপ্তির অভেদ আশঙ্কা হতে পারে না। উভয়ক্ষেত্রে সমানভাবে চিত্তবৃত্তির জ্ঞান না থাকলেও নির্বিকল্প সমাধিতে বুদ্ধিবৃত্তি (ব্রহ্মাকার আকারিত হয়ে) বর্তমান থাকে আর সুষুপ্তিতে বুদ্ধিবৃত্তি থাকে না। এইজন্য উভয়ের ভেদ সিদ্ধ হয়॥১৯৯॥

অমৃত টীকা ঃ সমাধিতে অখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তি অজ্ঞায়মান হয়ে থাকে। সুষুপ্তিতে বৃত্তির লয় হয়। সুষুপ্তির পর যে স্মরণ হয়, তা অজ্ঞানবৃত্তি বলে হয়। সমাধিতে অজ্ঞায়মান চিত্তবৃত্তির অস্তিত্ববিষয়ে মতভেদ আছে। আচার্য মধুসূদন প্রভৃতি অনেকে সমাধিতে বৃত্তিমাত্রের অভাব স্বীকার করেন। আলোচ্য গ্রন্থের রচয়িতা, আনন্দগিরি প্রভৃতি অখণ্ডাকারা বৃত্তির অস্তিত্ব মানেন॥১৯৯॥

সমাধির অঙ্গ

অস্য অঙ্গানি—যম-নিয়ম-আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়ঃ॥২০০॥

নির্বিকল্প সমাধির অঙ্গ (৮টি)—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি॥২০০॥

যম

তত্র অহিংসা-সত্য-অস্তেয়-ব্রহ্মচর্য-অপরিগ্রহাঃ যমাঃ॥২০১॥

অর্থ স্পষ্ট॥২০১॥

অমৃত টীকা ঃ বাক্য মন ও শরীরে পরপীড়া না দেওয়াই অহিংসা; যথার্থ ভাষণই সত্য। অস্তেয় অর্থ অচৌর্য। ব্রহ্মচর্য অষ্টাঙ্গ মৈথুন ত্যাগ। বলা হয়েছে—

স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিবৃত্তিরেব চ ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্যমেতদেবাষ্টলক্ষণম্॥ ইতি [দক্ষসংহিতা ৭ম পরিচ্ছেদ]

অপরিগ্রহ হলো—সমাধি অনুষ্ঠানের উপযোগী নয় এমন বস্তুমাত্র গ্রহণ না করা॥২০১॥

নিয়ম

শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়-ঈশ্বর-প্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥২০২॥

অর্থ স্পষ্ট ॥২০২॥

অমৃত টীকা : শৌচ দুই প্রকার—বাহ্য ও আভ্যন্তর। দক্ষসংহিতায় পঞ্চম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যাভ্যন্তরং তথা।

মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ।।

মাটি জল দিয়ে শরীরের মল দূর করা বাহ্যশৌচ ও সদ্‌ভাবনা ঈশ্বর চিন্তার দ্বারা মনের শুদ্ধিতাই আভ্যন্তর শৌচ।

সন্তোষঃ—যদৃচ্ছালাভতুষ্ট এবং না পেলে দুঃখ না করা। তপঃ—কামনা না করাই তপস্যা। উপবাসই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। উপবাস বলতে এখানে কামনা না করাকেই বুঝিয়েছেন। অপরে বলেন মন ও ইন্দ্রিয়ের একাগ্রতা সম্পাদনই শ্রেষ্ঠ তপস্যা। এখানে চান্দ্রায়ণাদি তপস্যাকে গ্রহণ করা হয়নি। কারণ তা সমাধির বিরুদ্ধ সাধনমাত্র।

স্বাধ্যায় বলতে প্রণব জপ বা ইষ্ট মন্ত্রজপ উপনিষদ্ গ্রন্থ-আবৃত্তি বুঝিয়েছেন। যথা 'ওম্ ইতি এবম্ ধ্যায়থ আত্মানম্' [মুণ্ডঃ ২।২।৬] 'উপনিষদমাবর্তয়েৎ' [আরুণেয় উপঃ ২] শ্রুতিতে বলা হয়েছে।

ঈশ্বরপ্রণিধান—ঈশ্বরকে মানস উপচারে অর্চনা করা বা সকল কর্মফল তাঁকে অর্পণ করা বোঝায়। 'তং হ দেবাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুঃ বৈ শরণম্ অহং প্রপদ্যে'—এরূপ উপনিষদে বলা আছে।।২০২।।

আসন

করচরণাদি-সংস্থান-বিশেষ-লক্ষণানি পদ্ম-স্বস্তিকাদীনি আসনানি ॥২০৩॥

হাত পা প্রভৃতির সন্নিবেশে বিশেষকে আসন বলে, যেমন—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন ইত্যাদি ॥২০৩॥

অমৃত টীকা : যেভাবে অনেকক্ষণ স্থিরভাবে সুখে বসে থাকা যায়, তার নাম আসন। 'স্থিরসুখমাসনম্' [পঃ যোঃ সূঃ সাধনপাদ ৪৬] ॥২০৩॥

প্রাণায়াম

রেচক-পূরক-কুম্ভক-লক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহ-উপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ ॥২০৪॥

প্রাণায়াম হলো [শ্বাসবায়ুর] গ্রহণ, ভিতরে ধারণ ও বাহিরে ত্যাগরূপ প্রাণ নিরোধের উপায় ॥২০৪॥

অমৃত টীকা : শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি সংযত করাকে প্রাণায়াম বলে। 'তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ'॥ [পতঞ্জলি-৪৯] ॥২০৪॥

প্রত্যাহার

ইন্দ্রিয়াণাং স্ব-স্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ ॥২০৫॥

ইন্দ্রিয়গুলিকে নিজ নিজ বিষয় থেকে নিবৃত্তকরণের নাম প্রত্যাহার ॥২০৫॥

অমৃত টীকা : যখন ইন্দ্রিয়সকল তাদের নিজ নিজ বিষয় ত্যাগ করে যেন চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে, তখন তাকে প্রত্যাহার বলে—(বাণী ও রচনা ১।৩৭৩ দ্রষ্টব্য)।

যোগসূত্র হলো—স্ববিষয়-অসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপ—অনুকার ইব ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ। [পঃ যোঃ সূত্র সাধনপাদঃ ৫৪]

যৌগিক প্রক্রিয়া প্রাণায়ামের সাহায্যে বলপূর্বক বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়কে ফিরিয়ে এনে যেন চিত্তের বৃত্তিহীন স্বরূপে রাখাই প্রত্যাহার। জ্ঞানিগণ বিচারের দ্বারা তা করেন। এখানেই জ্ঞানযোগের স্বাতন্ত্র্য। পাষাণে প্রযুক্ত শরক্ষেপে যেমন শর প্রত্যাবৃত হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় থেকে প্রত্যাবৃত হলে তাকে প্রত্যাহার বলে। এ বড় কঠিন ব্যাপার। কারণ, শব্দ প্রভৃতি বিষয় ভোগজনিত আনন্দ সহজলভ্য। আর বিষয়সুখ ছাড়া অতীন্দ্রিয় নিরতিশয় আনন্দ যে আছে, তার প্রমাণ নেই।

ধর্মশাস্ত্রাদিতে সে-কথা বললেও মানুষের বিশ্বাস হতে চায় না। আরো দেখা যায়, মহা মহা সাধুসন্তগণও শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সুখে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন; হিরণ্যগর্ভের আনন্দত্যাগ করা ঈশ্বরের পক্ষেও দুষ্কর। এরূপ অবস্থায় ইন্দ্রিয়সুখ ত্যাগ করে মনকে গুটিয়ে এনে চিত্তের স্বরূপে যেন মিলিয়ে দেওয়া, অসম্ভব। সুবোধিনী টীকাকার এভাবে আক্ষেপ তুলে তার সমাধানকল্পে বলেছেন, মূঢ় কর্মজড় বিষয়লম্পট তা ত্যাগ করতে না পারলেও বিষয়দোষদর্শী শুদ্ধ অন্তঃকরণের পুরুষোত্তমগণ সংসার অবিদ্যাকল্পিত জেনে তা করতে পারেন। তা না হলে সংসার

তাঁদের লুব্ধ করত। শাস্ত্রে ত্যাগের উপদেশ যেমন দিয়েছেন, তেমনি অনিত্য বিষয়সুখের চাইতেও অনন্তগুণ বেশি নিত্য সুখস্বরূপ আত্মা যে আছেন সে-বিষয়েও অনেক প্রামাণিক কথা বলেছেন। ত্যাগ বিষয়ে বলা হয়েছে ঃ

'তস্মান্ন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তম্ আহুঃ।' [মহা নারায়ণ উঃ ২৪।১] 'এতমেব লোকমিচ্ছন্ত প্রব্রাজিনঃ প্রব্রজন্তি' [কৌঃ ৪।৪।২২] 'ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ' [মহাঃ নাঃ ১০/৫] 'ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেৎ' 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ বনদ্বা গৃহদ্বা।' [জাঃ উঃ ৪] এভাবে বৈরাগ্যের উপদেশ করে আনন্দঘন অবস্থার কথা উপনিষদে বহুশঃ উক্ত হয়েছে। যেমন—'আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ' [তৈঃ উঃ ৩/৬/১] 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' [বৃঃ উঃ ৪/৩/৩২] 'এষাস্য পরমানন্দঃ' [বৃঃ ৪।৩।৩২] 'আত্মৈবানন্দঃ' [তৈঃ উঃ ২।৫।১] ইত্যাদি শ্রুতিতে নিত্যাত্মসুখের কথা বলা হয়েছে। পার্থিব শব্দ স্পর্শাদি সুখ ছাড়াও যে অনন্ত আনন্দ রয়েছে, এই সকলই তার প্রমাণ।।২০৫।।

ধারণা

অদ্বিতীয়বস্তুনি অন্তরিন্দ্রিয়-ধারণাং ধারণা।।২০৬।।

অদ্বিতীয় বস্তুতে অন্তঃকরণের ধারণকে ধারণা বলে।।২০৬।।

অমৃত টীকা ঃ সকল বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে বিদ্যমান অদ্বিতীয় আত্মবস্তুতে চিত্তকে ধরে রাখাকে ধারণা বলে। 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা' [পঃ যোঃ সূঃ বিভূতিপাদ ১]। চিত্তকে কোন দেশে বন্ধ বা স্থিত করাই ধারণা। দেহের কোন স্থানে অথবা কোনও বিষয়ে অন্তরিন্দ্রিয়ের বৃত্তির দ্বারা চিত্তকে বদ্ধ রাখার নাম ধারণা, জ্ঞানীরা অদ্বিতীয় বস্তুতে মনের অভিনিবেশকে ধারণা বলেছেন।।২০৬।।

ধ্যান

তত্র অদ্বিতীয় বস্তুনি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য অন্তরিন্দ্রিয়বৃত্তি-প্রবাহঃ ধ্যানম্।।২০৭।।

অদ্বিতীয় বস্তুবিষয়ে অন্তঃকরণের বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বৃত্তি প্রবাহকে ধ্যান বলে।।২০৭।।

অমৃত টীকা : ধারণার পটুতার অভাবে অদ্বিতীয় আত্মবস্তুকে, মন একতানভাবে ধরে রাখতে পারে না, মধ্যে মধ্যে রূপ-রসাদিতে চিত্ত ধাবিত হয়—আবার তাকে আত্মবৃত্তিতে যুক্ত করতে হয়। এরূপ বৃত্তি প্রবাহকেই ধ্যান বলে। যোগসূত্রে 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্' বলেছেন। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট দেশে চিত্তকে ধরে রেখে সেখানে জ্ঞানের একতানতাই ধ্যান ।।২০৭।।

সমাধি

সমাধিঃ তু উক্তঃ সবিকল্পক এব ।।২০৮।।

সমাধি বিষয়ে বলা হয়েছে, তা কিন্তু [অঙ্গরূপ] সবিকল্পকই ।।২০৮।।

অমৃত টীকা : 'তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ' [পঃ যোঃ সূঃ বিভূ-৩]—ধ্যেয় বিষয়মাত্রই যখন বিজ্ঞাত হতে থাকে, ধ্যানক্রিয়ার স্বরূপ বোধও থাকে না, তখন সমাধি হয়। ধ্যেয়স্বরূপের বিষয়ে চিত্ত আবিষ্ট হয়, প্রত্যয়স্বরূপ বোধ থাকে না, অর্থাৎ 'আমি ধ্যান করছি' এ-বোধ প্রায় থাকে না। 'ইব' শব্দের প্রয়োগে বোঝা যাচ্ছে অহং-বোধ থাকে না, তা নয়, থাকে—তবে, অজ্ঞায়মান হয়ে থাকে। না থাকলে নির্বিকল্প সমাধি হয়ে যেত ।।২০৮।।

বিঘ্ন

এবম্ অস্য অঙ্গিনঃ নির্বিকল্পকস্য লয়-বিক্ষেপ-কষায়-রসাস্বাদ-লক্ষণাঃ চত্বারঃ বিঘ্নাঃ সম্ভবন্তি ।।২০৯।।

এই অঙ্গী নির্বিকল্পক সমাধির লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ—চারটি বিঘ্ন আছে ।।২০৯।।

অমৃত টীকা : উক্ত যম প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা নির্বিকল্পক সমাধি অনুষ্ঠানকালে যে-সকল বিঘ্ন আসে তার পরিচয় জানা থাকা যোগিগণের প্রয়োজন। জানা থাকলে, তাদের অতিক্রম বিষয়ে সঠিক ধারণা থাকায় তাদের দ্বারা প্রভাবিত ও অভিভূত না হয়ে যোগীর যোগানুষ্ঠান সহজে হতে পারে বলে বিঘ্নের পরিচয়, স্বরূপ ও অতিক্রমোপায় বলা হচ্ছে ।।২০৯।।

লয়

লয়ঃ তাবৎ অখণ্ডবস্তু-অনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তেঃ নিদ্রা ।।২১০।।

অখণ্ড বস্তুকে অবলম্বন না করে চিত্তবৃত্তির যে-অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিরূপানিদ্রা, তাকে লয় বলে ॥২১০॥

অমৃত টীকা : নির্ধর্মক আত্মাতে মনোনিবেশ করতে গেলে প্রথমে মনের বিষয়াকারা বৃত্তি দূর করতে হয়, তখন নির্বিকল্প শুদ্ধ আত্মাকে মন সহসা বিষয় করতে না পেরে অভাবাত্মক হয়ে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে—একেই লয় বলে। এই প্রকার লয় যোগবিঘ্ন। কিন্তু বিষয়-প্রত্যাখ্যাত চিত্ত যদি অখণ্ডাকারাকারিত হয়ে তৈলরহিত প্রদীপশিখার মতো নির্বিকল্পক আত্মাতে লীন হয় তবে, যে-লয় হয়, সেই লয় ঈপ্সিত, তা যোগের লক্ষ্য, তা ত্যাজ্য নয়। তা কাম্য। এখানে যোগবিঘ্নস্বরূপ লয়ের কথাই বলা হয়েছে ॥২১০॥

বিক্ষেপ

অখণ্ডবস্তু-অনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তেঃ অন্যাবলম্বনং বিক্ষেপঃ ॥২১১॥

অখণ্ড বস্তুকে অবলম্বন না করে চিত্তে যে অন্য বিষয়ের বৃত্তি ওঠে তাকে বিক্ষেপ বলে ॥২১১॥

কষায়

লয়-বিক্ষেপ-অভাবে অপি চিত্তবৃত্তেঃ রাগাদিবাসনয়া স্তব্ধীভাবাৎ অখণ্ডবস্তু-অনবলম্বনং কষায়ঃ ॥২১২॥

লয় বিক্ষেপ না থাকলেও রাগাদি বাসনায় স্তব্ধীভূত (জড় মারা) মন অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু অবলম্বন করতে পারে না—তাকে কষায় বলে ॥২১২॥

অমৃত টীকা : রাগাদির তিনটি রূপ— (১) বাহ্য বিষয়—স্ত্রীপুত্রাদি (২) আভ্যন্তর—মানসিক (৩) বাসনামাত্ররূপ সংস্কার। অনেক জন্মের সুখদুঃখাদি অনুভবজনিত সংস্কার দ্বারা কলুষিত মন শ্রবণাদি সাধনে অন্তর্মুখী হলেও চৈতন্যস্বরূপের ধারণা করতে পারে না, ধ্যানকালে মন স্তব্ধীভূত হয়ে থাকে। যেমন রাজদর্শনে বাড়ি থেকে বার হয়ে রাজনিকেতনে প্রবেশপথে দ্বারবান আটকে দিলে মানুষ স্তব্ধীভূত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেরূপ অখণ্ড আত্মাকে ধারণা করতে গিয়ে পরিত্যক্ত বাহ্যবিষয়গুলির সংস্কাররাশি সূক্ষ্মভাবে বাধাস্বরূপ হয়ে থাকে—এরূপ অবস্থাকে কষায় বলে ॥২১২॥

রসাস্বাদন

অখণ্ডবস্তু-অনবলম্বনেন অপি চিত্তবৃত্তেঃ সবিকল্পক আনন্দ-আস্বাদনং রসাস্বাদনঃ, সমাধ্যারম্ভসময়ে সবিকল্পক-আনন্দ-আস্বাদনং বা।।২১৩।।

অখণ্ড ব্রহ্মবস্তু অবলম্বন না করে চিত্তের যে সবিকল্পক আনন্দ আস্বাদ অথবা নির্বিকল্প সমাধি আরম্ভ সময়ে সবিকল্পক সমাধিজনিত আনন্দাস্বাদ, তার নাম রসাস্বাদ।।২১৩।।

অমৃত টীকা : আগে কথিত সবিকল্প সমাধির মধ্যে মহাবাক্য শ্রবণের পর জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতা ভেদজ্ঞানবিশিষ্ট একাগ্র মনে যে-আনন্দ হয়, তা বাহ্য প্রপঞ্চের বোধহীনতার জন্য হয়ে থাকে, চৈতন্য-প্রযুক্ত আনন্দ নয়। যেমন গুপ্তধন সন্ধানী ধনের সন্ধান পেলেও সে-সম্পদ গ্রহণের অন্য কোন বাধা নেই দেখলে যেরূপ আনন্দ হয়, এ-আনন্দ সেইরূপ হলেও ধর্মপ্রাপ্তির অর্থাৎ চৈতন্য আনন্দস্বরূপ প্রাপ্তিজনিত আনন্দ নয়। একে ব্রহ্মানন্দ ভ্রমে আস্বাদন করতে থাকলে স্বরূপপ্রাপ্তি হয় না বলে এই রসাস্বাদনও যোগবিঘ্ন। অথবা নির্বিকল্পক সমাধির আরম্ভকালে অনুভূয়মান সবিকল্পক আনন্দ আস্বাদনকে ত্যাগ করতে না পেরে পুনরায় সেই আনন্দ গ্রহণকে 'রসাস্বাদন' নামক যোগবিঘ্ন বলা হয়। [ইতি সুবোধনী] ।।২১৩।।

নির্বিকল্পক সমাধি কখন হয়

অনেন বিঘ্নচতুষ্টয়েন বিরহিতং চিত্তং নির্বাত-দীপবৎ অচলং সৎ অখণ্ড-চৈতন্যমাত্রম্ অবতিষ্ঠতে যদা, তদা নির্বিকল্পকঃ সমাধিঃ ইতি উচ্যতে।।২১৪।।

এই চার প্রকার বিঘ্নশূন্য হয়ে চিত্ত যখন বায়ুপ্রবাহ-শূন্য স্থানে অবস্থিত প্রদীপ শিখার মতো অচল হয়ে অখণ্ড চৈতন্যমাত্রে অবস্থিত থাকে, তখন চিত্তের সেরূপ অবস্থানকে নির্বিকল্পক সমাধি বলে।।২১৪।।

তদুক্তং—

**"লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াৎ শমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ।।"**

"নাস্বাদয়েৎ রসং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ।।" ইতি
[গৌড়পাদ কারিকা ৩।৪৪,৪৫]

"যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা" ইতি চ
[গীতা ৬।১৯] ।।২১৫।।

বলাও হয়েছে—লয় উপস্থিত হলে চিত্তকে জাগরিত করবে, বিক্ষিপ্ত হলে তাকে পুনরায় শান্ত করবে, কষায়যুক্ত চিত্তকে লক্ষ্য করবে অর্থাৎ যাতে উদ্যমহীন নিশ্চেষ্ট না হয়ে থাকে, তা দেখবে। শান্ত চিত্তকে বিচলিত করবে না, আর এই অবস্থায় যে-আনন্দ হবে, তা আস্বাদন করবে না। পরন্তু, বিবেকবলে নিঃসঙ্গ থাকবে। [গৌড়পাদ কারিকা] গীতায় বলা হয়েছে, বায়ুরহিত স্থলে প্রদীপশিখা যেমন চঞ্চল হয় না, দীপের সেই অচঞ্চল শিখা সমাধিকালে চিত্তের দৃষ্টান্ত।।২১৫।।

অমৃত টীকা ঃ লয়াদি বিঘ্ন চারটির অনুপস্থিতিতে চিত্তের যে চিন্মাত্ররূপে অবস্থান তাকে নির্বিকল্পক সমাধি বলে। এই অবস্থাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ আত্মা এক। বোধে বোধ।

ধ্যান করতে গিয়ে অনভ্যস্ত মন ঘুমিয়ে পড়ে। তখন চিত্তগত জড়তা ঝেড়ে ফেলে মনকে আত্মবিষয়ে লাগাতে হবে। মন বিষয়-বাসনা-বিক্ষিপ্ত হলে, বিষয়দোষ ভাবনা করে অর্থাৎ অসারত্ব সম্যক্ ধারণা করে চিত্তকে আত্মনিষ্ঠ করতে হবে, অর্থাৎ তার বহির্মুখীনতা রোধ করে অন্তর্মুখী করতে হবে। চিত্ত যদি রাগাদি কষায় যুক্ত হয় তবে, তাকে জানতে হবে, যে এটি রাগাদি বাসনা—এ বাহ্যবিষয়প্রাপক, এ অখণ্ডবস্তুর সাধক নয়, অতএব ত্যাজ্য। চিত্ত যখন রাগাদি বাসনাক্ষয় করে স্থির থাকবে, তখন চিত্তকে স্বস্থান থেকে চালনা করবে না। বাসনাক্ষয় হলে চিত্ত নিজেই প্রত্যক্ চেতনাকে ধারণ করতে একাগ্র হয়। এ অবস্থায় সবিকল্প সমাধি জনিত আনন্দ হয়। এই আনন্দ বিষয়প্রপঞ্চভাব ত্যাগজনিত বলে তা আদরণীয় নয়। এই আনন্দকে আস্বাদন করতে থাকলে চিত্ত আত্মবস্তুকে ধারণা করতে বিরত থাকে। সুতরাং তখন আনন্দ আস্বাদন না করে প্রজ্ঞাযুক্ত অর্থাৎ 'আমি আনন্দস্বরূপ'—আনন্দ আস্বাদনরূপ কর্ম থেকে আলাদা চিন্মাত্রস্বরূপ, এরূপ বুদ্ধিতে স্থির আত্মবস্তু ধারণা করতে চেষ্টিত হবে। সুতরাং তখন আনন্দ আস্বাদন না করে প্রজ্ঞাযুক্ত স্থির থাকতে হবে। এভাবে লয়াদি বিঘ্নচতুষ্টয়রহিত চিত্তের যে চিন্মাত্রভাবে অবস্থান, তাকেই নির্বিকল্পক সমাধি বলা হয়েছে। 'শান্তোদিতৌ তুল্যপ্রত্যয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতা পরিণামঃ।' [পঃ যোঃ সূঃ ৩/১২]

শান্ত অর্থাৎ অতীত, উদিত মানে বর্তমান, প্রত্যয় হলো চিত্তবৃত্তি—তাহলে সূত্রের অর্থ হলো অতীতে যে-বিষয়ক বৃত্তি ছিল বর্তমান ক্ষণে সে-বিষয়ক বৃত্তি গ্রহণই তুল্য প্রত্যয়। তুল্য প্রত্যয় হলে চিত্ত একাগ্র হয়—চিত্তের একাগ্রতা পরিণাম। এ তো সমাধি নয়। একাগ্রতার বৃদ্ধিতে যখন সমাধি হয় তখন 'সর্বার্থতৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্য পরিণামঃ সমাধিঃ' [পঃ যোঃ সূঃ ৩/১১] সর্বার্থ চাওয়া হয় রজোগুণে, একাগ্রতা হলে রজোগুণের প্রবলতা কমে যায়। এভাবে রজস্তমো মল চলে গেলে চিত্তের সমাধি পরিণাম হয়। এখানে সম্প্রজ্ঞাত সমাধির নানাস্তর পেরিয়ে চিত্ত নিরোধ সমাধি অবস্থায় পৌঁছে। তার লক্ষণ 'ব্যুত্থাননিরোধ-সংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণ চিত্তান্বয়ঃ নিরোধপরিণামঃ' [পঃ যোঃ সূঃ ৩/৯] তখন ব্যুত্থান সংস্কার সমাধি বিরোধী বলে প্রতিদিন নিরোধ-সংস্কার বলে যোগী প্রযত্নের দ্বারা তাকে অভিভূত করে ফেলে—এরূপভাবে চিত্ত নির্বৃত্তিক হলে নিরোধ পরিণাম প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নির্বিকল্পক সমাধি হয়, যোগ মতে তখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। বৃত্তিহীন বলে কিছুই জানা যায় না। প্রকৃতি ও পুরুষ-চৈতন্য বিবিক্ত; পৃথক হয়ে পড়ে। একে কৈবল্য বলে। বেদান্ত মতে প্রকৃতির আলাদা সত্তা থাকে না ।।২১৪-২১৫ ।।

জীবন্মুক্তলক্ষণ

অথ জীবন্মুক্ত-লক্ষণম্ উচ্যতে ।।২১৬।।

অতঃপর জীবন্মুক্তের লক্ষণ বলা হচ্ছে ।।২১৬ ।।

জীবন্মুক্তঃ নাম স্বস্বরূপাখণ্ড (শুদ্ধ)-ব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপাখণ্ডে ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে সতি অজ্ঞান তৎকার্যসঞ্চিতকর্মসংশয়বিপর্যয়াদীনাম্ অপি বাধিতত্বাৎ অখিল-বন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ।।২১৭ ।।

'নিজ আত্মা অখণ্ড শুদ্ধ ব্রহ্ম'—এরূপ জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান বাধিত (দূর) হয়ে নিজের স্বরূপ যে অখণ্ড ব্রহ্ম তা সাক্ষাৎকার হয়। তখন অজ্ঞান ও তার কার্য সঞ্চিত কর্ম, সংশয় ও বিপরীত জ্ঞান প্রভৃতিও বাধিত হয়ে যাওয়ায় সকল বন্ধনশূন্য ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই জীবন্মুক্ত নামে কথিত হয় ।।২১৭ ।।

'ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে'।। ইত্যাদি শ্রুতেঃ
[মুঃ ২/২/৮] ।।২১৮।।

শ্রুতিতে বলা হয়েছেঃ পর ও অপর অর্থাৎ সর্বাত্মক পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হলে হৃদয়ের গ্রন্থি (অর্থাৎ অন্তঃকরণনিষ্ঠ যে ভ্রম, তা) নষ্ট হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় এবং তার সকল কর্মসংস্কার দগ্ধ হয়।।২১৮।।

অমৃত টীকা : জীবন্মুক্ত অর্থে জীবিত অবস্থাতে মুক্ত। জীবিত থাকা মানেই অহংকার-মন-বুদ্ধি-দেহ- ইন্দ্রিয়ে আমিত্ববোধ-অভিমান। আর মুক্তি অর্থে, এ-সকলে অভিমান না থাকা। পরন্তু, ব্রহ্মনিষ্ঠ হওয়া অর্থাৎ'আমি চিন্মাত্র স্বরূপ, ব্রহ্মস্বরূপ' এরূপ বোধ করা। অবিদ্যা ও তার কার্য নিবৃত্ত হলে জ্ঞানীর শরীর থাকবে না। তা হলে জীবন্মুক্ত হওয়া কি প্রকারে সম্ভব? এরই উত্তরে বলা হয়েছে—'ব্রহ্মই আত্মা' এরূপ বোধ হলে অবিদ্যা ও তার কার্য যে অহংকার ইত্যাদি সকল সংসার বোধের নিবৃত্তি বোঝায়। তার প্রারব্ধকর্ম ব্যতীত সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম সংস্কার ধ্বংস হয়। প্রারব্ধকর্ম ক্ষয় হলে সেই জ্ঞানীর শরীরপাত হয়। প্রারব্ধকর্ম ক্ষয় না হওয়াতে জ্ঞানীর 'ব্রহ্মাত্মা এক' বোধ হলেও ব্যুত্থান হয়। সাধারণ বদ্ধ মানুষের ব্রহ্মাত্মা এক বোধ থাকে না। অজ্ঞানবশত শরীর-মনে অভিমান দৃঢ় থাকে। জ্ঞানীর ব্রহ্মাত্মা এক বোধ হওয়ায় অজ্ঞান ও তার কার্য, স্থূল-সূক্ষ্ম-প্রপঞ্চের প্রতি যে অভিমান তা থাকে না। সঞ্চিত কর্ম বলতে, জ্ঞান হবার আগে পর্যন্ত যে-সকল কর্ম করা হয়েছে অথচ ফল দিতে শুরু করেনি, এরূপ কর্মসংস্কারকে বোঝায়। সংশয় বলতে, দেহ প্রভৃতি থেকে আলাদা আত্মা আছে কি নেই অথবা 'ব্রহ্ম ও আত্মা এক'—এরূপ জ্ঞানে মোক্ষ হয় কি হয় না, এরূপ ভাবনা। বিপর্যয়—দেহেন্দ্রিয়াদিতে আমিত্বের ভাবকে বোঝায়। আদি পদে বাহ্যপ্রপঞ্চে সত্যতা বুদ্ধি—এগুলি থেকে মুক্ত হওয়াকে জীবন্মুক্ত অবস্থা বলা হয়েছে। কখন এ অবস্থা হয়? না, স্বস্বরূপকে অখণ্ড ব্রহ্মের সঙ্গে এক বলে যখন অনুভব করে। এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হলে মুক্তি। তার প্রমাণস্বরূপ শ্রুতি বাক্য—ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ ইত্যাদি। হৃদয়গ্রন্থি হলো অহংকার, চিৎ ও জড়া প্রকৃতির মিলিত অবস্থা—এটাই বন্ধন, গ্রন্থি। সর্বসংশয়াঃ অর্থে, দৃষ্ট-অদৃষ্ট বিষয়ে যে হয় কি না হয়, সত্যই কি এরূপ হয়? এরূপ ভাবনা। এরূপ জীবন্মুক্তের সকল কর্মক্ষয় হয়, 'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি'। কোন বিশেষ না করে, সকল কর্মের ক্ষয় শ্রুতিতে বলা হয়েছে। তাতে বিদেহমুক্তি সিদ্ধ হবে বটে কিন্তু, জীবন্মুক্তি হবে না। কারণ, পুনরায় ব্যুত্থান হতে গেলে একটু কর্মসংস্কার থাকা দরকার। এজন্য প্রারব্ধ ব্যতিরিক্ত সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কর্ম সকলের ধ্বংস

বলা হয়েছে। এবিষয়ে বেদান্তসূত্রে 'তদধিগম উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্‌ব্যপদেশাৎ' [ব্রঃ সূঃ ৪।১।১৩]। এতে বলা হয়েছে, পরমমুক্তি পক্ষে প্রারব্ধ সহিত সকল কর্মের ক্ষয় হবে। কখন? নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হলে এরূপ হয়। এখানে আচার্যদের মধ্যে ভিন্নমত দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, শ্রুতি কোন বিশেষ না করে বলেছেন, সকল কর্মের নাশ হয়। প্রারব্ধও থাকে না। নিখিল অবিদ্যা ধ্বংস হওয়ায় অবিদ্যার কার্য প্রারব্ধও ধ্বংস হয়। অপরে বলেন, তবে জ্ঞানীর বিদেহ মুক্তি হবে। দেহে আর অভিমান না হওয়ায় এবিষয়ের আচার্য কেহ থাকবে না। এ অবস্থা থেকে যে ফিরে আসেন, তার নজির আছে। আচার্যোচ্ছেদ প্রসঙ্গ এড়াতে এঁরা বলেন, লেশ অবিদ্যা থাকে এবং ব্যুত্থান হয় বলেই জীবন্মুক্ত পুরুষগণই আচার্য হয়ে সংসারকে মুক্ত অবস্থার সংবাদ দিয়ে যান। পরমহংসদেবও বলেছেন, 'ফেরে না ফেরে না বলে, নারদ শুকদেব এঁরা সব কি?' অতএব যাঁরা ফেরেন, তাঁদের তাহলে লেশ অজ্ঞান ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত মানতে হয়। এর উত্তরে প্রসিদ্ধ আচার্যগণ বলেন, না, প্রারব্ধকর্ম বা লেশ অজ্ঞান স্বীকারের দরকার নেই। ওই সকল ব্রহ্মজ্ঞানীর মন সর্বদা ব্রহ্মদর্শন করলেও যে জীবিতবৎ ব্যবহার দেখা যায়, তাতে তাঁদের জগৎ অসত্যতার বোধ নষ্ট হয় না। অপরের দৃষ্টিতেই তাঁদের জীবিতবৎ ব্যবহার। তাই তাঁরা জীবন্মুক্তের ব্যবহারকে অপরের আরোপিত প্রারব্ধ বলে ব্যাখ্যা করেন। বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানীর আর কখনো জগৎ-দেহ সত্য বলে বোধ হতেই পারে না। একথাই পরবর্তী আলোচনায় বলা হচ্ছে।।২১৭-২১৮।।

জীবন্মুক্তের ব্যবহার

অয়ং তু ব্যুত্থানসময়ে মাংস-শোণিত-মূত্রপুরীষাদি-ভাজনেন শরীরেণ আন্ধ্যমান্দ্য-অপটুত্ব-আদি-ভাজনেন ইন্দ্রিয়গ্রামেণ, অশনায়া-পিপাসা-শোক-মোহাদি-ভাজনেন অন্তঃকরণেন চ (তত্তৎ) পূর্বপূর্ব-বাসনয়া ক্রিয়মাণানি কর্মাণি ভুজ্যমানানি জ্ঞান-অবিরুদ্ধ-আরব্ধফলানি চ পশ্যন্ অপি বাধিতত্বাৎ পরমার্থতঃ ন পশ্যতি; যথা (ইদম্) ইন্দ্রজালম্ ইতি জ্ঞানবান্ তদ্ ইন্দ্রজালং পশ্যন্ অপি পরমার্থম্ ইদম্ ইতি ন পশ্যতি।।২১৯।।

বাজিকর যেমন নিজের ভেল্কিকে ভেল্কি বলেই জানে, সত্যপদার্থ বলে মনে করে না, তেমনি এই জীবন্মুক্ত পুরুষ সমাধি থেকে ব্যুত্থিত হয়ে বা অসমাহিত অবস্থায় মাংস রক্ত মূত্র বিষ্ঠার আধারভূত শরীরের দ্বারা, অন্ধত্ব, অপটুতা প্রভৃতির

আশ্রয় ইন্দ্রিয়দ্বারা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহাদির আধারভূত অন্তঃকরণের দ্বারা, সেই সেই পূর্ব পূর্ব বাসনাবশত ক্রিয়মাণ কার্য-সকল জ্ঞানের অবিরোধ প্রারব্ধ কর্মসকল ভোগ হচ্ছে দেখেও (সাক্ষিরূপে সব দেখেও) দেখেন না, অর্থাৎ সমস্তই (তাঁর কাছে) বাধিত হয়ে যাওয়ায় সত্য বলে দেখেন না ॥২১৯॥

অমৃত টীকা ঃ 'ব্রহ্ম ও আত্মা এক' এরূপ সাক্ষাৎকারে সমস্ত ভেদবুদ্ধি লুপ্ত হয়। সুষুপ্ত অবস্থার মতো দ্বৈতের বোধ জাগ্রত অবস্থাতে প্রারব্ধকর্মের দৃঢ়তাবশত থাকে। তবে ব্রহ্মজ্ঞানের পর ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কোন জড় পদার্থের অভাববশত তিনি দ্বৈত প্রপঞ্চে সত্যতা বোধ আর করতে পারেন না। আরো কি, ব্যুত্থিত অবস্থায় অবিদ্যাসংস্কার লেশ থাকে বলে ভিক্ষাটনাদি ব্যবহারকালে দ্বৈতের বোধ হলেও সমাধি অভ্যাসপটুতার বলে অদ্বয়রূপেই তা দেখেন। আর যে লোককল্যাণ কামনায় নিত্যাদি কর্ম করেন, তাও অহংকারাদি আত্মাতে নেই, এরূপভাবেই করেন বলে নিষ্ক্রিয় কর্মরহিত হন। কর্মফলও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। ইনিই জীবন্মুক্ত। এর কথাই গীতাতে—'কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে', বলে বলা হয়েছে। বাল বোধিনীতে এ-বিষয়টি একটু ভিন্নভাবে আলোচিত হয়েছে। ব্রহ্মাত্মৈক্য সাধন করে অজ্ঞানাদি সকল প্রপঞ্চের নিবৃত্তি হলেও ভোগ-নাশ্য প্রারব্ধ কর্মের নাশ হয় না বলে, প্রপঞ্চের বোধ যোগীর আবার হয়, একে বলে বাধিতের অনুবৃত্তি। তাই সেই জীবন্মুক্তের বাধিতের অনুবৃত্তি কি করে সম্ভব, যখন অজ্ঞানাদি সকল কার্যের নিবৃত্তি হয়েই যায়—উপাদান না থাকলে উপাদেয় থাকবে কোথা থেকে? তার উত্তরে বলেছেন, অজ্ঞানের সর্বথা নিবৃত্তি হয় না। অজ্ঞানের তিনটি শক্তি আছে। প্রথমটি হলো জগৎ পারমার্থিক সত্য বলে বোধ করাবার ক্ষমতা। অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতিরিক্ত সকল জড়প্রপঞ্চকে বাস্তবিক সত্য বলে বোধ করাতে পারে। এই শক্তিবলেই প্রপঞ্চকে সত্য বলে সাধারণের দৃঢ় ধারণা হচ্ছে। শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন বলে এই সত্যতাবোধ হ্রাস পেতে থাকে এবং ব্রহ্মাববোধের আগে এই প্রপঞ্চ আর সত্য বলে মনে হয় না, কিন্তু ব্যবহারিক সত্য বলে প্রতীত হয়। এটি অজ্ঞানের ব্যবহারিকভাবে সত্য বোধ করাবার অপরাখ্যা দ্বিতীয়া শক্তি। এই শক্তিও ব্রহ্মাববোধে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারে নিবৃত্ত হয়। নিবৃত্ত হলে একে ব্যবহারিক সত্য বলেও আর বোধ হয় না। কিন্তু প্রারব্ধ থাকাতে বাধিতের অনুবৃত্তি ঘটে। অতএব তখন জগতের প্রাতিভাসিক সত্তা আছে বলে বোধ হয়। একে অজ্ঞানের প্রাতিভাসিক সত্তা বোধ করাবার শক্তি আছে বলে স্বীকার করতে হয়। এ-অবস্থায় লেশ অজ্ঞানের

অস্তিত্বই ফলত স্বীকৃত হলো। তারই বলে উপাদান অজ্ঞান থাকায় ব্রহ্মজ্ঞানের পরও বাধিত জগতের অনুবৃত্তি অর্থাৎ বোধ হয়, স্বপ্নবৎ। একেই জীবন্মুক্ত অবস্থা বলা হয়েছে। এই জীবন্মুক্ত অবস্থায় ফলদানে প্রবৃত্ত পূর্ব পূর্ব কর্মবশত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিতে অভিমানরহিত হয়ে মুক্তপুরুষ বিচরণ করেন । অপরের দৃষ্টিতে তা সাধারণ অন্য মানুষের কর্তৃত্বাদির মতো মনে হলেও জীবন্মুক্তের দৃষ্টিতে তিনি কর্তৃত্বাদি অভিমান করতে পারেন না, কারণ অভিমানের মূল যে অজ্ঞান, তা নষ্ট হয়ে গেছে। এজন্য তাঁদের ব্যবহার বালকবৎ, পিশাচবৎ, উন্মাদবৎ বা জড়বৎ হয়ে থাকে। স্বামীজীও বলেছেন যে, তাঁর মনের একাংশ সর্বদা ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন, অপরাংশ দিয়ে শ্রীগুরুর আদেশে লোককল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন ।।২১৯ ।।

'সচক্ষুরচক্ষুরিব সকর্ণো-অকর্ণ ইব সমনা-অমনা ইব সপ্রাণো-অপ্রাণ ইব' ইত্যাদি শ্রুতেঃ ।।২২০ ।।

শ্রুতিতেও বলা হয়েছে ঃ চক্ষুষ্মান হয়েও অচক্ষুর মতো, কর্ণযুক্ত হয়েও কর্ণহীনের মতো, মনোযুক্ত হয়েও অমনস্ক, প্রাণবান হয়েও অপ্রাণ ইত্যাদি ।।২২০।।

অমৃত টীকা ঃ জীবন্মুক্ত সামান্য লোকের মতো দেহাদিতে অভিমান করছেন বলে বোধ বস্তুত হলেও তাঁর যে বাস্তবিক দেহাভিমান থাকে না, এ-বিষয়ে শ্রুতিবাক্য হলো ঃ সচক্ষুরচক্ষুঃ ইব, ইত্যাদি, তাই বলা হয়েছে— 'তদেজতি তন্নৈজতি' ইত্যাদি। এ যেন বলপ্রযুক্ত নিক্ষিপ্ত বাণ বা ঢেলার মতো, যতক্ষণ গতিবেগ থাকবে ততক্ষণ তা চলতে থাকে। বেগক্ষয় হলে সে আপনা থেকেই নিবারিত হয়ে যায়। জীবন্মুক্তের দেহপাতও সেরূপ প্রারব্ধ কর্মফল ক্ষয় হলেই হয়ে থাকে। সুতরাং জীবন্মুক্তের বিবরণ সুপ্ত ব্যক্তির মতো—করেও নিষ্ক্রিয়। বশিষ্ঠদেব বলেছেন ঃ 'সুষুপ্তবদ্‌যশ্চরতি স মুক্ত ইতি কথ্যতে' ।।২২০ ।।

উক্তঞ্চ ঃ—

সুষুপ্তবৎ জাগ্রতি যো ন পশ্যতি
দ্বয়ঞ্চ পশ্যন্ অপি চ অদ্বয়তঃ।
তথা চ কুর্বন্ অপি নিষ্ক্রিয়ঃ চ যঃ,
স আত্মবিৎ ন অন্যঃ ইত্যাহ নিশ্চয়ঃ।।

ইতি [উপদেশসাহস্রী ৮৫] **।।২২১।।**

আরো (আচার্যগণ কর্তৃক) কথিত হয়েছেঃ 'জাগরিত হয়েও যিনি সুষুপ্তের মতো দেখেন না, ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য দেখেও যিনি অদ্বয়জ্ঞানবশত বহু দেখেন না, কর্ম করেও যিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি আত্মবিৎ—অপরে নয়—ইহা নিশ্চিত' ॥২২১॥

জীবন্মুক্তের শুভাশুভানুষ্ঠান

অস্য জ্ঞানাৎ পূর্বং বিদ্যমানানাং এব আহার-বিহারাদীনাম্ অনুবৃত্তিবৎ শুভবাসনানাম্ এব অনুবৃত্তিঃ ভবতি শুভাশুভয়োঃ ঔদাসীন্যং বা ॥২২২॥

এই জীবন্মুক্তের ব্রহ্মজ্ঞানলাভের আগেকার আহার বিহার প্রভৃতি জ্ঞানলাভের পরও যেমন অনুবৃত্ত হয়, তেমনি জ্ঞানের পূর্বেকার শুভবাসনাগুলিরই কেবল অনুবৃত্তি হয় অথবা শুভ-অশুভ উভয় প্রকার বাসনাতেই ঔদাসীন্য হয় ॥২২২॥

তদুক্তং—

'বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।
শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদঃ অশুচিভক্ষণে ॥' ইতি

[নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ৪/৬২]

"ব্রহ্মবিত্ত্বং তথা মুক্ত্বা স আত্মজ্ঞো ন চেতর" ইতি চ।

[উপদেশসাহস্রী ১১৫] **॥২২৩॥**

যেমন কথিত আছে, 'যিনি অদ্বৈত বোধ করেছেন, তাঁর যদি স্বেচ্ছাচারিতা হয়, তা হলে কুকুর ও তত্ত্বজ্ঞানীর অশুচিভক্ষণে পার্থক্য কি?' "যিনি 'আমি ব্রহ্মজ্ঞানী' এরূপ অভিমান ত্যাগ করতে পারেন, তিনিই আত্মজ্ঞ, অপরে নয়" ॥২২৩॥

অমৃত টীকা ঃ জীবন্মুক্ত পুরুষ 'আমার পাপপুণ্য নেই' এরূপ অভিমানবশত স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন, এরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হচ্ছে যে, জ্ঞানলাভের আগে সাধককে খুব চেষ্টা করে শুভ বাসনা ও কাজ করতে হয় এবং এভাবে সকল অশুভকে দূর করে পুণ্যময় হয়েই জ্ঞানলাভ করতে হয়েছে। সুতরাং জ্ঞানলাভের পর সাধারণ অনায়াসলব্ধ আহার বিহারের মতোই শুভ

বাসনা ও কর্মসমূহেরেই অনুবর্তন হবে, অশুভের হবে না। প্রশ্ন হতে পারে, শুভ বাসনা বা কর্মেরিই বা দরকার কি? কারণ পুণ্যানুষ্ঠান দ্বারা তাঁকে দুরিতরাশি ক্ষয় করতে হয়েছিল চিত্তশুদ্ধির জন্য। এখন আর তার প্রয়োজন কি? তার উত্তরে বলা হলো, তিনি শুভ-অশুভে উদাসীন থাকেন। শুভ সংস্কাররাশির প্রেরণায় কর্মাদি করলেও উদাসীন থাকেন, চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনে কাজ করেন না।

প্রশ্ন হতে পারে, বিদ্বানের স্বেচ্ছাচারিতা হয় না, একথা ঠিক নয়। কারণ শাস্ত্রে দেখা যায়—যেমন কৌষিতকী উপনিষদে আছে ঃ 'ন মাতৃবধেন, ন পিতৃবধেন' ইত্যাদি অথবা গীতাশাস্ত্রে 'যস্য নাহংকৃতোভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে। হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে।।' [গীতা, ১৮/১৭] এভাবের বহু শ্রুতিস্মৃতি বাক্যে যথেষ্ট আচরণের কথা বলা হয়েছে। সত্য ঐসকল বাক্যে কেবল জ্ঞানের স্তুতিই করা হয়েছে। স্বার্থে তাৎপর্য নেই। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ [৪/৬৩] তে বলা হয়েছে 'অধর্মাজ্জায়তে অজ্ঞানং যথেষ্টাচরণং ততঃ। ধর্মকার্যে কথং তৎ স্যাৎ যত্র ধর্মো বিনশ্যতি।।' 'অধর্ম থেকে অজ্ঞান, অজ্ঞান থেকে যথেষ্ট আচরণ; ধর্মকার্যে তা কেমন করে হবে? তাতে ধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে!' অতএব প্রগাঢ় ধার্মিক না হলে কেহই মোক্ষমার্গে উন্নীত হতে পারেন না। মুক্তিলাভ হলে তার আর অধর্মকর্মে মন যেতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন, 'বেতালে পা পড়ে না।'

বিদ্বন্মনোরঞ্জনী টীকায় বলেছেন, শুভ কাজ তো সাধক চেষ্টাপূর্বক করে থাকেন, তবে সাধক ও মুক্ত পুরুষে তফাত কি? মুক্ত পুরুষের ঔদাসীন্যই এই পার্থক্য। মুক্ত পুরুষ শুভাশুভে উদাসীন। সাধক অশুভ যত্নপূর্বক ত্যাগ করে উৎসাহের সঙ্গে শুভ অনুষ্ঠান করেন। উদাসীন শব্দে উপেক্ষা। তাই উদাসীনতাই মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। শাস্ত্র বিধি-নিষেধের বশীভূত হয়ে প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হওয়া মুক্ত পুরুষের লক্ষণ নয়। তাহলে মুক্ত পুরুষের যথেচ্ছাচারিতা হয়ে পড়ে? এই আশঙ্কার উত্তরেই বলা হয়েছে ঃ যিনি যাতে বিরক্ত, তিনি সে-কাজ করেন না। লোকত্রয়ে বিরক্ত হয়েই যাঁর মোক্ষেচ্ছা হয়েছে, তিনি আর সে-সকল ভোগ্য উপকরণের চেষ্টা কেন করবেন? যিনি জানেন অন্নে বা জলে বিষ মেশানো আছে, তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হলেও সে-অন্নজলে প্রবৃত্ত হবেন না। আসক্তিই অজ্ঞানের চিহ্ন, তা চিত্তের বিক্ষেপকারক। যে-গাছের কোটরে আগুন তাতে কি শ্যামলতা থাকে? [নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ৪৬৫-৬৭] ।।২২২-২২৩।।

জীবন্মুক্তের গুণ

তদানীম্ অমানিত্বাদীনি জ্ঞানসাধনানি অদ্বেষ্টৃত্বাদয়ঃ সদ্‌গুণাশ্চ অলঙ্কারবৎ অনুবর্তন্তে।।২২৪।।

তখন (জীবন্মুক্ত অবস্থায়) অমানিত্ব প্রভৃতি জ্ঞান-সাধনগুলি এবং অহিংসা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি (জীবন্মুক্তের) অলঙ্কারের মতো ব্যবহারে প্রকাশিত হয়ে থাকে।।২২৪।।

তদুক্তং—

"উৎপন্নাত্মাববোধস্য হ্যদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ।
অযত্নতঃ ভবন্ত্যস্য ন তু সাধনরূপিণঃ।।"

ইতি [নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিঃ ৪।৬৯] **।।২২৫।।**

একথাই বলা হয়েছে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিতে—'যাঁর আত্মসাক্ষাৎকার হয়েছে তাঁর অদ্বেষ্টাদি গুণরাজি বিনা প্রযত্নে ব্যবহারে অনুবৃত্ত হয়, এর জন্য চেষ্টা করতে হয় না'।।২২৫।।

অমৃত টীকা : জ্ঞানের সাধন সকল 'অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্। আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।।' [গীতা ১৩।৮] ইত্যাদি এবং ব্যবহারে 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। নির্মমো নিরহঙ্কারঃ-সম দুঃখসুখঃ ক্ষমী।।' [গীতা ১২/১৩] 'সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। ময্যর্পিত মনোবুদ্ধিঃ যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।' [গীতা ১২/১৪] ইত্যাদি। সাধক ও সিদ্ধপুরুষের উপরোক্ত সাধন ও গুণাবলী। তন্মধ্যে সাধককে ঐসকল যত্নপূর্বক আয়ত্ত করে সিদ্ধ হতে হয়। সিদ্ধ হওয়া অর্থে আত্মদর্শন। আত্মদর্শন-বলে ঐসকল সাধনোচিত গুণাবলী স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ আত্মদর্শন না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণ বাসনাক্ষয় হয় না বা গুণসংস্কাররাজি সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হলেও তাদের ফল উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয় না। ভৃষ্ট বীজের ন্যায় অঙ্কুর জননাক্ষমতা আত্মদর্শন হলেই হতে পারে। নির্বিকল্প সমাধিতে সূক্ষ্ম ক্লেশরাশি ভাজা বীজের মতো হয়। তাঁর দ্বারা আর সৃষ্টির কর্মাদি সম্ভব হয় না। এই অর্থেই গীতায় ২/৫৯ শ্লোকে 'বিষয়া বিনিবর্ততন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে।।' বলা হয়েছে, উপবাসক্লিষ্ট ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সামর্থ্য না থাকায় রসগ্রহণে বিরত থাকতে পারে বটে, কিন্তু বিষয়াসক্তি দূর হয় না, পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হলে বিষয় ও বিষয়তৃষ্ণা একেবারে চলে যায়। তখন ব্যুত্থিত অবস্থায় যে-লোকব্যবহার হয়, তা শুভ সংস্কারবশে কল্যাণময় সাধুচিতই হবে, অন্যরূপ কেমন করে হবে?।।২২৪-২২৫।।

জীবন্মুক্তের শেষ ফল

কিং বহুনা, অয়ং দেহযাত্রামাত্রার্থং ইচ্ছা-অনিচ্ছা-পরেচ্ছা-প্রাপিতানি-সুখদুঃখলক্ষণানি আরব্ধ-ফলানি অনুভবন্ অন্তঃকরণ-আভাসানাম্ অবভাসকঃ সন্ তদ্ অবসানে প্রত্যগ্-আনন্দ-পরব্রহ্মণি প্রাণে লীনে সতি অজ্ঞান-তৎকার্য-সংস্কারাণাম্ অপি বিনাশাৎ পরমকৈবল্যম্ আনন্দ-এক-রসম্ অখিল-ভেদ-প্রতিভাসরহিতম্ অখণ্ডব্রহ্ম অবতিষ্ঠতে।।২২৬।।

আর বেশি বলার দরকার নেই। ইনি (জীবন্মুক্ত) দেহরক্ষার জন্যই মাত্র প্রারব্ধকর্মের ফলস্বরূপ নিজ ইচ্ছা অনিচ্ছা বা পরের ইচ্ছায় উপস্থিত সুখ দুঃখ অনুভব আভাসরূপে করেন। (বস্তুত) অন্তঃকরণাদির প্রকাশক চিন্মাত্রস্থ হয়ে থাকেন (সাক্ষিরূপে) প্রারব্ধকর্ম শেষ হয়ে গেলে, তাঁর প্রাণ তখন অন্তরাত্মা আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ায়, অজ্ঞান ও তার কার্য সংস্কারসমূহও বিনষ্ট হয়ে যায়, সকল প্রকার ভেদরহিত এক আনন্দস্বরূপ পরম কেবল অখণ্ড ব্রহ্মরূপে অবস্থান করেন।।২২৬।।

"ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" [বৃঃ উঃ ৪।৪।৬] **"অত্রৈব সমবলীয়ন্তে"** [বৃঃ উঃ ৩।২।১১] **"বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে"** [কঠঃ উঃ ৫।১] **ইতি এবমাদি শ্রুতেঃ।।২২৭।।**

শ্রুতিতে বলা হয়েছেঃ 'তাঁর প্রাণসকল শরীর থেকে বাহির হয় না। এই পরব্রহ্মেই সম্যগ্‌রূপে লীন হয়ে যায়।' "জীবন্মুক্ত হয়ে কৈবল্যমুক্ত হন" ইত্যাদি।।২২৭।।

ইতি

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীসদানন্দযোগীন্দ্র বিরচিত বেদান্তসারঃ সমাপ্তঃ।

ইতি

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীসদানন্দ যোগীন্দ্র বিরচিত বেদান্তসার গ্রন্থের অনুবাদ সমাপ্ত হলো।

অমৃত টীকা : জ্ঞানযোগের সাধনগ্রন্থ এই বেদান্তসার সমাপ্ত হলো। আর বহু কিছু বলার থাকলেও সংক্ষেপিত প্রাথমিক জ্ঞানের অধিকারির জন্য এই-ই পর্যাপ্ত। মুক্তপুরুষদের দেহস্থিতিকালের ব্যবহারাদি, আহার বিহারাদি শ্রীমৎ পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি সকল মহাপুরুষদের মধ্যেই প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমা সারদাদেবীর চরিত্রেও তা সমধিক প্রকাশিত। বিশেষ এই, স্বেচ্ছাধৃত বিগ্রহ ঈশ্বরের অবতার যাঁরা তাঁরা কর্মবশে বা প্রারব্ধবশে জন্মাদি করেন না, তদ্ভিন্ন জীবন্মুক্ত পুরুষদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, জীবন্মুক্ত পুরুষ ব্যুত্থিত দশায় নিজ ইচ্ছায় ভিক্ষাটনাদি করেন, সমাধি বা ভাবাবস্থায় স্বশিষ্যাদির দ্বারা সেবিত হন, আবার প্রারব্ধবশত রোগভোগাদিও করেন। এতে সুখ-দুঃখ যাই আসুক, অন্তঃকরণের বৃত্তির সাক্ষিরূপে তিনি নিঃস্পৃহ দ্রষ্টারূপেই বিরাজিত থাকেন।

প্রারব্ধক্ষয় হয়ে গেলে পূর্বসিদ্ধ জ্ঞানবলে প্রারব্ধকর্ম অজ্ঞান ও তৎকার্য সংস্কারসমূহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সঞ্চিত কর্মসকল জ্ঞানবলে দগ্ধ হয়, ক্রিয়মাণ কর্মসকল অলিপ্ততাবশত পুনরায় দেহারম্ভক কারণের অভাবে দেহধারণ হয় না। পরম কৈবল্য লাভ হয়।

নির্গুণব্রহ্ম সাক্ষাৎকারীর সূক্ষ্মশরীর প্রাণাদি দেহ থেকে বেরিয়ে আসে না, কারণ প্রতপ্ত লৌহে জলবিন্দুর মতো তা প্রত্যক্ ব্রহ্মে অর্থাৎ অন্তরস্থিত আত্মায় লয় হয়ে যায়। সবটাই ব্রহ্মশক্তির খেলা, শক্তি ব্রহ্মলীন হন বলে তাঁরও সকল কিছু ব্রহ্মময় হয়ে যায়। এই বিদেহ মুক্তির কোন সাধন নেই। পূর্বপ্রাপ্ত জ্ঞানবলে প্রারব্ধকর্ম ভোগবলে ক্ষয় হলে এই অবস্থা আপনা থেকেই হয়। একথাই 'বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে' বলে কঠশ্রুতি বলেছেন।

তাহলে সমগ্র তত্ত্বটি হলো : পূর্বে মুক্ত থাকলেও অবিদ্যাবলে উপস্থাপিত নামরূপ উপাধিকে আলাদা করতে না পেরে সাধারণ আমাদের জগৎ সত্য, স্বর্গ-নরক সত্য, দেবাদি সত্য, আমাদের দেহমনাদি আমি এবং মৃত্যুর পর উর্ধ্ব অধঃ, স্বর্গ-নরকাদি ভ্রমণ প্রভৃতি সত্য বলে বোধ হয়। কিন্তু যখন শাস্ত্র ও শ্রীগুরুকৃপায় নিজের আত্মাই নিত্যশুদ্ধমুক্তপরমানন্দ অদ্বয়ব্রহ্ম বলে বোধ হয়, তখন এই অপরোক্ষ অনুভববলে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবব্রহ্ম এক, বলে বোধ হয়। এজন্যই বলা হয়েছে :

'ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষাপরমার্থতা।।' [ব্রহ্মবিন্দু উঃ-১৫] ।।২২৭।।

ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।।

যথাগ্নের্দাহিকাশক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্।।

ওঁ নমঃ শ্রীযতিরাজায় বিবেকানন্দসূরয়ে।
সচ্চিদ্‌সুখস্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে।।

ইতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎশঙ্করানন্দ-শিষ্য-প্রণীত অমৃত টীকা সমাপ্ত।

সদানন্দের বেদান্তসারের সংক্ষিপ্তসার

কর্ম

- নিষিদ্ধ (মিথ্যাচার, প্রাণিহত্যা প্রভৃতি)
- প্রায়শ্চিত্ত (কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি)
- কাম্য (জ্যোতিষ্টোমাদি)
- নিত্য (সন্ধ্যাবন্দনাদি)
- নৈমিত্তিক (জাতেষ্টি, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি)

ছক - ২ - (গ) **সাধন চতুষ্টয়**

সাধন চতুষ্টয়

- বিবেক
- বৈরাগ্য
- ষট্‌সম্পত্তি
  - শম
  - দম
  - উপরতি
  - তিতিক্ষা
  - শ্রদ্ধা
  - সমাধান
- মুমুক্ষুত্ব
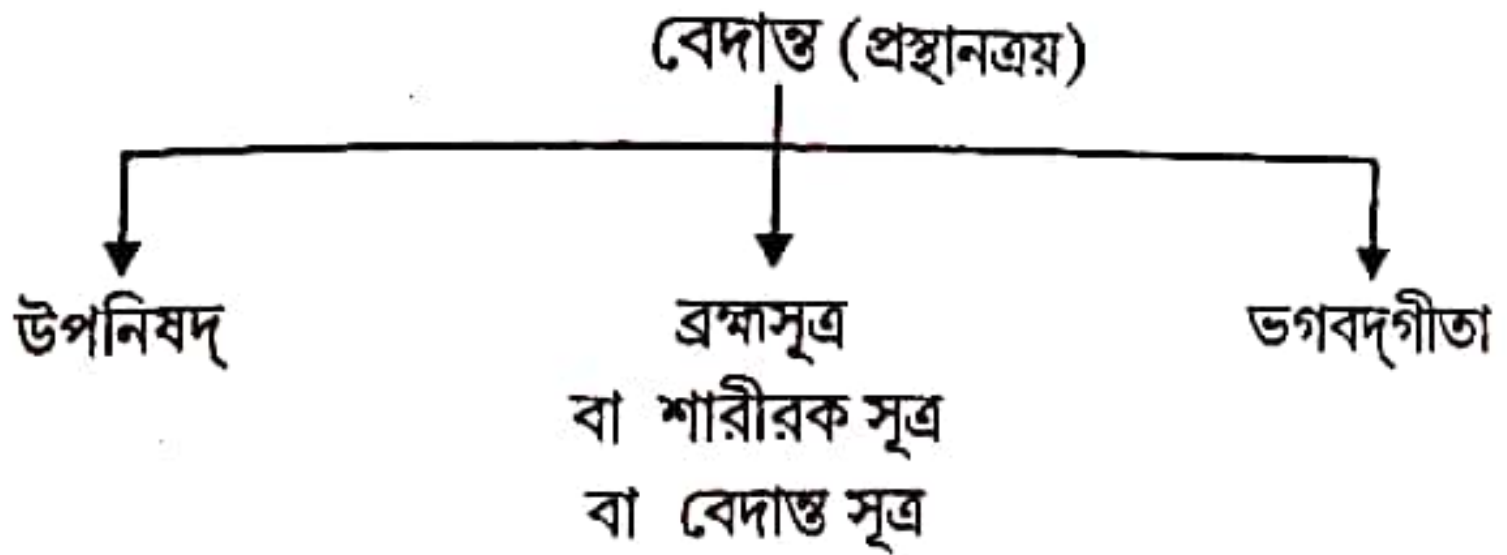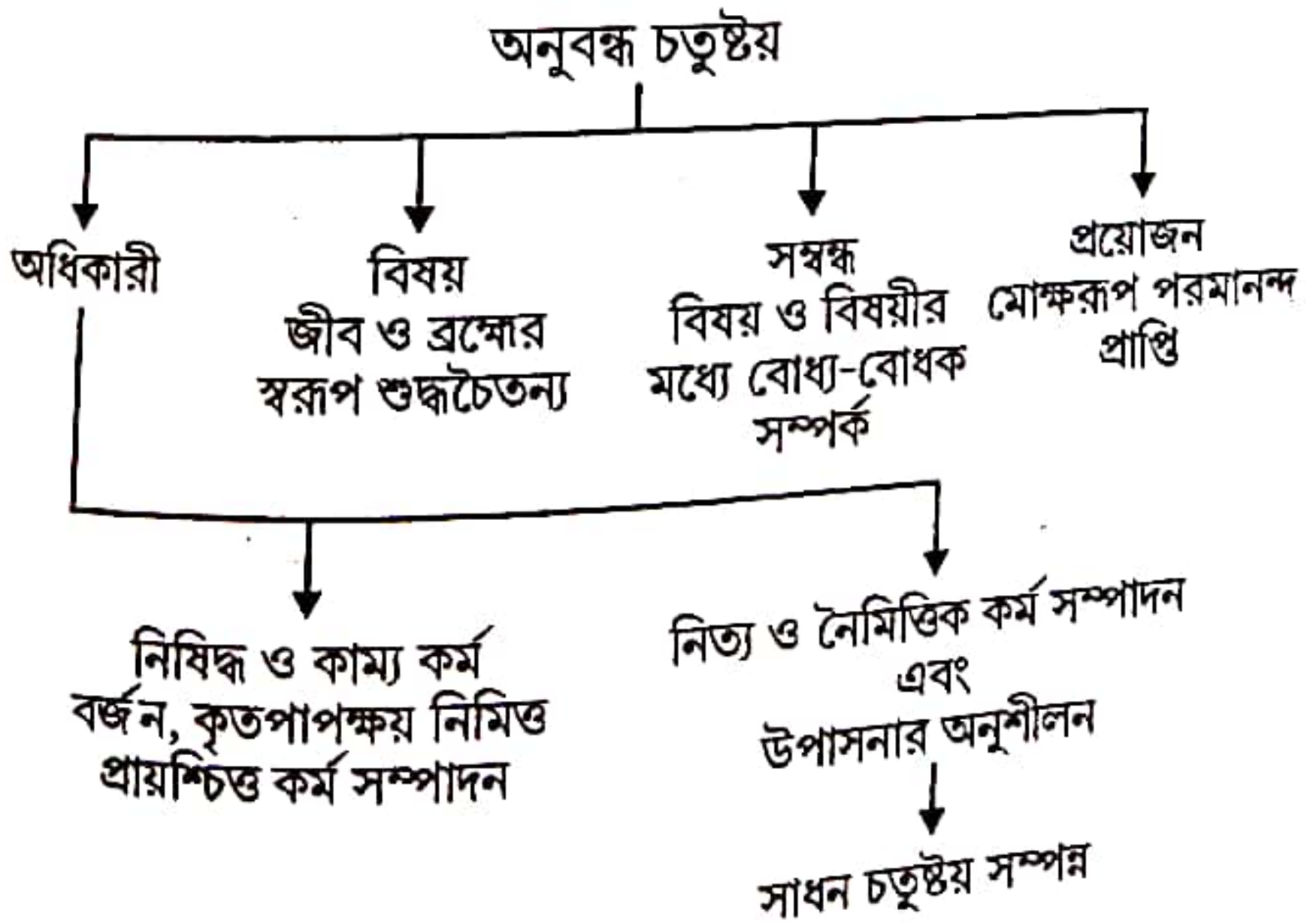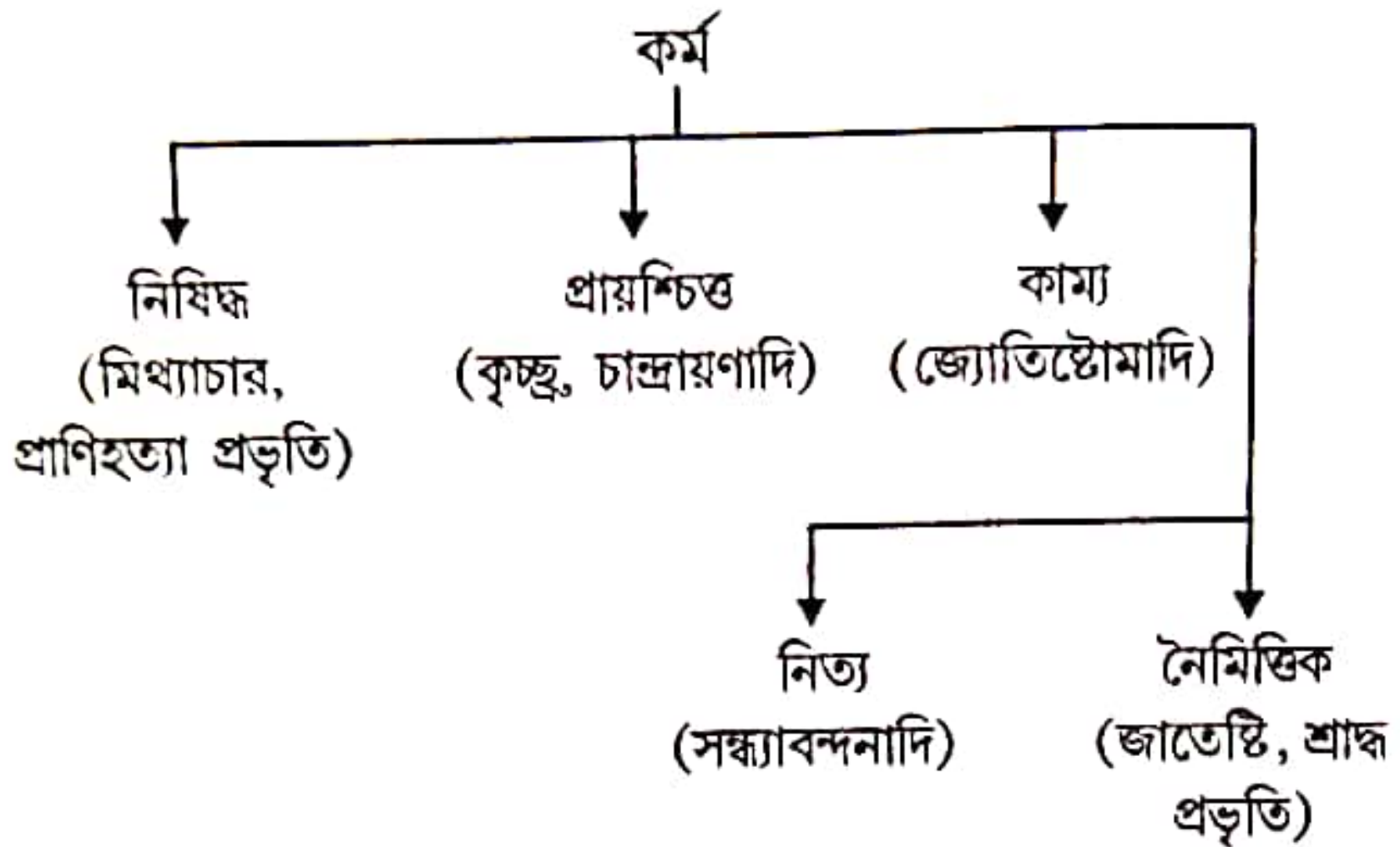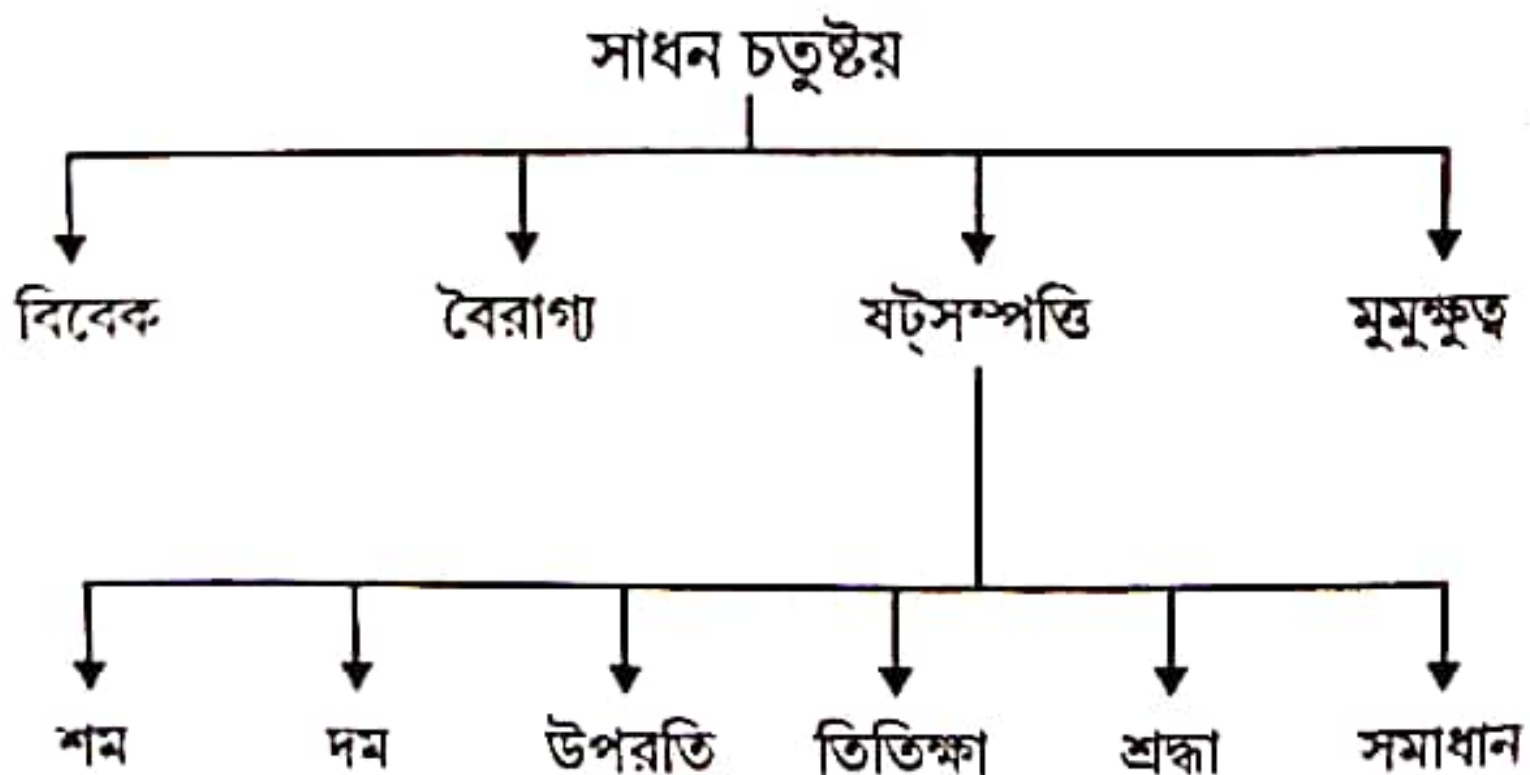
ছক - ৩ (ক)
অজ্ঞানের সংজ্ঞা
অজ্ঞান
(অবিদ্যা বা মায়া)
অনির্বচনীয়
(সদ্‌ও নয়,
অসদ্‌ও নয়)
ত্রিগুণাত্মিকা
জ্ঞানবিরোধি
(জ্ঞান দ্বারা ধ্বংস হয়)
ভাবরূপ
(উপলব্ধি হয়,
তাই অবাস্তব নয়)
সত্ত্ব
রজঃ
তমঃ
ছক - ৩ (খ)
অজ্ঞানের শক্তি
অজ্ঞান
আবরণ
(ব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করে
এবং সংসারের কারণ ঘটায়)
বিক্ষেপ
(আকাশসৃষ্টি থেকে শুরু
করে সকল সৃষ্টির কারক)
ছক - ৩ (গ)
অজ্ঞানের প্রকারভেদ
অজ্ঞান
সমষ্টি
(ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট)
ব্যষ্টি
(প্রাজ্ঞ, তৈজস এবং বিশ্ব)

ছক-৪
ব্রহ্ম এবং তাঁর নানা অভিব্যক্তি
ব্রহ্ম
(শুদ্ধচৈতন্য, তুরীয়,
সমষ্টি অজ্ঞান
বা মায়া উপহিত)
ঈশ্বর
অধিকারী
সর্বজ্ঞত্ব
সর্বেশ্বরত্ব
সর্বনিয়ন্তৃত্ব
(অব্যক্ত, অন্তর্যামী
এবং জগৎকারণ)
সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর উপহিত
হিরণ্যগর্ভ
অধিকারী
জ্ঞানশক্তি
ইচ্ছাশক্তি
ক্রিয়াশক্তি
সমষ্টি স্থূলশরীর উপহিত
বিরাট
(বৈশ্বানর)
ছক-৫
জীব
ব্রহ্ম (শুদ্ধচৈতন্য)
ব্যষ্টি অজ্ঞান উপহিত বুদ্ধির আভাস
জীব
তিনটি শরীর
পঞ্চকোশ
অবস্থাত্রয়
স্থূলশরীর
অন্নময় কোশ
জাগ্রৎ
বিশ্ব
প্রাণময় কোশ
মনোময় কোশ
বিজ্ঞানময় কোশ
সূক্ষ্মশরীর
স্বপ্ন
তৈজস
কারণশরীর
আনন্দময় কোশ
সুষুপ্তি
প্রাজ্ঞ

ছক - ৬(ক)

সৃষ্টি
ব্রহ্ম (চৈতন্য)
অজ্ঞান (তমঃ প্রকটিত বিক্ষেপ শক্তির প্রকাশ)
আকাশ (শব্দ)
বায়ু (স্পর্শ)
অগ্নি (রূপ)
অপঃ (রস)
পৃথ্বী (গন্ধ)
তন্মাত্র
অথবা
সূক্ষ্মভূত
তমঃ প্রকাশিত পঞ্চীকরণের মাধ্যম
পঞ্চ-মহাভূত
চার রকমের শরীর নিয়ে গঠিত
চতুর্দশ ভুবন
প্রত্যেকটির সাত্ত্বিক অংশ থেকে
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়
১. শ্রোত্র
২. ত্বক
৩. চক্ষু
৪. জিহ্বা অথবা রসনা
৫. ঘ্রাণ
সত্ত্বগুণ প্রকাশিত পঞ্চ তন্মাত্রা থেকে
অন্তঃকরণ
১. চিত্ত
২. অহঙ্কার
৩. মন
৪. বুদ্ধি
প্রত্যেকটির রাজসিক অংশ থেকে
কর্মেন্দ্রিয়
বাক্
পাণি
পাদ
পায়ু
উপস্থ
পঞ্চ তন্মাত্রার রজোগুণ থেকে
পঞ্চ প্রাণ এবং উপপ্রাণ
প্রাণ
অপান
দেবদত্ত
ব্যান
কূর্ম
উদান
নাগ
সমান
কৃকর
ধনঞ্জয়
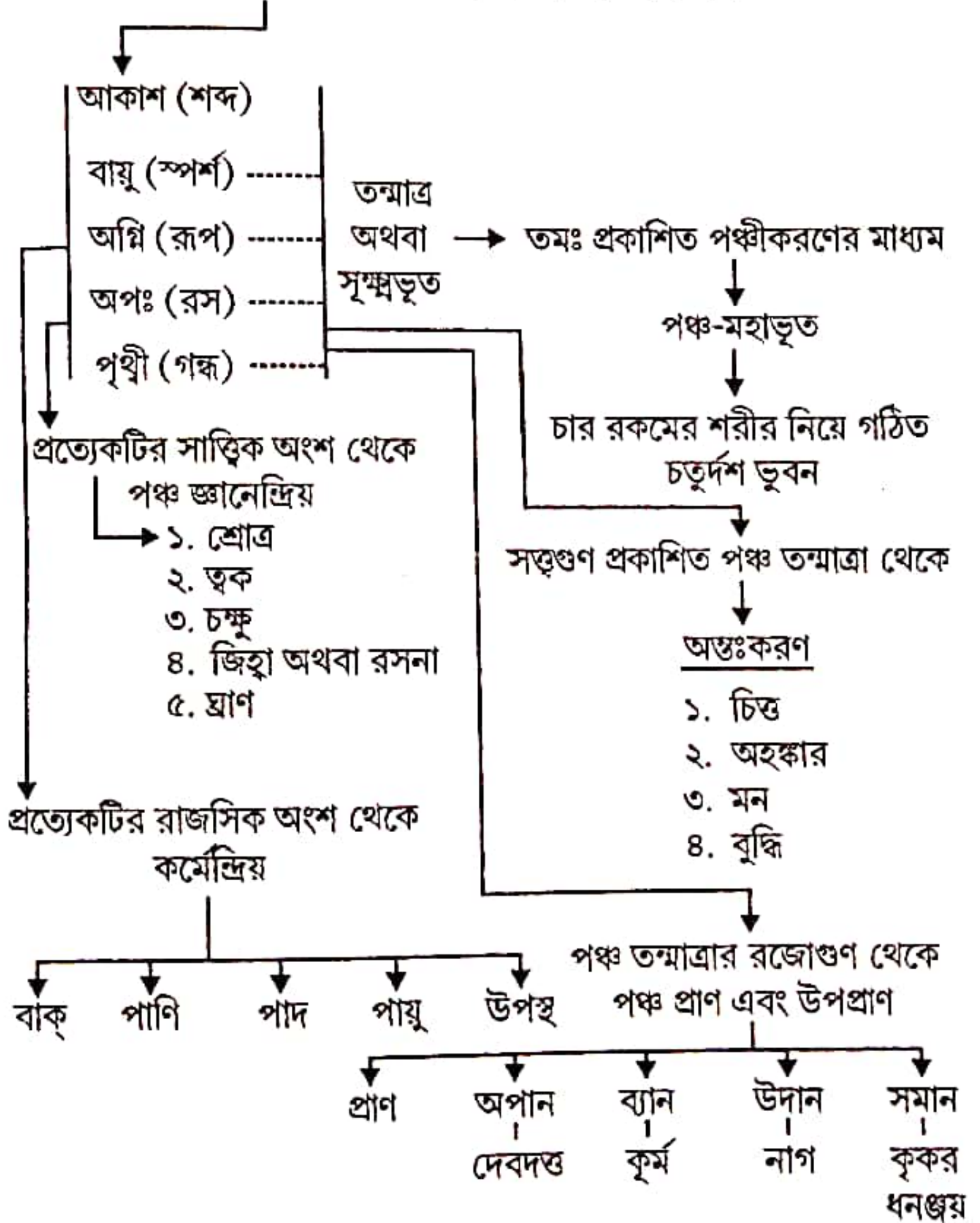
ছক - ৬(খ)

প্রত্যেক মহাভূত অথবা স্থূলভূত $= \frac{১}{২}$ যে তন্মাত্র $+ \frac{১}{৮}$ অন্য চার তন্মাত্রের যোগফল

দৃষ্টান্ত ঃ— পৃথ্বী-ভূত $= \frac{১}{২}$ গন্ধ তন্মাত্র অথবা সূক্ষ্ম পৃথ্বী
$+ \frac{১}{৮}$ সূক্ষ্ম আকাশ $+ \frac{১}{৮}$ সূক্ষ্ম বায়ু $+ \frac{১}{৮}$ সূক্ষ্ম অগ্নি
$+ \frac{১}{৮}$ সূক্ষ্ম অপঃ

ছক - ৬(গ)

অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল, পাতাল — পৃথিবীর নিম্নে।
ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য — পৃথিবীর ঊর্ধ্বে।

ছক-৬(ঘ)

ছক - ৭

মহাবাক্যাবলী

মহাবাক্যাবলী

- ঋক্‌বেদ — ঐতরেয় উপনিষদ্ (৫/৩) প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম
- যজুর্বেদ — বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (১/৪/১০) অহং ব্রহ্মাস্মি
- সামবেদ — ছান্দোগ্য উপনিষদ্ (৬/৮/৭) তত্ত্বমসি
- অথর্ববেদ — মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ (১/২) অয়মাত্মা ব্রহ্ম

ছক - ৮

বাক্যার্থ

অর্থ

- বাচ্যার্থ
- লক্ষ্যার্থ
  - কেবল লক্ষণ
    - জহৎ লক্ষণা
    - অজহৎ লক্ষণা
    - জহৎ-অজহৎ লক্ষণা বা ভাগলক্ষণা
  - লক্ষিত লক্ষণ
- ব্যঙ্গার্থ

ছক - ৯
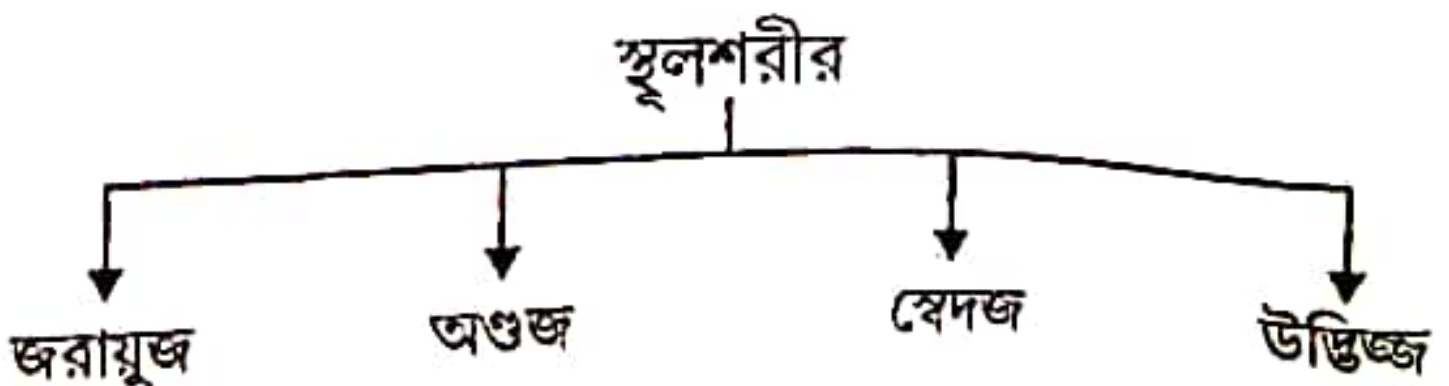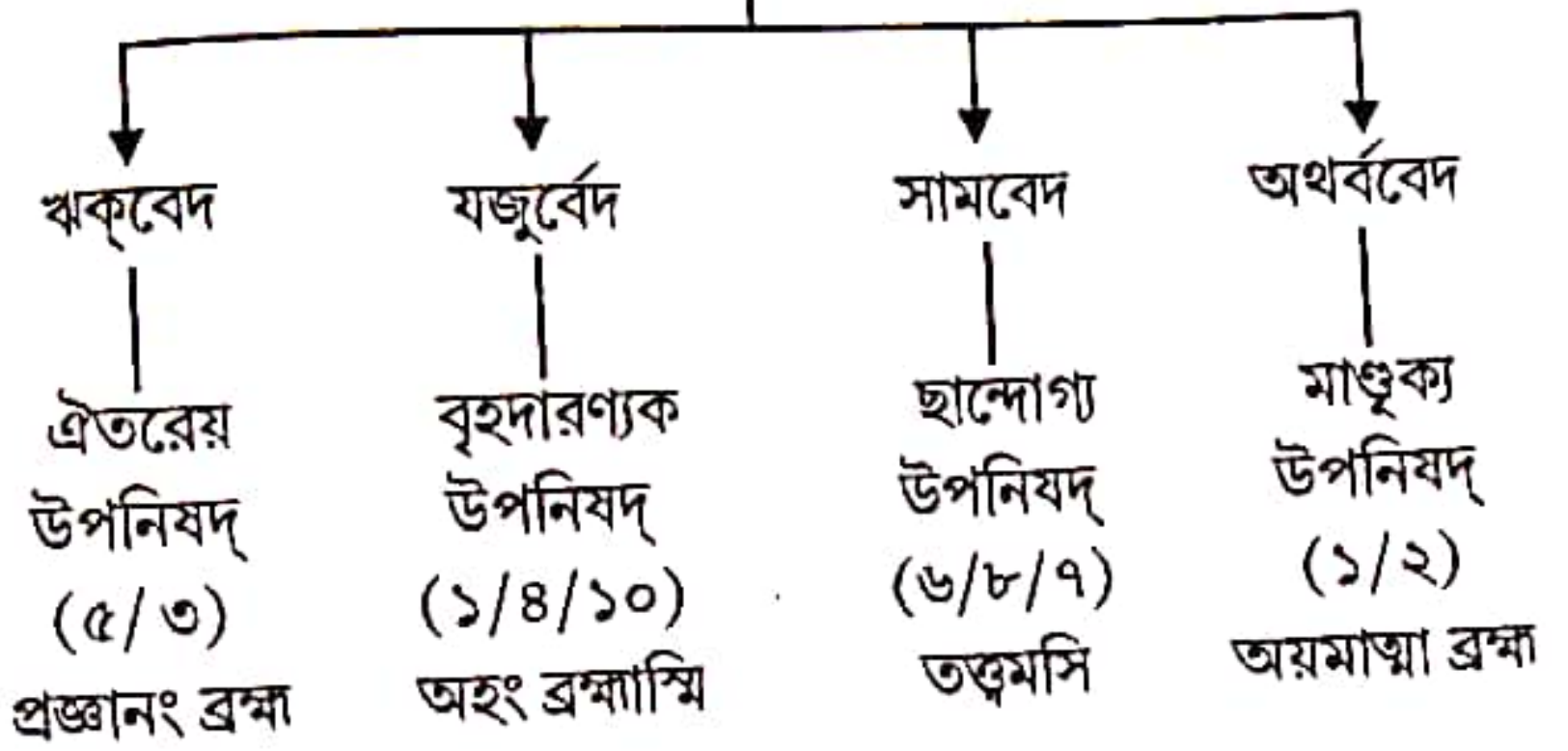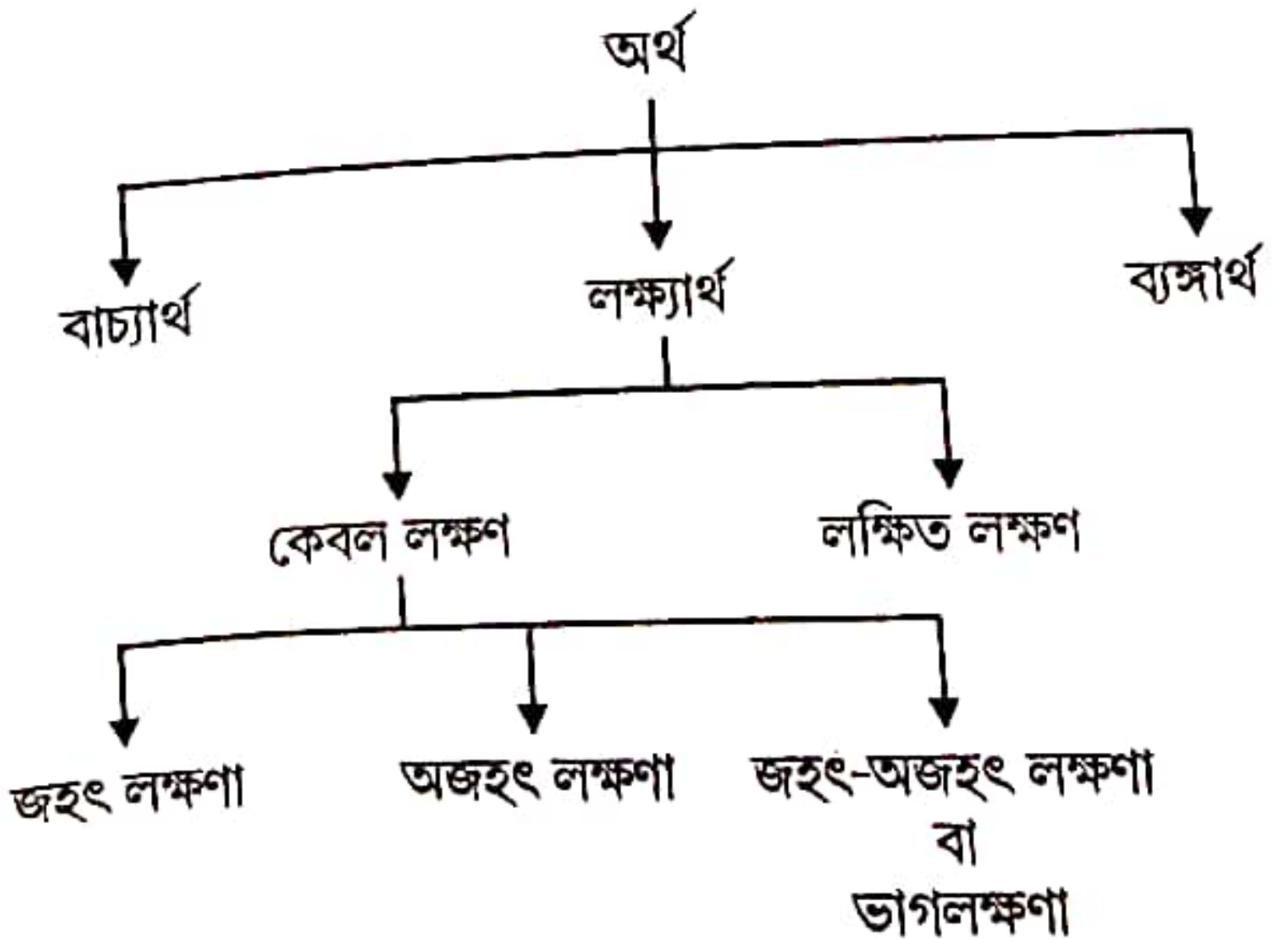
নিষিদ্ধকর্ম ও কাম্যকর্ম ত্যাগ, প্রায়শ্চিত্ত ও নিত্যনৈমিত্তিক কর্মাদির অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও মুমুক্ষুত্ব-অর্জন।

সাধন-চতুষ্টয়

গুরূপদেশ

শ্রবণ

উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ, উপপত্তি—এই ষড়বিধলিঙ্গের দ্বারা শ্রুত্যর্থ অবধারণ

মনন

(শ্রুতি-অনুগৃহীত-তর্কের মাধ্যমে)

নিদিধ্যাসন

সমাধি

সবিকল্প — নির্বিকল্প

অঙ্গাবলী

১) যম — অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মাচর্য, অপরিগ্রহ
২) নিয়ম -- শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরপ্রণিধান
৩) আসন
৪) প্রাণায়াম
৫) প্রত্যাহার
৬) ধারণা
৭) ধ্যান
৮) সমাধি
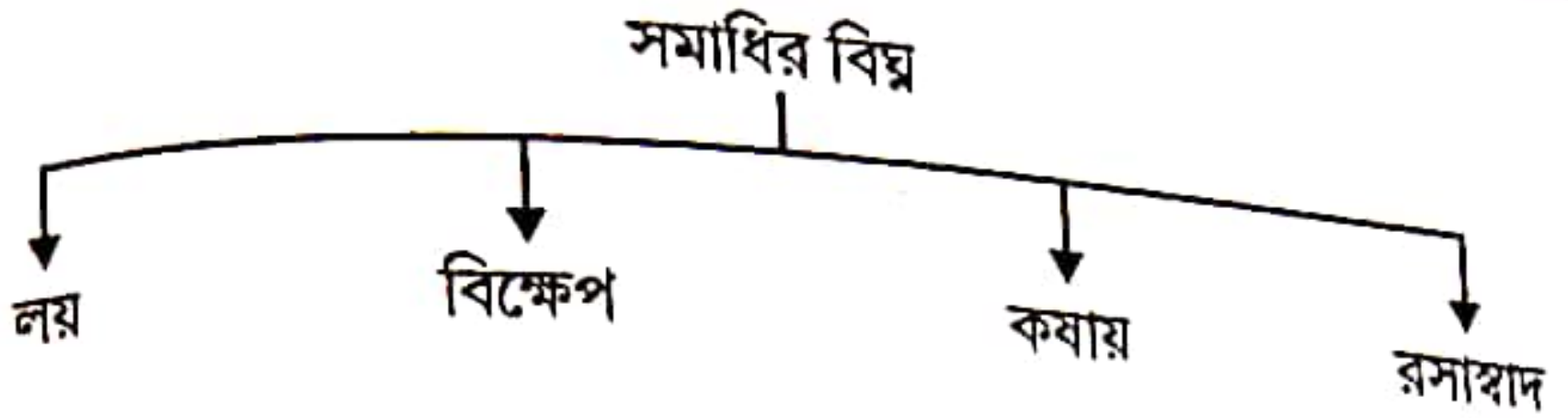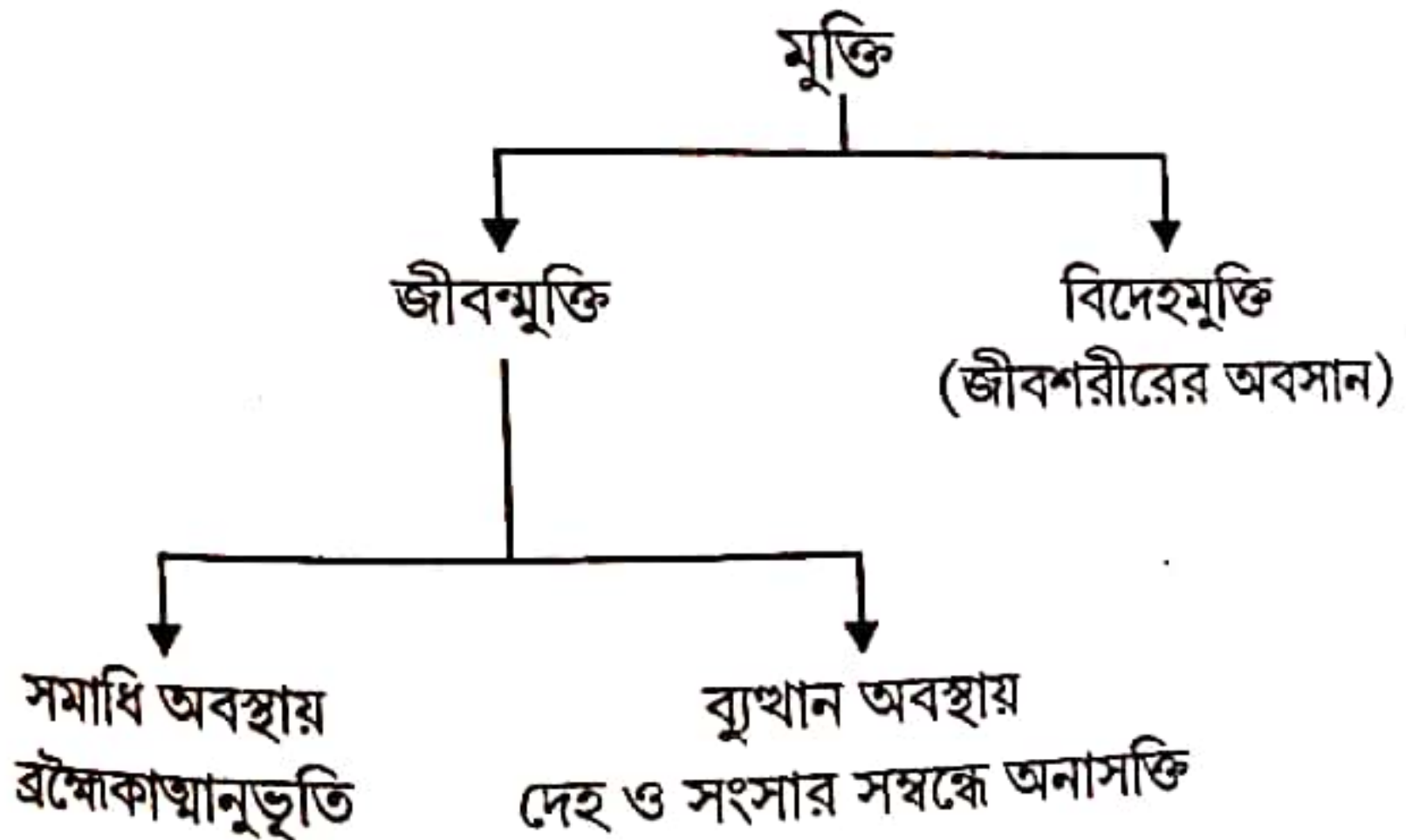
(৬–৮) সংযম

ছক - ১০

মুক্তি

মুক্তি

জীবন্মুক্তি

বিদেহমুক্তি (জীবশরীরের অবসান)

সমাধি অবস্থায় ব্রহ্মৈকাত্মানুভূতি

ব্যুত্থান অবস্থায় দেহ ও সংসার সম্বন্ধে অনাসক্তি

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৭০০ ০০৩

মূল্য : ১৫.০০

প্রচ্ছদ : সঞ্জিত সাহা

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : প্রসেস এণ্ড এ্যালাইড গ্রাফিকস, কলি-১২